প্রকাশক :—
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বুক ট্রাষ্ট
৫৭-বি, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

মুদ্রক :-

১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :—
প্রভাত কর্মকার

শ্রীমান্ সুভাষ সেন

স্নেহভাজনেষু

নিবেদন

এই .লেখাগুলো নানা পত্র পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে ছিল। পত্রিকার পাতা ঝরা পাতার মতো। যতক্ষণ বোঁটার বাঁধনে থাকে পাতা ততক্ষণই সবুজ, সজীব। খসে পড়লেই শুকিয়ে যায়। সাময়িক পত্রিকার বাঁধন আরোই আল্‌গা। লোকে দুদিনেই ভুলে যায়। পত্রিকার পাতা থেকে উদ্ধার করে বই এর পাতায় ধরে দিতে পারলে তবেই লেখার আয়ু বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া আমার লেখার পরিমাণ এত বেশি নয় যে, তাকে ফেলে ছড়িয়ে ব্যবহার করা চলে। তাই কুড়িয়ে বাড়িয়ে এক জায়গায় জড় করে পাঠক সমাজের কাছে হাজির করছি। যাঁরা একদিন পত্রিকার পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখেছিলেন তাঁরা যদি আজ বই এর পাতায় একটু মন লাগিয়ে দেখেন তাহলে এদের দ্বিজত্ব লাভ হয়েছে বলে মনে করব।

এ গ্রন্থপ্রকাশে বন্ধু অমিয়কুমার সেন সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছেন। এই সুযোগে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থকার

এই লেখকের—

রবীন্দ্রসম্ভব কাব্য

ইন্দ্রজিতের আসর

ইন্দ্রজিতের খাতা

মানস সুন্দরী

প্রাণবন্যা

ক্রমিক সূচী

ভেজাল—
সমাজে
ও
সাহিত্যে

নির্ভেজাল জিনিস আজকের দিনে তুষ্প্রাপ্য। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে কি পরিমাণ ভেজাল প্রবেশ করেছে তা গৃহস্থমাত্রেই জানেন। কিন্তু জানাটাই যথেষ্ট নয়, এর ফলাফল সম্পর্কে সকলে সজ্ঞান কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কোনো ব্যাধি যখন সমাজের কোনো অংশকে আক্রমণ করে তখন মানুষ সে সম্পর্কে সতর্ক থাকে, কিন্তু যখন সমগ্র সমাজ আক্রান্ত হয় তখন সতর্কতা শিথিল হয়ে আসে। সকলে যেখানে ভুক্তভোগী সেখানে তুর্ভোগের কথা লোকে মনে রাখে না। সেটা ক্রমে গা-সহা হয়ে যায়। ওটাই সব চাইতে বড় বিপদ।

সমাজে যে জিনিস অত্যুগ্র হয়ে দেখা দেয় সেটা সামগ্রিক জীবনেরই একটা প্রকাশ। অর্থাৎ ভেজাল আগে প্রবেশ করেছে মানুষের জীবনে, পরে জীবন ধারণের উপকরণে। মানুষের মধ্যে যদি ভেজাল দেখা দেয় তবে তার নিত্য ব্যবহারের দ্রব্যে ভেজাল দেখা দেবে, এতে আর আশ্চর্য কি? মানুষের গুণ নষ্ট হলে দ্রব্যগুণ নষ্ট হতে বাধ্য। কারণ প্রত্যেক দ্রব্যের প্রস্তুতকারক এবং পরিবেশক মানুষ। এমন ব্যাপক আকারে যা ঘটছে তার ফলাফলও ব্যাপক। সেই জন্যেই বিষয়টি বিশেষভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। যে ঘটনা এমন বিরাট আকারে ঘটে তার পশ্চাতে নিঃসন্দেহে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ভেজালের ইতিহাস তো আছেই, এর একটা ফিলজফিও আছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে ভেজাল জিনিসটা এল কোত্থেকে, কবে থেকে এবং কেন? প্রাচীন সমাজে কি ভেজালের প্রচলন ছিল? একটু অনুধাবন করে দেখলে মনে

হবে লোকসংখ্যা এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে যদি সামঞ্জস্য থাকে তাহলে ভেজালের প্রয়োজন হয় না। বহু যুগ ধরে মানুষ প্রকৃতির হাত থেকেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করেছে। প্রকৃতি দেবী উদার হস্তে দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন। উদারস্বভাবা হলেও তাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। দেবী বহুকাল পূর্বেই মানুষকে আভাষ দিয়ে বলেছিলেন, বৎস, মনে রেখো আমার খাদ্যোৎপাদন ক্ষমতার সীমা আছে, কিন্তু দেখছি তোমার সন্তানোৎপাদন ক্ষমতার সীমা নেই। সময় থাকতে সাবধান হোয়ো। আমি ফতুর হলে তোমার দশা কি হবে একটু ভেবে দেখো। মানুষ কর্ণপাত করে নি, ভেবেছে ওটা কথার কথা। প্রকৃতি দেবী কামধেনু--তিনি সকলের সকল কামনা সিদ্ধ করবেন, তাঁর ভাণ্ডারে কখনো কমতি পড়বে না। নিসর্গ প্রকৃতিকে মানুষ নানাভাবে জয় করেছে কিন্তু আপন প্রকৃতিকে জয় করতে পারে নি। আমরা বলি অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, কিন্তু স্বভাব দোষে যে আবার অভাব বাড়ে সে কথা আমরা ভাবি না।

শতাব্দীকাল পূর্বেই মানুষ টের পেয়েছে যে, উৎপাদন আর লোক-সংখ্যার সঙ্গে তাল রক্ষা করে চলতে পারছে না। প্রয়োজন এবং উৎপাদনে যখন অসমতা দেখা দিয়েছে তখন থেকেই নানারকম জোড়াতালির কথা ভাবতে হয়েছে। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কৃষি বিদ্যার উন্নতি করেছে, অন্যবিধ সামগ্রীর জন্য কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু তাতেও কুলোয় নি। সভ্য সমাজ তখন মাথা ঘামিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নানাপ্রকার সিন্‌থেটিক দ্রব্য প্রস্তুত করেছে। প্রকৃতি যেখানে হাত গুটিয়েছে বিজ্ঞান সেখানে হাত বাড়িয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের আচার ব্যবহার যেমন sophisticated হয়েছে তার উৎপাদন প্রণালীও তেমনি sophisticated হয়েছে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয় সব বস্তু সিন্‌থেটিক প্রণালীতে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। মানুষ তখন প্রচলিত সামগ্রীর পরিবর্তে কোনো substitute বা বিকল্পের সন্ধান করেছে। এটাও যথেষ্ট মাথা ঘামিয়ে করতে হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জার্মেনিতে বহু নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর 'ersatz' আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এ পর্যন্ত মানুষের সুবুদ্ধিই কাজ করে এসেছে। সুসভ্য মানুষ সুসভ্য উপায়ে আপন অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু অনুন্নত দেশে অনটন যেমন বেশি জ্ঞান বিজ্ঞানের বল তেমনি কম। বিজ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা যার নেই সে বিকৃত বুদ্ধির প্রয়োগ করে—অসদুপায়ে দ্রব্যাভাব দূরীকরণের চেষ্টা করে। এই হচ্ছে ভেজালের জন্ম রহস্য এবং আমার মতে অনুন্নত দেশেই ভেজালের জন্ম হয়েছে। উন্নত দেশে এসব জিনিস সহজে প্রশ্রয় পায় না। সেখানে প্রবঞ্চনার অবকাশ কম কারণ ওসব দেশে শাসনযন্ত্র সুদৃঢ়। অনুন্নত দেশের শাসন-ব্যবস্থা শিথিল। প্রবঞ্চনার সুযোগ যেমন সুলভ, দুষ্কৃতি থেকে নিষ্কৃতি তেমনি সহজলভ্য। শাসকগোষ্ঠী যেখানে অক্ষম সেখানে সমাজ যদি সচেতন থাকে তাহলেও দুর্নীতি দমন সম্ভব হতে পারে। কারণ শাসক গোষ্ঠীর চাইতে সমাজ অনেক বৃহৎ, অনেক বেশি শক্তিশালী। অনুন্নত দেশ বলতে আমি বুঝি অনুন্নত সমাজ। বেশির ভাগ মানুষ যদি অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে না করে তাহলে অন্যায় শিকড় গেড়ে বসে। সামাজিক দুর্নীতির মূলে সমাজের ঔদাসীন্য। খাদ্যে ভেজালের নামে বিষ মিশিয়ে যারা মানুষ খুন করে তারা খুনের মামলায় পড়ে না, সমাজে নির্বিবাদে বাস করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শৈথিল্য এবং ঔদাসিন্য মানুষের স্বভাবগত। সব ব্যাপারে নির্বিকার—হচ্ছে, হোক। ঘুষ দেওয়া, ঘুষ নেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, কালাবাজারি করা, ভেজালের ব্যবসা করা - এসব হচ্ছে কলেরা বসন্তের মত tropical disease.

আমাদের দেশ বিজ্ঞানে এখনও অনুন্নতই বলতে হবে, কিন্তু কৌতুকের বিষয় যে, ভেজাল দ্রব্য এখানেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই তৈরি হচ্ছে। শুনেছি ভেজালকারীদের লেবরেটরি আছে এবং সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খাদ্যদ্রব্যের বিকৃতিকরণ চলছে। এ কাজ কাদের দিয়ে করানো হচ্ছে? নিশ্চয় বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দিয়েই। তাহলেই দেখুন আমাদের উচ্চ শিক্ষায় কতখানি ভেজাল প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞানকে বিশিষ্ট এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান বলেই জানতাম, সে যে এমন বিকৃত জ্ঞানে পরিণত

হবে সে কথা কে ভেবেছিল। আমাদের দেশ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দেশ। ভেজালতত্ত্ব নিয়ে কেউ যদি গবেষণা করেন তাহলে আমাদের সমাজ বিজ্ঞানে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হতে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত গবেষণার চাইতে এটি ঢের বেশি মূল্যবান কাজ। সব ব্যাপারের পশ্চাতেই একটি মনোভঙ্গি কাজ করে। আগেই বলেছি, ভেজালেরও একটা ফিলজফি আছে। সেটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। কোন্ যুগে মানুষের মন কি ভাবে কাজ করে তাই দিয়ে সে যুগের ইতিহাস গড়ে ওঠে। এ যুগের ভেজাল শুধু খাদ্য বা অন্য ব্যবহার্য বস্তুতে নয়, মানুষের কাজে কর্মে তো বটেই, আচারে ব্যবহারেও ভেজাল। সভ্য মানুষমাত্রেরই ব্যবহার কৃত্রিম। ভেজালের অপর নাম কৃত্রিমতা।

আমি সমাজ বিজ্ঞানী নই। সাহিত্য নিয়ে এক আধটু নাড়াচাড়া করি। সাহিত্যের কথা ভাবতে গিয়েই এসব কথা মনে হল কারণ সমাজ এবং সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য। সাহিত্য সমাজের সৃষ্টি, সেজন্যে সমাজে যে জিনিস চলতে থাকে সাহিত্যে স্বভাবতই তা অনুপ্রবেশ করে। সমাজে যে রোগ প্রবেশ করে সাহিত্য তা থেকে নিষ্কৃতি পায় না। অর্থাৎ আজকের সমাজে যতখানি ভেজাল, আজকের সাহিত্যেও ততখানি। আধুনিক কাব্য ষোল আনা কাব্য নয়, আধুনিক গল্প উপন্যাস ষোল আনা গল্প উপন্যাস নয়। ভেজাল জিনিস খেয়ে খেয়ে মানুষ পেটরোগা হয়ে যায়, খাঁটি জিনিস হজম করতে পারে না। আজকের সাহিত্য পাঠকদেরও সেই দশা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের দেশে ভেজাল যে পরিমাণ চালু হয়েছে পশ্চিম দেশে ততখানি নয়; তাহলে ও দেশের সাহিত্যে ভেজাল এল কোত্থেকে? খোঁজ নিলে দেখা যাবে ও দেশেও লোক সংখ্যার তুলনায় খাঁটি জিনিসের অভাব দেখা দিয়েছে এবং নানা বিকল্পের ব্যবস্থা হয়েছে— মাখনের পরিবর্তে যেমন মার্গারিনের ব্যবহার, এমন আরো অনেক জিনিস। ভেজাল বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রধানত উপকরণগত ব্যাপার। ইয়ুরোপীয় জীবনে যে ভেজাল দেখা দিয়েছে তা কেবলমাত্র উপকরণজাত নয়, এর মূল আরো গভীরে। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষিভিত্তিক

সমাজ ভেঙে যখন শিল্প বিপ্লব দেখা দিল তখন সমাজে প্রচণ্ড এক তোলপাড় ঘটেছিল। সেই তোলপাড়ে সমাজে প্রচুর তলানি ওপরে ভেসে ওঠে। খুব সাধারণ মানুষ রাতারাতি বড় লোক হয়ে উঠল। এরা বনেদি বড় লোকদের আচার ব্যবহার নকল করতে লাগল। এরই ফলে জন্ম হয়েছে আজকাল আমরা যাকে বলি 'স্নবারি'। এও একরকমের ভেজাল। বিপ্লবের যুগে সমাজে নানা রকমের মিশ্রণ ঘটেছিল। জীবিকা এবং জীবনে খুব সচ্ছন্দ মিলন ঘটে নি। যে কোন অ-সম মিশ্রণের নামই ভেজাল। ও দেশের ভেজাল খানিকটা শিল্প বিপ্লব জাত, খানিকটা দুই মহাযুদ্ধের ফল।

দিনের পর দিন ভেজাল গ্রহণ করার ফলে মানুষের পাক-যন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়, সে কথা আগেই বলেছি। দেহ এবং মন--দুই ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। । গুরুপাক অর্থাৎ নির্ভেজাল জিনিস পেটেও সয় না, মনেও না। শেক্সপীয়ার নির্ভেজাল কাব্য রচনা করেছিলেন। আজকের পাঠক অতিষ্ঠ বোধ করে। বলে, অতিরিক্ত কবিত্ব স্থানে অস্থানে কবিত্বের ছড়াছড়ি--এতটা ভাল লাগে না। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও সেই অভিযোগ —বড় বেশি কবিত্ব, যেমন ছন্দোবদ্ধ পদ তেমনি পদলালিত্য। অনেক মায়েদের মুখে শুনেছি, ছেলেপেলেরা দুধ খেতে চায় না, বলে কেমন দুধ দুধ গন্ধ। কিছু একটা মিশিয়ে দুধের গন্ধটাকে চাপা দিতে হয়। এখন কবিতার বেলায়ও তাই হয়েছে। অনেক পাঠকই কবিতার মধ্যে কবিতা কবিতা গন্ধ পান। দুধ পেটে না সইলে একটু জল মিশিয়ে যেমন হাল্‌কা করে নিতে হয় কবিতার বেলায়ও এখন ছন্দটাকে ঢিলে করে দিয়ে কিম্বা একেবারেই বাদ দিয়ে, ভাবাটাকে যদ্দূর সম্ভব গদ্যঘেঁসা করে বাজারে হাজির করতে হয় নতুবা বাজারে কাটে না। তাই বলে জিনিসটা যে খুব সহজ পাচ্য হয় এমন নয়। আধুনিক কবিতা সহজ বোধ্য জিনিস নয় একথা— সকলেই স্বীকার করবেন। এরও মূলে ভেজাল। আগে যে স্নবারি নামক ভেজালের উল্লেখ করেছি আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে সেই স্নবারি প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ. করেছে। অযথা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ স্নবারির লক্ষণ। কাব্যে সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের কোনোই স্থান নেই এমন কথা কেউ বলবে না।

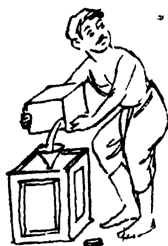
কিন্তু খনিজ পদার্থকে যেমন ব্যবহারোপযোগী করবার জন্যে শোধন করে নিতে হয় পুঁথিপড়া পাণ্ডিত্যকে কাব্যোপযোগী করবার জন্যে তেমনি রসান্বিত করে নিতে হয়। crude পাণ্ডিত্য অর্থাৎ পুঁথির পাতা থেকে নেওয়া যে পাণ্ডিত্য 'অবিকল' অবস্থায় থাকে, সে পাণ্ডিত্য কাব্যকে ভারাক্রান্ত করে, গুণান্বিত করে না। কাব্যসৃষ্টিতে যেমন, এ যুগের কাব্য সমালোচনায়ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের এক হাস্যকর প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। শেক্সপীয়ার রেনেসাঁস যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান কতখানি আয়ত্ত করেছিলেন আজকের পণ্ডিতদের সেটাই হল প্রধান জিজ্ঞাসা। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও ঐ প্রশ্ন উঠেছে—কেউ কেউ অত্যন্ত করুণকণ্ঠে মন্তব্য করেছেন—আহা উনি যদি আরেকটু পড়াশোনা করতেন। বলাবাহুল্য কয়েকটা পরীক্ষা পাশের ছাপ যদি থাকত তাহলে শেক্সপীয়ার বা রবীন্দ্রনাথ কারো সম্পর্কেই এই প্রশ্নটা উঠত না। কবির বিচারে লোকটা কবি কিনা সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল লোকটা পণ্ডিত কিনা। এ জাতীয় পণ্ডিত সমালোচকদের পাণ্ডিত্যও ভেজাল পাণ্ডিত্য। পাণ্ডিত্যটা যদি খাঁটি হত তাহলে সেটা যে পুষ্টিকর খাদ্যের মত হাড়ে মাংসে মজ্জায় লেগে যায় সেটা বুঝতে বিলম্ব হত না। কবির পাণ্ডিত্য কাব্য হয়ে প্রকাশ পায়, সেটা কবিতার গায়ে, তাপ্পি মেরে লাগানো যায় না।

শেক্সপীয়ার এবং সে যুগের অন্যান্য নাট্যকারদের সম্পর্কে আরেক অভিযোগ হল, এঁদের নাটকে বড় বেশি নাটুকেপনা। শুনুন কথা, নাটক যদি নাটকীয় না হবে তবে পড়ে লাভ কি, রঙ্গমঞ্চে দেখেই বা আনন্দ কি? এখন নাটকের সবচাইতে বড় প্রশংসা হল—কথাবার্তা, অভিনয় এমন স্বাভাবিক—আজকালের ভাষায় এমন রিয়েলিষ্টিক যে, নাটক দেখছি বলে মনেই হয় না। এ বড় মজার কথা—যা দেখলে নাটক বলে মনেই হয় না এমন নাটক আমি দেখতে যাব কেন? আজকে আমাদের জীবনে এবং স্বভাবে কোন বাড়তি জিনিসের অবকাশ নেই। যে কোন বাড়তি জিনিসকেই আমরা বাড়াবাড়ি বলে মনে করি। এই কারণে কাব্য ও শিল্পকে ছেটে কেটে ক্রমেই ন্যাড়া করে তোলা হচ্ছে। হ্যামলেট সদৃশ যুবক আজকের সমাজেও

আছে—ভয়ঙ্কর দ্বিধাগ্রস্ত সমস্যাসঙ্কুল যার জীবন, কিন্তু সে কখনো একান্তে বসে—To be or not to be সদৃশ উচ্ছ্বাসময় খেদোক্তি উচ্চারণ করবে না। এ শুধু নাটকেই সম্ভব। বলাবাহুল্য শেক্সপীয়ারের যুগেও কোন ব্যক্তি এরূপ ভাষায় স্বগতোক্তি করত না। শেক্সপীয়ার খুব ভাল করেই তা জানতেন। তথাপি তিনি তাঁর নাটকে এ জাতীয় জিনিসকে স্থান দিয়েছেন। কারণ মুখে না বললেও মানুষ মনে মনে এসব কথা ভাবে। মানুষের মনই সবচাইতে বড় রঙ্গমঞ্চ। সেখানে যা ঘটছে মহৎ নাট্যকার তাকেই উদ্ঘাটিত করেন। কেবলমাত্র বাস্তবকে নিয়ে কাব্য সাহিত্যের কারবার নয়, জীবনের সম্ভাব্যতাকে নিয়ে কারবার। মানব জীবনের সম্ভাবনা বহু বিস্তৃত। শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ সদৃশ কবিরা বাস্তবের সঙ্গে সম্ভাবনাকে জুড়ে দিয়ে মানব জীবনের পূর্ণাবয়ব চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছেন। মহৎ কবি মাত্রই নাট্যকার, বিচিত্র জীবন নাট্যকেই তাঁরা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কাছে গোটা জীবনটাই নাট্যমন্দির, আমাদের কাছে হট্টমন্দির। আমরা সাধারণ মানুষরা দৈনন্দিন হাটবাজার নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। এজন্য কবির আঁকা জীবনের ছবিতে আমরা শুধু আতিশয্য দেখতে পাই। পূর্বকালীন নাটকে পাত্রপাত্রীরা কবিতায় কথা বলেছেন। আজকের পাঠক বা শ্রোতার কাছে সেটা অত্যন্ত হাস্যকর বলে মনে হয়। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই সাম্প্রতিক কালেও কবিতায় নাটক (verse drama) লিখবার চেষ্টা হয়েছে। নাটককে নাটকীয় করার উদ্দেশ্যেই সেই চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা সফল হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। কারণ এযুগের নাট্যমোদীরা তাকে খুশি মনে গ্রহণ করেন নি। তাহলেও নাট্যকারদের এই দুঃসাহসী প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। ইংরেজী সাহিত্যে 'heroic play' বলতে বিশেষ এক যুগের বিশেষ এক শ্রেণীর নাটককে বোঝায়। আমার মতে সত্যিকারের heroic play আজকের দিনের verse drama. কারণ এসব লেখক যতখানি সাহস দেখিয়েছেন এমন আর কেউ নয়।

নাটকের কথা ছেড়ে গল্প উপন্যাসের কথা ভাবুন। আজকের গল্প তার গল্পত্ব বিসর্জন দিয়েছে। স্কট ডিকেন্স, জেন অস্টিন দিব্যি জাঁকিয়ে গল্প

বলতেন। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র ঠিক সেই ভাবেই গল্প বলেছেন। পড়ে আমরা আনন্দ পেয়েছি। এখন শুনছি গল্পের মধ্যে গল্প জিনিসটা নাকি সাবেকি ব্যাপার, এ যুগে অচল। তাল পরিমাণ বাজে কথার মধ্যে তিল পরিমাণ গল্প মিশিয়ে দিলে তবে সেটা ইনটেলেকচুয়েল আকার ধারণ করে। অতিশয় স্থূলকায় উপন্যাসে অত্যন্ত ক্ষীণকায়া একটি কাহিনীকে পেগ হিসাবে ব্যবহার করে—তাতে রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতির নানা আলোচনা ঝুলিয়ে দিতে পারলেই তাকে ইনটেলেকচুয়েল আখ্যা দেওয়া যায়। সাহিত্যে সব জিনিসেরই স্থান আছে, কিন্তু কাব্যে নাটকে গল্পে উপন্যাসে যার যার নিজস্ব মাল মশলা কমে গিয়ে যদি অবান্তর জিনিসের ভীড় বাড়তে থাকে তাহলে এদের চরিত্রহানি তো হবেই, ক্রমে সাহিত্যের স্বাভাবিক স্রোতও ক্ষীণ হয়ে আসবে। কালের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে সাহিত্য বদলাবে এগোবে। কিন্তু ইদানীং যে অগ্রগতি দেখছি সেটা খুব স্বাভাবিক গতি নয়, মনে হয় জোর করে লেজ মুচড়ে মুচড়ে কেবলই মোড় ঘোরাবার চেষ্টা হচ্ছে। উদ্দেশ্য চমক লাগানো এবং সেটা কৃত্রিম উপায়ে। আধুনিক সাহিত্য নির্গুণ নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। আগেই বলেছি কৃত্রিমতার অপর নাম ভেজাল।



ভাষা
ও
সাহিত্য

আমাদের দেশ মূর্তি পূজার দেশ। মূর্তি সম্পর্কে আমরা অতিমাত্রায় সচেতন। আমাদের অগণিত দেবদেবীর মধ্যে একটিকেও আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি নি কিন্তু প্রত্যেকেরই একটি মূর্তি আমরা কল্পনা করে রেখেছি—কেউ চতুরানন, কেউ ত্রিনয়ন, কেউ চতুর্ভুজ, কেউ বা দশভূজা এমন আরো কত। কিন্তু আমাদের স্বভাব বড় বিচিত্র—এই আমরাই আবার কোনো কোন ব্যাপারে মূর্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। যার বিশেষ একটি মূর্তি আছে তারও মূর্তি আমরা ভুলে যাই; যার আকার আছে তাকে ঠিক নিরাকার না করলেও কিম্ভূত কিমাকার করে তুলি। অ-দৃষ্ট এবং অনির্দিষ্ট কোনো জিনিসের মূর্তি আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। কিন্তু যে জিনিস নিত্য দেখছি, শুনছি, হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি তার রূপ এবং স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। কাব্য সাহিত্য হচ্ছে সেই জাতীয় জিনিস। সাহিত্য নিয়ে আমরা নিত্য ঘাটাঘাটি করি কিন্তু তার রূপ এবং স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্ট কোন ধারণা নেই।

সেদিন আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যখন বলেছিলাম যে, সাহিত্য জিনিসটা সাকার সেটা নিরাকার নয় তখন শ্রোতারা বেশ একটু চমকে উঠেছিলেন। সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা বাঙলা ভাষায় খুব বেশি হয় নি; যেটুকু হয়েছে তাও অনেকটা নিরাকার ব্রহ্মের আলোচনার মতো। অবশ্য কাব্যরস যে কি বস্তু সেটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যে আদৌ সহজসাধ্য ব্যাপার নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। বস্‌ওয়েল ডক্টর জনসনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন what is poetry? জনসন উত্তরে বলেছিলেন, ও বস্তুটা কি নয় সেটা বরং বলা সহজ (Sir, it is easier to say what it is not)। বাস্তবিক পক্ষে

অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে দেশী বিদেশী নানা মুনির নানা মতামত পাঠ করে সাহিত্য কি বস্তু আমি আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি ; কি নয় সেটা বরং খানিকটা বুঝেছি। সাহিত্য-তত্ত্বজ্ঞানীরা যা বলেছেন তার বেশির ভাগ কথাই খুব স্পষ্ট নয়। তাঁর কারণ রস-সৃষ্টির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই বলেই শিল্প সাহিত্যের খেয়ালী চরিত্রটি পুরোপুরি তাঁদের কাছে ধরা দেয় নি। অবশ্য পণ্ডিত সমালোচকরা কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে কখনো কখনো খুব সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, কিন্তু সে সব প্রশ্নের তাঁরা যে জবাব দিয়েছেন রসিক সমাজে সব সময়ে তা গ্রাহ্য হয় নি। অপর পক্ষে কবি সাহিত্যিকরা যখন কাব্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন তখন সব কথা স্পষ্ট না হলেও কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ এমন কিছু বলেছেন যার ফলে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো সংশয়ের অন্ধকার বিদীর্ণ করে বিষয়টি সম্পর্কে অনেকখানি আলোক বিকীর্ণ করেছেন।

সাহিত্যের মূল্য বিচার রূপ ও রসের পরীক্ষায়। রস জিনিসটা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়—চক্ষু কর্ণ স্পর্শের গোচর নয়, অনুভূতিসাপেক্ষ অর্থাৎ একে ঠিক সাকার বলা চলে না। তবে জলের যেমন আকার নেই কিন্তু যে আধারে রাখা হয় সেই আধারের আকার গ্রহণ করে, রসও খানিকটা সেই রকম। কাব্যে সাহিত্যে রসের আধার হল ভাষা। চিত্রশিল্পের ভাষা যেমন রেখা এবং রং, সংগীত শিল্পের ভাষা যেমন সুর তাল মান, কাব্য শিল্পের ভাষা তেমনি শব্দ এবং ছন্দ। শব্দের সম্পদে, গঠনের সৌষ্ঠবে, ছন্দের গুঞ্জনে কাব্যের রূপ ফুটে ওঠে। এটিই তার মূর্তি। যা গোড়ায় ছিল নিরাকার সে তখন সাকার হয়ে ওঠে। মনের ভাবকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করবার ক্ষমতাকেই বলে শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা। আবার মনের ভাব তখনই যথাযথভাবে ব্যক্ত হয় যখন সেই ভাবটি একটি মূর্তি পরিগ্রহ করে এবং সম্পূর্ণরূপে না হলেও কতক পরিমাণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। অতএব কাব্যস্রষ্টার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে নিরাকার রসকে আকার দান করা। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, দ্বিপদী, চৌপদী, চতুর্দশপদী ইত্যাদির নামকরণ আকারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। রসকে যখন আমরা নিরাকার বলি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা

রসের অনির্বচনীয়তার কথাই উল্লেখ করি। অনির্বচনীয়কে বচন দান করার মধ্যেই কবির কৃতিত্ব। যা ছিল অনির্বচনীয় সে যখন বচন লাভ করল তখনই সে মূর্তিও লাভ করল। স্বরূপ তখন রূপ পেল। যে অনুভূতি ছিল অনুমানের ব্যাপার সে অনুভূতি প্রত্যক্ষ হল। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি অতি সুন্দর করে বলেছেন, "রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তার আর একটা দিক আছে যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাষ নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়। বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বই-এর নাম দিয়েছিলাম 'ছবি ও গান' ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতিমাত্রায় গূঢ় নয়—তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণ বিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর।" (সাহিত্যের স্বরূপ, 'সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। আমাদের মনের যে ভাবের আকুতি তাকে ভাষার বেষ্টনে বাঁধতে হয়। এই কারণে সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাব এবং ভাষার সমান মূল্য। ভাবকে যদি বলি কাব্যের আত্মা তবে ভাষা তার দেহ। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে ভাষাকে বলা হয়েছে 'কাব্য শরীর'। আমরা সাধারণত আত্মাকে দেহের চাইতে উচ্চস্থান দিই। সেটা খুব যুক্তিযুক্ত কথা নয় কারণ দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করা চলে না। মানুষের বেলায় যাই হোক, যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নেই তার আত্মার সৌন্দর্য আছে এমন কথা কোনো সাহিত্যরসিক স্বীকার করবেন না। আধ্যাত্মিক বিচারে কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট বলতে পারি নে, কিন্তু সাহিত্যিক বিচারে দুই-এর মূল্য সমান তো বটেই বরং দেহের মূল্য খানিকটা বেশি। কারণ অনেক উঁচু দরের কথা, ভালো ভালো কথা আমি পরপর সাজিয়ে যেতে পারি কিন্তু যতক্ষণ না তাকে ভাষার কারুকলায় সৌষ্ঠব বা সুষমা দিতে পারছি ততক্ষণ তা সাহিত্য পদবাচ্য হবে না। অবশ্য কেবলমাত্র ভাষা গৌরবেই সাহিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় এমন কথা কখনো বলব না। তবে একথা নিশ্চিত যে, বক্তব্য যৎসামান্য

হলেও প্রকাশভঙ্গির চমৎকারিত্বেই কোনো কোনো জিনিস সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। এমন অনেক গীতি কবিতা আছে যার অর্থগৌরব অর্থাৎ আত্মিক মাহাত্ম্য বিশেষ কিছুই নেই, কিন্তু তার কাঁচা অঙ্গের লাবণি যখন ভাষার রং-এ ছবির মত উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে তখন মন নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হয় এবং তাকে খাঁটি কাব্য বলে গ্রহণ করতে কেউ আপত্তি করে না। বোধ করি এই কারণেই কোলরিজ কাব্যকে বলেছেন—the best words in the best order. সাহিত্যিকমাত্রই ভাষার কারিগর। একটি মনোমত শব্দ খুঁজে বের করবার জন্যে কবি মাথা খুঁড়ে মরেন। কীটস্ বলেছিলেন, I am a lover of beautiful phrases. প্রকৃতপক্ষে প্রেমিকের স্বভাব আর কবি সাহিত্যিকের স্বভাবে মিল আছে, তেমনি আবার নারী দেহে এবং কাব্যদেহেও মিল আছে। দুটিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদের রক্তমাংসের দেহটিকে আদর করেন কবি তেমনি শব্দালঙ্কারে কাব্যদেহটিকে মনের মতো করে সাজান।

কাব্য, সাহিত্যকে আমরা যখন শিল্প বলে উল্লেখ করি তখন মনে রাখতে হবে যে, ঐ শিল্পকলা অনেকাংশে প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাহিত্যের আর্ট প্রধানত ভাষাগত। আমাদের সাহিত্যে গোড়ার দিকে ভাষার কারুকলার প্রতি তেমন নজর দেওয়া হয় নি। কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস সরল ভাষায় সহজ ছন্দে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী রচনা করেছিলেন। কাব্যকাহিনী শোনানোর চাইতে ধর্মকাহিনী শোনানোর প্রতিই তাঁদের অধিকতর আগ্রহ ছিল। ভাষাগত কারুকার্যের প্রতি তাঁরা তেমন মনোযোগ দেন নি। বৈষ্ণব কবিরা এ বিষয়ে অধিকতর যত্ন নিয়েছেন। পরবর্তীকালে ভাষার ব্যবহারে সর্বাধিক সচেতনতা দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র। বলতে গেলে তিনিই বাঙলা কাব্যে প্রথম আর্টিস্ট। বাকচাতুর্যের যত্নকৃত চর্চা তাঁর কাব্যেই প্রথম আমরা লক্ষ্য করেছি। এলিয়ট যে অর্থে কবিকে craftsman বলেছেন সে অর্থে ভারতচন্দ্রকে বলা যায় ভাষার কুশলী কারিগর।

অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, কেবলমাত্র ভাষার কারুকার্য দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ভাবের সঙ্গে ভাষার সাযুজ্যকেই বলে সাহিত্যের আর্ট। দু'এ মিলে রসসৃষ্টি। কোনো একটিকে প্রাধান্য দিলে শিল্পকলা বিকলাঙ্গ হতে বাধ্য। সকল শিল্পের গোড়ার কথা মাত্রাবোধ। প্রাচীনকালের সাহিত্যাচার্যরা এ বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে ক্লাসিকেল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ মাত্রাবোধ। রেনেসাঁস্ যুগে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হল। সীমাহীন জগতের বিস্ময়, বসুন্ধরার অন্তহীন বৈচিত্র্য, আপন শক্তির নবলব্ধ চেতনা, এক কথায় Brave new World আবিষ্কারের উল্লাস মানুষকে অসম্বৃত করে তুলেছিল। (এখানে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের কথাই বলছি।) ভাবের উন্মাদনায় কাব্যে সাহিত্যে স্বভাবতই অতিশয়তা দেখা দিল। দু' শতাব্দী পূর্বে চসার যে কাব্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন তার উচ্ছেদ হল। বহু ভ্রমণে, বহু দর্শনে, বহু শ্রুতিতে চসারের মন ছিল সমৃদ্ধ। কাব্যের যে অঙ্গসজ্জার প্রয়োজন আছে সেটি যেমন তাঁর জানা ছিল, তেমনি অলঙ্করণ বাহুল্য যে অনাবশ্যক তাও তাঁর অজানা ছিল না। এই কারণে চসারকে বিশেষ এক কাব্যাদর্শের স্রষ্টা বলা যেতে পারে। কিন্তু সে আদর্শ স্থিতিলাভ করবার পূর্বেই রেনসাঁসের প্রবল বন্যা এসে তার ভিত ধসিয়ে দিল।

রেনেসাঁস মানুষের মনে যে উদ্দামতা এনে দিয়েছিল তার ফলে মানুষের ভাষায়ও যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা স্বাভাবিক, সদ্যজাগ্রত মন যখন পক্ষ বিস্তার করে তখন তার দাবি মেটাবার জন্যে ভাষাকে সারাক্ষণ শশব্যস্ত থাকতে হয়। অব্যবহারে মরচে-পড়া শব্দ নতুন ব্যবহারে চক্‌চকে হয়ে ওঠে, অনেক অপোগণ্ড শব্দ সাবালকত্ব লাভ করে—নতুন অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত হয়। অনেক নতুন শব্দের জন্ম হয়। রেনেসাঁস যুগে ইংরেজি ভাষার সম্পদ সমৃদ্ধি অনেক বেড়েছে। কিন্তু সে সম্পদের ব্যবহারটা হয়েছে একটু বেহিসেবী, বেপরোয়া রকমে। রোম্যান্টিক সাহিত্যের অনেক গুণ, দোষের মধ্যে ও অযথা বাক্যবাগীশ। সব সময়ে একটু বাড়িয়ে বলে, এক কথার জায়গায় দশ কথা বলে। ক্লাসিকেল সাহিত্য কমিয়ে বলে এমন নয়।

সে স্বভাবত স্বল্পভাষী, যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই বলে, অতিরিক্ত কিছু বলে না। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, কাব্যকে একেবারে চাঁচা-ছোলা হতে হবে, তার কোন প্রকার সাজগোজের প্রয়োজন নেই। মেয়েরা এক-আধটু সেজেগুজে থাকলে আমাদের চোখে ভালই লাগে, কাব্যের বেলায়ও তাই। ওকে আটপৌরে পোশাকে দেখতে আমাদের ভালো লাগে না। কীটস্ যাকে বলেছেন 'fine excess' কাব্যের পক্ষে তা অত্যাবশ্যক। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কাব্যের পক্ষে যা অত্যাবশ্যক গদ্যের পক্ষে তা অত্যাবশ্যক নয়। কাব্যে-অল্পবিস্তর অতিশয়তার জন্য সকলেই প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু গদ্যে অনেকেই সেটা বরদাস্ত করতে পারেন না।

আশ্চর্যের বিষয় যে, রোমান্টিক আতিশয্যের ডামাডোলের মধ্যেও বেকন অত্যাশ্চর্য গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন। বাক্যের এমন মেদলেশহীন আঁটসাট গড়নের কথা সে যুগে ভাবাই যেত না। ক্লাসিকেল রচনারীতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। ক্ষুরধার বুদ্ধির রচনা কখনো শিথিল-রসনা, বিস্রস্ত-বসনা, শ্লথচরণা হয় না। সে ক্ষিপ্রগতি অথচ সংযত-মতি; ঘনপিনদ্ধ তার কায়া। গদ্যের এটাই স্বাভাবিক মূর্তি। বেকনকে বাদ দিলে সে যুগের অন্যান্য গদ্য রচনা না গদ্য না পদ্য। চসারের কাব্যরীতি যেমন রেনেসাঁস যুগে স্থান পায় নি, বেকনের গদ্যরীতিও সে যুগে কেউ অনুসরণ করে নি।

কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক মনোভাব খানিকটা ইংরেজের স্বভাবগত। ওদেশের ঘন কুয়াশা বেশির ভাগ জিনিসকে চোখের আড়াল করে রাখে। সামান্যই দেখে, বাকিটুকু অনুমান করে নেয়। অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে ইংরেজি রোমান্টিকতার বোধ করি এটাও একটা কারণ। অবশ্য আমরা বঙ্গবাসীরাও অতিমাত্রায় রোমান্টিক যদিচ এ দেশে সূর্যালোকের অভাব নেই। আমাদের ব্যাধি অন্যরকম, আমরা দেখেও দেখি না। যাক আমাদের কথা পরে হবে। ইংলণ্ডের তুলনায় ফ্রান্সকে সূর্যকরোজ্জ্বল দেশ বলা যেতে পারে। ওদেশে রোমান্টিসিজম এবং আবছা ভাব স্থিতি লাভ করে নি। ওদেশে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা যতখানি হয়েছে কল্পনাবৃত্তির ততখানি

নয়। কল্পনাপ্রবণ অভিনিবিষ্ট মন ইংরেজী কাব্যে যে গভীরতা দিয়েছে, অতিমাত্রায় sophisticated ফরাসী কাব্যে সে গভীরতার অভাব আছে। অপর পক্ষে ফরাসী মনের যুক্তিবাদী বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি ফরাসী গদ্য ভাষাকে যে ঔজ্জ্বল্য এবং তীক্ষ্ণতা দিয়েছে ইংরেজী গদ্যে তা নেই। ফরাসী গদ্যের প্রসাদগুণ যে কোনো সাহিত্যের ঈর্ষার বস্তু। বাঙালী লেখকরা সকলেই ইংরেজী পাঠশালার ছাত্র। ফলে আমাদের কাব্য, সাহিত্য অনেকটা ইংরেজীর আদলে গড়ে উঠেছে। তাতে ক্ষতি হয়েছে এমন কথা কেউ বলবে না। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ফরাসী সাহিত্যের চর্চা আমরা করি নি বলে সাহিত্য রচনার বিশেষ করে গদ্য রচনার কারুকলা এখনো আমরা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারি নি। অথচ বাঙলা ভাষার মধ্যে একটি স্বভাবজাত প্রসাদগুণ আছে, আর বাঙালী মনের মধ্যেও একটি সূক্ষ্ম রুচিবোধ রয়েছে। কাজেই ভাষাগত craftsmanship-এর প্রতি যদি আমাদের যথেষ্ট নজর থাকত তা হলে আমাদের গদ্যরীতির অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সাধন সম্ভব হত।

প্রধানত আমাদের গদ্য সাহিত্যের কথা মনে রেখেই এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছিলাম। ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই বঙ্কিমচন্দ্র তাকে যে বলিষ্ঠতা দিয়েছিলেন খুব কম সাহিত্যের ভাগ্যেই সেটি ঘটেছে। বাঙলা গদ্যের জন্ম উনিশ শতকের গোড়ায়। কিঞ্চিদধিক দেড় শ' বৎসরে সে গদ্যের যে উন্নতি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। আধুনিক যুগের গতি স্বভাবতই দ্রুত। যুগের গতিবেগের দরুণই ভাষার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বাঙলা গদ্য বাঙলা সাহিত্যের পরিণত বয়সের সন্তান। বলতে গেলে জন্ম মুহূর্তেই ও দেহে মনে সুগঠিত, আচারে ব্যবহারে সাবালক। শৈশব পরিচর্যা হয়েছে রামমোহন বিদ্যাসাগরের হাতে, তাতেই ওর হাড় মজবুত হয়েছে। আর কৈশোরে পদার্পণ করতে না করতেই বঙ্কিম তার দেহে লাবণ্য এবং মনে বুদ্ধির প্রাচুর্য এনে দিয়েছিলেন, এক কথায় দেহে মনে যৌবনের উদ্গম হয়েছিল।

আমাদের গদ্য সাহিত্য যে জন্মাবধি সাবালক তার কারণ তাকে

প্রথমাবধিই কষ্টসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর দু'জনকেই সে যুগের নানা ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদে নিযুক্ত হতে হয়েছে। আমাদের সদ্যোজাত বাঙলা গদ্যের সাহায্যেই প্রচলিত ধ্যান ধারণার অযৌক্তিকতা প্রমাণিত করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। সেখানেই বাঙলা গদ্য অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ভাষাকে যুক্তিতর্কের উপযোগী বাহন করতে বহু সময় লেগে যায়। বাঙলা ভাষাকে ওই জন্যে খুব বেশি কালক্ষেপ করতে হয় নি। রামমোহন বিদ্যাসাগরের ন্যায় যুক্তিবাদী মানুষের পরিচর্যার ফলে ওই দুঃসাধ্য সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করেছে। সাহিত্যের বাহন হতে হলে ভাষাকে একদিকে যেমন যুক্তি তর্কের টাল সামলাতে হয় অপর দিকে তেমনি মনের নিগূঢ়তম আনন্দ বেদনা প্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। কমনীয়তা এবং বলিষ্ঠতা—একযোগে এই দু'-এরই চর্চা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা এই উভয় গুণের অধিকারী। মানব হৃদয়ের স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রকাশের জন্য ভাষার যেটুকু আর্দ্রতার প্রয়োজন সেটুকু অবশ্যই ছিল, কিন্তু অনাবশ্যক ভাবোন্মাদনায় সে ভাষাকে কোথাও তিনি জলো জলো করেন নি। তাঁর ভাষায় জলীয় অংশ নেই বললেই চলে। আমি অন্যত্র ওই ভাষাকে dehydrated ভাষা বলে বর্ণনা করেছিলাম।

প্রত্যেক জাতির কতকগুলো মূলগত বৈশিষ্ট্য (ethnical characteristics) থাকে। তার ছাপ সে দেশের মানুষের মুখাবয়বের এবং দেহাবয়বে প্রকাশ পায়, ভাষার বেলায়ও তাই। তারও কতকগুলো মূলগত বৈশিষ্ট্য আছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর উভয়েই মহামনীষী ব্যক্তি। তাঁরা বাঙলা ভাষার স্বভাব ধর্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ রেখে বাঙলা গদ্যের ভিত তৈরি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভিতের উপরে সৌধ রচনা করেছেন। যতটুকু মজবুদ হলে সকল রকম জ্ঞানচর্চা এবং জিজ্ঞাসাপূরণ সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ভাষাকে সেই স্তরে তুলে দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাঙলা গদ্য যে অভাবনীয় সমৃদ্ধি লাভ করেছে তারও মূল প্রধানত বঙ্কিম প্রতিভায় নিহিত। এমন কি বাঙলা গদ্যে আজ যে

কথ্য ভাষার প্রচলন হয়েছে তারও বীজ উপ্ত হয়েছিল বঙ্কিমের বহু নিন্দিত গুরুচণ্ডালী দোষ দুষ্ট ভাষার মধ্যে। সাধু ভাষার চরিত্র কেবলমাত্র ক্রিয়া-পদের উপর নির্ভরশীল নয়। সাধু ভাষার সাধুতা অবিমিশ্র, প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার সেখানে নিষিদ্ধ। আজ সকলেই স্বীকার করবেন যে, ভাষার শক্তিবৃদ্ধির জন্যে অল্পাধিক পরিমাণে গুরুচণ্ডালী দোষ (গুণ বলাই বাঞ্ছনীয়) অত্যাবশ্যক। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধু ভাষায় এবং চলতি ভাষায় বিরোধ থাকলেও, চলতি ভাষাকে অসাধু ভাষা হলে চলবে না। অসাধু ভাষা কখনও সাহিত্যের বাহন হতে পারে না। ভাষাকে সব সময় সাহিত্যের সম্ভ্রম রক্ষা করে চলতে হয়। হুতোম প্যাঁচার নকশা এবং আলালের ঘরের দুলাল ভাষার অগ্রগতিতে যতখানি সহায়তা করেছে সাহিত্যের অগ্রগতিতে ততখানি নয়। চলতি ভাষায় প্রথম খাঁটি সাহিত্য গ্রন্থ বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র"। সতেরো আঠারো বৎসরের বালকের পক্ষে এ এক অত্যাশ্চর্য কীর্তি। রবীন্দ্র জিজ্ঞাসুরা একটি কথা লক্ষ্য করে দেখবেন যে, উক্ত গ্রন্থে তিনি গদ্য রচনায় যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ওই বয়সের কাব্য রচনায় ততখানি শক্তির পরিচয় নেই। কলম ধরেই এ জাতীয় গদ্য রচনা অচিন্তনীয় ব্যাপার। এই ভাষারই পূর্ণ প্রতিভায় উদ্ভাসিত জ্বলজ্বলে ঝলমলে রূপ পরে ছিন্নপত্রের পাতায় প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র না হলে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হত না, এ কথা বাহুল্য মাত্র। তা হলেও একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কীর্তিকে explain করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট প্রতিভা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের যখন আগমন তখন বাঙলা ভাষার শক্তি সামর্থ্য এতখানি হয় নি যা স্বাভাবিক নিয়মে রবীন্দ্র সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারে। গদ্যের চাইতে পদ্যের পুঁজি অবশ্যই কিছু বেশি ছিল, কিন্তু তার দৌলতে রবীন্দ্র কাব্যের উদ্ভবকে স্বাভাবিক বলা চলে না।

ইতিপূর্বে মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করেছেন; হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রও মহাকাব্যের মহড়া দিয়েছেন। কিন্তু তার ফলে বাঙলা কাব্যের শক্তি

সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয় নি। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, সব সাহিত্যেই মহাকাব্যের জন্ম হয়েছে আগে, গীতিকাব্য বহু পরে। মহাকাব্যের অবমাননা না করেও বলা চলে যে জিনিসটা আকারে বৃহৎ এবং বৃহৎ বলেই ব্যবস্থাপনায় একটু স্থূল। বেশিরভাগ জিনিসেরই আরম্ভ স্থূলাকারে। ওই একই কারণে উপন্যাস আগে, ছোট গল্প পরে। শুধু শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার দেখা গিয়েছে। সেই আদি যুগে মানুষ বাসস্থানের জন্যে বড় বড় পাথর জড় করে গুহা ঘর তৈরি করেছে কিংবা বড় বড় গাছের গুঁড়ি সাজিয়ে মাথা গুঁজবার স্থান রচনা করেছে, কিন্তু গাছের পাতা কিম্বা খড়ের ছাউনি দিয়ে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরের কল্পনা করতে বহু যুগ লেগে গিয়েছে। সূক্ষ্ম জিনিসের কল্পনা সহজে আসে না। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের কত যুগ পরে এসেছে একটি চতুর্দশপদী কবিতা। বাস্তবিকপক্ষে মেঘনাদবধ কাব্যের চাইতেও বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদনের বড় দান চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি বৃহৎ ব্যাপার কিংবা গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা বাদ দিয়েও নিত্য দিনের সামান্য কথা নিয়েই যে গদ্যে পদ্যে অসামান্য রসের সৃষ্টি করা যায়, রবীন্দ্রনাথই বাঙলা ভাষায় সর্বপ্রথম সে দুঃসাধ্যসাধন করেছেন। সাহিত্যের, বিশেষ করে ভাষার আসল পরীক্ষা এখানেই। ভাষার দেহটিকে অতিশয় নমনীয়, কমনীয় এবং চিক্কণ—ইংরেজীতে যাকে বলে supple করতে পারলে তবেই ভাষাকে দিয়ে সব কাজ করানো যায়, তাকে ইচ্ছামত যেদিকে খুশি হেলানো দোলানো যায়। লেখার ভাষাকে যতটা সম্ভব মুখের ভাষার কাছাকাছি আনা প্রয়োজন। এই সেদিনও আমাদের ভাষা ছিল লেখায় এক কথায় আর। কথা যখন ঘরে বাইরে দুই ভিন্ন মূর্তিতে দেখা দেয় তখন দুটোই খানিকটা অস্বাভাবিক ঠেকে। বাইরে চোগা চাপকান শামলা আঁটা সুসজ্জিত মূর্তি, ঘরে আদুড় গায়ে হাঁটু-ধুতি পরা আটপৌরে চেহারা। আমাদের ভাষার মূর্তিও ছিল এমনি অস্বাভাবিক। লিখতে গেলে এক, বলতে গেলে আর। ঘরোয়া কথাকে যখন সৌখিন রূপ দেওয়া যায় তখনই ভাষা সাহিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কারণ সাহিত্য মূলত শখের জিনিস।

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন তাঁর পূর্বকালীন কিংবা সমকালীন কাব্যের সঙ্গে তার মিল যৎসামান্য। আমাদের পূর্বার্জিত সুকৃতির জোরে রবীন্দ্রকাব্যের মতো বর লাভ করবার সঙ্গত অধিকার আমরা দাবি করতে পারি না। পূর্বকৃতির তুলনায় রবীন্দ্রকৃতি এত বিস্তীর্ণ, এত বিচিত্র, এত বর্ণাঢ্য যে, একে একেবারেই বেহিসাবী বলে মনে হয়। প্রতিভা জিনিসটাই বেহিসাবী এবং বেপরোয়া। ওর নিজেরই একটা তাগিদ আছে, সেই তাগিদের চাপেই তাকে পথ করে নিতে হয়। অপরের মুখ চেয়ে থাকলে তার চলে না। রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা রবীন্দ্রনাথকে নিজে তৈরি করে নিতে হয়েছে। পূর্বগামীদের কাছ থেকে গদ্যে যাও বা পেয়েছেন কাব্যে তা পান নি। কাব্যের অত্যাবশ্যক কর্তব্য সূক্ষ্মতম অনুভূতিকে তদুপযোগী সূক্ষ্ম সুচারু সপ্রতিভ শব্দের জালে আবদ্ধ করা। ভাব আর ভাষায় সারাক্ষণ একটি লুকোচুরি খেলা চলছে। যে ভাষা অপরিণত সে তেমন ঠাস বুননি নয়, তার গায়ে বড় বড় ফাঁক থেকে যায়—মনের অনেক কথা সেই ভাষার জালে ধরা পড়ে না। ভাষা যেখানে ঘনবুনোট সেখানে চুনো পুঁটিটিও পালাতে পারে না। হেন কথা নেই যা সেই ভাষায় প্রকাশ করা চলে না। আবার প্রকাশ করাটাই একমাত্র কর্তব্য নয়, সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারলে তবেই তা সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে। ভাব বা অর্থগৌরবে সাহিত্য হয় না, ভাষার সৌষ্ঠবই সাহিত্য। গান যেমন সুরের, ছবি যেমন রেখার সাহিত্য তেমনি ভাষার শিল্প। অথচ অনেক শক্তিশালী লেখকও ভাষা সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁরা ভাবেন ভাব বা অর্থগৌরবেই সাহিত্যের গৌরব। এ যুগের কবিই বলেছেন Poetry is written with words not with ideas. গদ্য পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। যৎসামান্য বিষয়ও প্রকাশভঙ্গির গুণে সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে।

ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যতখানি সচেতন তাঁর পূর্ববর্তী লেখকরা ততখানি ছিলেন না। তাঁর নিজের প্রয়োজনেই ভাষার শক্তিবৃদ্ধির কথা তাঁকে সারাক্ষণ ভাবতে হয়েছে। এত বিভিন্ন এবং এত বিচিত্র বিষয়ে তাকে লিখতে হয়েছে যে, বিষয়ভেদে ভাষার বৈলক্ষণ্য এবং শব্দের ধ্বনিগত

তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁকে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে শব্দকে বলেছে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অরূপ কিন্তু তাঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যেই তিনি রূপ লাভ করেছেন। শব্দও অরূপ কিন্তু কবি সাহিত্যিক যখন যেভাবে শব্দকে ব্যবহার করেন শব্দ সেইভাবে রূপ গ্রহণ করে। আমি এই অর্থেই গোড়াতে সাহিত্যকে সাকার আখ্যা দিয়েছি। মানবিক প্রেম এবং ভগবৎ প্রেম, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, পার্থিব সৌন্দর্য এবং অপার্থিব সৌন্দর্য, আর্থিক লাভক্ষতি এবং পারমার্থিক লাভক্ষতি অভিন্ন বস্তু নয়। দুই এর ভেদ শব্দ দ্বারাই প্রকাশ করতে হয়। সেই শব্দভেদী বাণ একমাত্র কবিরাই নিক্ষেপ করতে পারেন।

সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার অপত্য হিসেবে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় যাত্রা শুরু করে নি। রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই সে মূলধন অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। জমানো টাকার সুদটাই সব চাইতে বড় সহায়। মূলধন ভাঙিয়ে খেতে গেলে অল্প দিনেই ফুরিয়ে যায়। সাধু শব্দ থেকে উৎপন্ন যে অপভ্রংশ সেটাই সাধু ভাষার সুদ। ভাষার অপভ্রষ্ট রূপ বা অপ-ভাষা যে পরিমাণে লিখিত ভাষার ব্যবহারে আসবে সেই পরিমাণে ভাষার সাবলীলতা বাড়বে। প্রাকৃত ভাষাই প্রকৃত ভাষা, এই কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মধুসূদন অতিমাত্রায় সংস্কৃতাশ্রয়ী ছিলেন বলে তাঁর ব্যবহৃত ভাষা অনতিকাল মধ্যে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন গতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এই কারণে অসামান্য কবি প্রতিভা সত্ত্বেও মধুসূদন বাঙলা কাব্যে একটি বিচ্ছিন্ন episode. অগ্রজদের সঙ্গে যেমন কোনোই মিল নেই, অনুজদের সঙ্গেও খুব একটা নেই।

অনেকের ধারণা সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ যতখানি exploit করা উচিত ছিল বাঙালী লেখকরা তা করেন নি। প্রত্যেক ভাষার বিশেষ একটা ধাত আছে, সেই ধাত অনুযায়ী সে গড়ে ওঠে। বহিরাগত জিনিস যেটুকু স্বাভাবিক নিয়মে অঙ্গীভূত হয়ে যায়, নিজস্ব ধাতের সঙ্গে মিশে যায়, সেটুকুই স্থিতি লাভ করে। জোর করে মেশাতে গেলে সত্যিকারের পুষ্টিসাধন

হয় না। ইদানিং কালে কবি সুধীন দত্ত সংস্কৃতের দোরে ধর্ণা দিয়েছিলেন। রত্নরাজি খুব যে একটা উদ্ধার করতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। আধুনিক বাঙলার তুলনায় সংস্কৃত ভাষাটা ওজনে অনেক বেশি ভারি। এখন এই দুটিতে মিশ খাওয়ানো অনেক কঠিন। সুধীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষাকে যে 'সাংস্কৃতিক' মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছিলেন আধুনিক বাঙলার পক্ষে সেটা খুব পুষ্টিসাধক হয়েছে এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, উক্ত সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ ছিল গভীর। অপর পক্ষে তাঁর মন ছিল বৈজ্ঞানিক। ভাষার ব্যাকরণ প্রকরণ বানান সম্পর্কে প্রবল কৌতূহল ছিল। বাঙলা ভাষার নিজস্ব ধাত, চালচলন, ঢং সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। এজন্য যখন কাব্য রচনায় হাত দিলেন তখন সংস্কৃত-রত্নাগারের দ্বার তাঁর কাছে উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি তার যথেচ্ছ ব্যবহার করেন নি। সাহিত্য-শিল্পী নিজ প্রয়োজনে যেখানে যা পাবেন তাই হাত বাড়িয়ে নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই নিয়েছেন, তার বেশি নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরও অনুরাগ এবং অধিকার দুই-ই যথেষ্ট ছিল। সংস্কৃতের ভাণ্ডার হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখান থেকে নেন নি এমন কথা কেউ বলবেন না। অবশ্যই নিয়েছেন তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নেন নি। আত্মপ্রকাশের তাগিদে এবং নিজস্ব কাব্যরীতির প্রয়োজনে ভাষার যে flexibility আবশ্যক সেটি আয়ত্ত করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে ভাষার কসরৎ যথেষ্ট করতে হয়েছে। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, এই কার্যে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধন যতখানি সহায়তা করে তার চাইতে ঢের বেশি করে সমকালীন সাহিত্য এবং তারও চাইতে বেশি করে লোকের মুখের নিত্যদিনের প্রচলিত ভাষা।

সকল দেশেই দেখা গিয়েছে গোড়ার দিকে পদ্যের এবং গদ্যের ভাষা ছিল আলাদা। এটা অস্বাভাবিক। পদ্যেই হোক গদ্যেই হোক সাহিত্যের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতি থাকা প্রয়োজন। প্রথম দিকের গদ্যে পদ্যে কোথাও সেই স্বচ্ছন্দ গতি ছিল না। রণপায়ে চলবার মতো সেটা একটা অস্বাভাবিক

গতি। সাহিত্য মানুষের দিবারাত্রির কাব্য, ওর মধ্যে একটা ঘরোয়া ভাব থাকা স্বাভাবিক। ঘরোয়া ভাবকে ঘরোয়া ভাষায় প্রকাশ করতে হয়, সেটা নিত্য দিনের চলতি ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। সাধারণ মানুষের যে বাক্‌ভঙ্গি তাই থেকেই ভাষার ইডিয়াম তৈরি হয়। সেই ইডিয়াম যদ্দিন না সাহিত্যের গাঁথুনিতে ব্যবহার হচ্ছে ততদিন তার ভিত পাকা হবে না। চলতি ইডিয়ামের ব্যবহারে ভাষা strengthened হয়, vulgarized হয় না। লক্ষ্য করে দেখেছি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গদ্য পদ্য উভয় ক্ষেত্রে খাঁটি বাঙলা ইডিয়াম ব্যবহারে অতিশয় তৎপর ছিলেন।

ভাষাকে বাগ মানানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। বুনো ঘোড়ার মতো ভাষার মধ্যে একটা একগুঁয়ে একরোখা ভাব থাকে, সেই অবাধ্যতাকে ভেঙে দিয়ে তাকে বশ মানাতে হয়। লেখক যত বেশি শক্তিশালী হবেন ভাষা তত বেশি তাঁর আজ্ঞাবহ হবে। রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে ভাষাকে পোষ মানিয়ে ছিলেন যে, তাকে দিয়ে ইচ্ছামত যা খুশি করিয়েছেন, যেমন খুশি বলিয়েছেন। সমকালীন ভাষার উপরে যেমন অধিকার বিস্তার করেছিলেন, প্রয়োজন-বোধে সংস্কৃতের ভাণ্ডারেও তেমনি হস্তক্ষেপ করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর লালিত্যকেও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা শিক্ষিত মার্জিত সমাজের ভাষা। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের ভাষাকে তিনি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু ভাষার ইডিয়াম বহুলাংশে ওই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের ভাষার মধ্যেই নিহিত থাকে। আইরিশ নাট্যকার Synge এক বন্ধুগৃহে ঝি চাকরদের বিশ্রম্ভালাপ শুনতে পেয়েছিলেন। শুনে তিনি চমৎকৃত। মনে হয়েছিল, তাঁর আপন সমাজে এবং ইস্কুলে কলেজে তিনি যে ভাষা শিখেছেন সে ভাষা এর তুলনায় কিছুই নয়। এদের ভাষা অনেক বেশি তুখোর, অনেক বেশি ভাবব্যঞ্জক। ভাষা শিখতে হলে এদের কাছেই শেখা প্রয়োজন। কার্যত তিনি তাই করেছিলেন। সাধারণ মানুষদের মুখের ভাষায় নাটক লিখে Synge, O' Cascy প্রভৃতি লেখকরা আইরিশ নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার সেই সম্ভাবনাকে

explore করেন নি। তাঁর পক্ষে করা সম্ভবও ছিল না। আমাদের সাধারণ মানুষদের কথা রবীন্দ্রনাথ যতখানি ভেবেছেন এমন খুব কম লোকই ভেবেছেন, তথাপি রবীন্দ্রনাথকে ঠিক জনগণের মানুষ বলা চলে না। শিক্ষায় রুচিতে জীবন চর্চায় তিনি অনেক দূরের মানুষ ছিলেন। তিনি এদের মনটাকে জানতেন, এদের ভাষা জানতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকারের বাইরে কখনো যান নি। তবে ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে তিনিই ঠিক পথে চালিত করে দিয়ে গিয়েছেন—কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য তাঁর ব্যবহৃত কথ্য ভাষা, শিক্ষিত ভদ্রসমাজের প্রচলিত ভাষা। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষের নিত্য ব্যবহৃত ভাষায় যে ইডিয়ামের প্রচলন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা তেমন মর্যাদা পায় নি। প্রমথ চৌধুরী চলতি ইডিয়ামের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রেখেছেন। তবে তাঁরও ভাষা শিক্ষিত বিদগ্ধজনের বৈঠকখানায় ব্যবহৃত মজলিসী ভাষা। সাধারণের ভাষা তাঁরও নাগালের বাইরে ছিল। তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর হাতে ভাষার flexibility খানিকটা বেড়েছে। ভাষার দেহলাবণ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যতখানি নজর প্রমথবাবুর ততখানি নয়। তিনি ভাষায় দেহভঙ্গি—অর্থাৎ তার তৎপরতা, চতুরতা, চটুলতার উপর অধিকতর জোর দিয়েছেন। এ ছাড়া ফরাসী ভাষায় প্রমথবাবুর যথেষ্ট অধিকার ছিল। ভাষার কারিগরিতে ফরাসী লেখকরা সর্বাগ্রগণ্য। ফরাসী সাহিত্যের গুণগ্রাহী হিসেবে প্রমথবাবু আমাদের ভাষার প্রখরতা এবং উজ্জ্বলতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রযুগের অন্যতম প্রধান লেখক শরৎচন্দ্র বোধকরি সব চাইতে জনপ্রিয় লেখক। ভাষা সম্পর্কে তিনি মোটামুটি রবীন্দ্রানুসারী হলেও প্রচুর পরিমাণে লবণাম্বু মিশিয়ে ভাষাকে বেশ খানিকটা জলো জলো করে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তার দরুণ সেদিনকার অনেক লেখক ভাবে ভাষায় তাঁর অনুকরণ করেছেন। এর ফল খুব ভাল হয় নি। কোনো জিনিসের মধ্যেই অত্যধিক পরিমাণে জলীয় পদার্থ বাঞ্ছনীয় নয়। সহজে পচন ধরবার আশঙ্কা থাকে। ভাষার বেলায়ও তাই। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্র-

নাথ, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় (এখানে বিশেষ করে গদ্যের কথাই বলছি) জলীয় পদার্থ নেই বললেই চলে। এ জিনিসকে preserve করা সহজ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সঙ্গে আজকের ভাষার মিল নেই, তথাপি ওই ভাষার-এমন আঁটসাঁট বাঁধুনি যে, আজকের পাঠকও বিস্মিত বোধ করেন। অপর পক্ষে আশঙ্কা হয় অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষিত, পরিণতবুদ্ধি পাঠকের কাছে শরৎচন্দ্রের ভাষা ক্লান্তিকর ঠেকবে।

চিন্তার শিথিলতা ভাষায় নানাপ্রকার শিথিলতার সৃষ্টি করে। আজকে যারা বাঙলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান লেখক সুখের বিষয় তাঁদের ভাষায় ওই জলীয় অংশটা কম। তবে এঁদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত নবীন তাঁদের ভাষায় একটা অনাবশ্যক উগ্রতা দেখা দিয়েছে। যে কথা একটু নিচু গলায় বললে ভালো শোনায় সে কথাও অনর্থক চেঁচিয়ে বলবার দিকে বিশেষ একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এঁদের ব্যবহৃত শব্দ অনেক সময় অতিমাত্রায় সশব্দ। দু'চার পাতা পড়লেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়, মনে হয় কানের কাছে কে যেন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকার কাছে এ ভাষা বোধকরি কিছু খারাপ লাগে না, কিন্তু নিবিষ্টমন শ্রোতার কাছে অনাবশ্যক চিৎকার যেমন বিরক্তিকর মনে হয়, এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে এ জাতীয় লিখিত ভাষাও তেমনি ক্লান্তিকর মনে হবে। মুখরতা ভাষার স্বভাবগত, কিন্তু একটু মুখচোরা ভাব থাকলে তারও আকর্ষণ বাড়ে। যাঁদের কথা বলছি তাঁরা অনেকেই শক্তিশালী লেখক, এঁদের ভবিষ্যৎ আছে বলেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের অধিকতর অবহিত থাকা প্রয়োজন। ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে সর্বপ্রকারে মডার্ন হবার জন্যে এঁরা এমন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যে, দেখলে কষ্ট হয়। মডার্ন মন অত্যন্ত সুকুমার ভাষাতেও প্রকাশ পেতে পারে। *

* দৃষ্টান্ত স্বয়ং টি. এস. এলিয়ট। গদ্যে পদ্যে উভয়ত্র তাঁর ভাষা অনবদ্য। ভাষা ব্যবহারে অর্থাৎ শব্দপ্রয়োগে তিনি যতখানি যত্ন নিয়েছেন এ যুগের আর কোন কবি ততখানি নয়। ভাষা সম্পর্কে গদ্যে পদ্যে বহু কথা তিনি বলেছেন। ভাষাকে বলেছেন—a difficult tool to handle. একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করছি—

So here I am, in the middle of the way,
having had twenty years...
Twenty years largely wasted
Trying to learn to use words. (East Coker V)

আমরা যাকে আধুনিকতা বলি সে জিনিসটা প্রধানত ভাবগত। অবশ্য তার একটা বাহ্যিক রূপও আছে, সেটিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের লেখকরা ভাষাটাকে মুচড়ে দুমড়ে, নানা আক্ষেপে বিক্ষেপে একটি উত্তেজিত-স্নায়ু, বিস্রস্ত-বসন, বিপর্যস্ত-কেশ, বিভ্রান্ত মূর্তিতে উপস্থাপিত করছেন। এর ফলে বাঙলা ভাষা তার বহুকালের আচার ব্যবহার এবং অভ্যস্ত রুচি থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব genius বা স্বভাবধর্ম আছে, এ কথা আগেও বলেছি। জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে এটি যুক্ত। কাজেই একে সহজে অস্বীকার করা চলে না, এর উপরে জবরদস্তিও চলে না। এই সূত্রে এলিয়টের আরেকটি কথাও মনে পড়ছে—'Any language, so long as it remains the same language, imposes its own laws and restrictions and permits its own licence, dictates its speech, rhythms and sound patterns.'

অন্যত্র বলেছেন, 'eccentricity for its own sake is suspect —and must be curbed for the sake of order'. লক্ষ্য করে দেখেছি, আমাদের নব্যদের মধ্যে যাঁরা কবিখ্যাতি লাভ করেছেন তাঁরা বরং ভাষা সম্বন্ধে অধিকতর যত্নবান এবং সংযত। ইংরেজ কবি বলেছেন, Poetry should be as well-written as prose. আমাদের বেলায় ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে উলটো—Our prose should be as well-written as our poetry.

ভাষার মধ্যে দুটি বিপরীত জিনিসের সংঘাত নিরন্তর চলতে থাকে। একটি সুনির্দিষ্ট প্রচলিত ধারা, অপরটি যুগধর্মের উৎক্ষেপে উত্থিত নিত্য-পরিবর্তনশীল জীবনের এক নতুন ইডিয়াম। এই দুই-এর সংঘর্ষে মধ্যপথ-গামী যে ভাষার সৃষ্টি হয় সেটিই যুগোপযোগী ভাষা। ভাষা এইভাবেই অগ্রসর হতে থাকে। ভাষার একদিকে fixity, অপরদিকে flux. ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনায় এলিয়ট এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। fixity এবং flux-এর মধ্যে সমন্বয় হয়ে যে ভাষা তৈরি হয় সেটিই প্রত্যেক যুগের আদর্শ ভাষা। এর একটিকে শুধু আঁকড়ে ধরে থাকলে ভাষার অবনতি

অবশ্যম্ভাবী। আজকের লেখকদের মধ্যে অনেকে flux-এর ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন অর্থাৎ নিজেদেরই বিপন্ন করছেন। অতি-মাত্রায় সমকালীন হতে গেলে ভবিষ্যৎ কালের আশা ছাড়তে হয়। স্বকালের মোহে পরকাল নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বিশেষ করে যাঁরা যথার্থই শক্তিশালী লেখক।



সাহিত্যের প্রভাব

জীবন যেমন সাহিত্যকে প্রভাবিত করে সাহিত্যও তেমনি জীবনকে প্রভাবিত করে--এ কথা আমরা বহুকাল ধরে শুনে আসছি। কিন্তু কথাটা যত সহজে আমরা উচ্চারণ করি জিনিসটা ঠিক ততখানি সহজবোধ্য নয়। বোধ করি আপাতশ্রবণে যতখানি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় কার্যত ততখানি বিশ্বাসযোগ্যও নয়।

একজন মোটামুটি শিক্ষিত মানুষের জীবনে সাহিত্যের প্রভাব কতটুকু সেটা নির্ণয় করা বড় সহজ নয়। অনেকেই আছেন যাঁরা গল্প উপন্যাসে রস পান, কাব্য পাঠ করে আনন্দ পান। আনন্দ দানই সাহিত্যের প্রধান কর্তব্য, কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী তারই উপর নির্ভর করবে সাহিত্য পাঠের সার্থকতা। কোনো কবিতার অনুরণন হয়ত খানিকক্ষণ মনের মধ্যে থেকে যায়, কোনো গান ক্ষণকালের জন্য মনকে অভিভূত করে, গল্প উপন্যাস পাঠে সাময়িকভাবে দেহ মনের ক্লান্তি দূর হয়, সংসারের ভাবনা চিন্তা ভুলে থাকা যায়। স্বীকার করতেই হবে, এ সবেরও মূল্য কিছু কম নয়। বন্যার জল সরে গেলেও খানিকটা পলিমাটি যেমন জমিতে থেকে যায়, তেমনি সাহিত্য পাঠের ফলে খানিকটা আনন্দ রস ধীরে ধীরে মনের মধ্যে জমতে থাকবে এবং তাতে মন সমৃদ্ধ হবে এমন আশা করা কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু কার্যত দেখা যায় সকল মনের ক্ষমতা সমান নয়। নিজের মনের মধ্যে যে জিনিস নেই সে জিনিস বাইরে থেকে এলেও মন সেটা ধরে রাখতে পারে না অর্থাৎ নিজের তহবিলে যদি কিছু না থাকে তো পুঁথির পাতা থেকে সংগ্রহ করে রস কেউ মনের মধ্যে সঞ্চয় করতে পারবে না। সাহিত্যে ধারের কারবার চলে না। ধার করা জিনিস বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। আর ধারণের ক্ষমতা যদি না থাকে তো যেটুকু বা আহরণ করা যায় সেটুকুও মন থেকে পিছনে চলে যায়। আসল কথা সাহিত্যরস—

রসহীনেন লভ্য নয়, এমন কি ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। অ্যারিস্টটল কিংবা আনন্দ বর্ধনের রসতত্ত্ব জানা থাকলেই রসের মর্মগ্রহণ করা সম্ভব হবে এমন কথা ভাবা নিতান্তই অবাস্তব। এইজন্যে দেখা যায় সাহিত্যরস খুব অল্পসংখ্যক মানুষের উপরেই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। কাব্যপাঠ' বা রসচর্চার ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে, তার মনের চিন্তায়, মুখের কথায়, দিনের কর্মে, আচার ব্যাবহারে রুচির ছাপ পড়েছে এমন দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। সাহিত্য চর্চার চূড়ান্ত সার্থকতা হল মার্জিত রুচি এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির অনুশীলনে। প্রাত্যহিক জীবনে এর পরিচয় খুব কম লোকেই দিতে পারেন। এমন কি আমরা যারা সাহিত্যের ছাত্র বলে নিজেদের পরিচয় দিই, আমাদেরও আচার ব্যবহারে আশ্চর্য রকমের স্থূলতা প্রকাশ পায়। এর কারণ শিল্প সাহিত্য বেশির ভাগ মানুষের জীবনেই একটা পোশাকী ব্যাপার—নিত্য ব্যবহারের জিনিস বলে গণ্য নয়। খানিকটা অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে, খানিকটা বা সামাজিক জীবনে প্রসাধন হিসেবে এর ব্যবহার। টি. এস. এলিয়ট একেই ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

In the room women come and go
Talking of Michelangelo.

পরিহাসটা কেবলমাত্র মেয়েদের নিয়ে করা হলেও স্ত্রী-পুরুষ সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেও শিল্প সাহিত্যের আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই নিতান্ত মুখের বুলিতে পরিণত হয়।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-মহারথীরা নিজ নিজ দেশের জীবনকে খুব যে বেশি প্রভাবিত করেছেন এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। পাশ্চাত্ত্য জগতে প্লেটো অ্যারিস্টটল মানুষের চিন্তাকে যতখানি প্রভাবিত করেছেন, হোমার ভার্জিল ততখানি করেন নি। আমাদের দেশে শঙ্করাচার্যের যতখানি প্রভাব কালিদাসের ততখানি নয়। মেঘদূতের চাইতে মোহমুদ্গরের প্রতাপ ঢের বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময়ের লোক। একথা অনস্বীকার্য যে, তখনকার সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের চাইতে রামকৃষ্ণ ঢের বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জন্ম একই কালে। একথাও

নিশ্চিত যে, রবীন্দ্রনাথের চাইতে বিবেকানন্দ দেশের জনচিত্তে একদিন ঢের বেশি আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য আলোড়ন আর প্রভাব এক জিনিস নয়। সত্যি বলতে কি তেমন প্রভাব কারোই হয় নি—ধর্মীয় নেতাদেরও নয় সাহিত্য-রথীদেরও নয়। তাই যদি হত তবে দেশের আজ এই অবস্থা হত না, দেশব্যাপী দুর্নীতি এমনভাবে প্রশ্রয় পেত না। যাক, এই প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। সাধারণভাবে দেখা যায় ধর্মের আবেদন অপেক্ষাকৃত সহজগ্রাহ্য। তার কারণ ধর্ম জিনিসটা ট্র্যাডিশনের সঙ্গে জড়িত। বহু যুগ থেকে সমাজে তো বটেই পারিবারিক জীবনেও এর একটা ধারা চলে আসছে। সাহিত্য সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। বৈষ্ণবের ছেলে বৈষ্ণব হওয়া স্বাভাবিক, না হওয়াটা বরং অস্বাভাবিক। কিন্তু সাহিত্যিকের ছেলে যদি সাহিত্যিক হয় তবে সেটাকে নিয়মের ব্যতিক্রমই বলতে হবে। ধর্মের একটা সামাজিক রূপ আছে, সাহিত্যের সেটা নেই। সাহিত্য একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। সত্যিকারের ধর্মও অবশ্য তাই, যদিচ ধর্মকে আমরা সব সময়েই সমাজ, সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। দল বেঁধে ধর্মতত্ত্বের বা সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম বা সাহিত্য আলোচনার বস্তু ততখানি নয় যতখানি আচরণের এবং আস্বাদনের বস্তু। সেই আচরণ একান্তভাবে নিজস্ব ব্যাপার। বারোয়ারী পূজা সম্ভব, বারোয়ারী ধর্মাচরণ কদাপি সম্ভব নয়। সাহিত্যের বেলায়ও তাই। সাহিত্যরস জীবনের গূঢ়তম রস—ধর্মের চাইতেও গভীরতর গুহায় নিহিত। ধর্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন অনেক সরল মনের পক্ষেও সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের মর্ম গ্রহণ শুধু সরল বা নির্মল মনের পক্ষে সম্ভব নয়, অতিশয় সূক্ষ্ম মনের আবশ্যক। ধর্ম এবং সাহিত্য দুই-এরই জন্ম মানস সরোবরে; কিন্তু সরোবর এক হলেও পরিবেশে পার্থক্য আছে। একটির অবগাহন স্থির স্বচ্ছ নির্মল সলিলে, অপরটির রসকেলি সদাবিক্ষেপে চঞ্চল বারিরাশিতে। মানস সরোবরই বলুন আর জীবন সরোবরই বলুন, সাহিত্যের জন্য জীবনকে মন্থন করে নিতে হয়। স্বচ্ছ সলিল কখনো কখনো আবিল হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তাতেও লাভ ছাড়া ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

সমষ্টিগত জীবনে ধর্মের যদি-বা কিছু প্রভাব থাকে সাহিত্যের তেমনটা আছে বলে মনে করি না, অন্তত আজ পর্যন্ত কোনো সমাজে তা দেখা যায় নি। হঠাৎ কোনো ধর্মনেতার আবির্ভাবে সমগ্র সমাজে উন্মাদনা দেখা দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক দেখা গিয়েছে। আজকের দিনে ধর্মনেতার সেই স্থান গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রনেতা; কিন্তু কোনো সাহিত্যরথী তেমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন এমন দৃষ্টান্ত কোনো দেশে দেখা যায় না। একমাত্র এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডে জনচিত্ত কিছুকালের জন্য নাট্যামোদে বিভোর হয়ে উঠেছিল; অনুরূপ দৃষ্টান্ত বহু শতাব্দী পূর্বে গ্রীস দেশেও দেখা গিয়েছিল পেরিক্লিসের যুগে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেও জনসাধারণ অকস্মাৎ সাহিত্য রসে মেতে উঠেছিল এমন কথা কেউ বলবে না। উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত জিনিসটা বারোয়ারী ফুর্তির ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল। গ্রীস দেশে নাট্যোৎসব ছিল ডায়োনিসাস্ পূজোর অঙ্গ বিশেষ। ইস্কিলাস্, সফোক্লিস এবং ইয়ুরিপিডিস তিনে মিলে অনুমান তিন শতাধিক নাটক রচনা করেছিলেন। আজ সব মিলিয়ে এর মধ্যে মাত্র বত্রিশখানা নাটক বেঁচে আছে, বাকি সমস্ত নাটকের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। রসাস্বাদনই যদি বড় কথা হত তাহলে প্রত্যেকটি নাটকই রক্ষা পেত। এলিজাবেথের যুগে ভাগ্যিস ছাপাখানা এসে গিয়েছিল, তাও সে যুগের কিছু কিছু নাটক লোপ পেয়েছে। এলিজাবেথীয় নাট্য সমারোহও ছিল রেনেসাঁস-জাত জীবনোল্লাসের প্রতীক। রসাস্বাদনের চাইতে বিনোদনের আগ্রহটাই ছিল বড়। নাট্যামোদ প্রকৃতপক্ষে হৈ হুল্লোড়ে পরিণত হয়েছিল। তার প্রমাণ অনতিকাল পরে আইন করে থিয়েটার বন্ধ করতে হয়েছিল। দর্শকদের রুচিরোচনের জন্য অভিনেতারা অনেক সময় সাহিত্যরসকে বিকৃত করে নানা আতিশয্যের আমদানি করতেন। স্বয়ং শেক্সপীয়ার তাঁর নাটকে এই কদাচারের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হ্যামলেট-এর মুখের এই উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

O, there be players that I have seen play, and heard others praise, and that highly,....that have so strutted and bellowed, that I have thought some of nature's

journeymen had made men, and not made them well, they imitated humanity so abominably. দেখা যাচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণযুগেও সত্যিকারের সাহিত্যরস খুব অল্পসংখ্যকের মনকেই স্পর্শ করেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ বেশির ভাগ মানুষই অত্যন্ত স্থূল প্রকৃতির, সূক্ষ্ম রস গ্রহণের ক্ষমতা অনেকেরই থাকে না। এই কারণে সাহিত্য কোনো দেশেই সমাজের উপরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। মুষ্টিমেয় রসিক জনের মধ্যেই তার প্রভাব সীমাবদ্ধ। বাঙালী জীবন বা বাঙালী চরিত্রের উপরে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ছাপ কতটুকু? শেক্সপীয়ার, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস ইংরেজ চরিত্রকে কতটুকু গুণান্বিত করেছেন? এঁদের চাইতে ইংরেজ চরিত্রের উপর ঢের বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন গ্লাডস্টোন, ডিজরেইলি, চার্চিল। বহু প্রাচীন কালে মনে হয় সাহিত্যের প্রভাব তবু কিঞ্চিৎ ছিল। তার কারণ তখন সমাজ জীবনে মানুষের চিত্তবিক্ষেপের নানা আয়োজন চতুষ্পার্শ্বে এমন অপর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তৃত ছিল না। আমাদের দেশে চারণ কবিরা, ইয়ুরোপে মিনস্ট্রেল সম্প্রদায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ধর্মের কাহিনী, বীরত্বের গাঁথা গেয়ে শোনাতেন। ভারতবর্ষে রামায়ণ মহাভারত বহু শতাব্দী ধরে ঘরে ঘরে চিত্ত বিনোদনের একমাত্র সামগ্রী ছিল। অবশ্য উল্লেখ প্রয়োজন যে, সেকালের লোকেরা রামায়ণ মহাভারতকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই দেখেছে, কাব্যগ্রন্থ হিসেবে নয়। কাজেই একেও নিছক কাব্যের প্রভাব বলা চলে না।

আশা করা গিয়েছিল, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মের প্রভাব ক্রমে কমে আসবে এবং কাব্য সাহিত্যেই ধর্মের স্থান গ্রহণ করবে। সাহিত্য থেকেই মানুষ সকল প্রকার অনুপ্রেরণা লাভ করবে, তার মনের আনন্দ, আত্মার তৃপ্তি সাহিত্যই যোগাবে। সুসভ্য মানুষের এটিই কাম্য, সুসভ্য সমাজে এটিই আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু এই ন্যায্য মর্যাদাটি লাভ করতে সাহিত্যের অনেক যুগ লেগেছে। মানুষের আদিকাব্য প্রকৃতির স্তব, তাকে খাঁটি কাব্য বলা চলে। প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু বৃহৎ, মহৎ, বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে মানুষ তারই স্তুতি গান করেছে। ক্রমে একে একে এসেছে

বহু দেবতা, মানুষ আবিষ্কার করেছে তার ভগবানকে, তারপরে মানুষের মধ্যেই ভগবানের অবতারকে। সেই থেকে সাহিত্যের মুখে ধর্মকথা ছাড়া আর কিছু নেই। পাশ্চাত্ত্য জগতে দেখা গিয়েছে খৃষ্টীয় যুগের আরম্ভ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত—প্রায় দেড় হাজার বছর—কাব্যের মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম। রেনেসাঁসের পর থেকে কাব্যের স্বভাবে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে; ধর্মের প্রাধান্য কমে গিয়ে মানুষের নিত্যকার জীবন প্রাধান্য লাভ করেছে। এটাই স্বাভাবিক, মানুষের কাব্যে সাহিত্যে মানুষই প্রধান হবে। কিন্তু পাঁচ শ বছর যেতে না যেতেই আবার ধর্ম ধর্ম রব উঠেছে। বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে আজকের দিনের অধিকাংশ সাহিত্যিক অতি মাত্রায় সন্দিহান। সভ্যতা সম্বন্ধে তির্যক পরিহাস এঁদের ছত্রে ছত্রে। টি. এস. এলিয়ট, গ্রাহাম গ্রীন প্রমুখ কবি এবং কথা সাহিত্যিকরা ক্যাথলিক ধর্মের প্রবক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এলিয়টের মতে মধ্যযুগের সরল ধর্মবিশ্বাসকে আবার ফিরিয়ে না আনতে পারলে এ সভ্যতার হাত থেকে নিস্তার নেই। টেকনিকের দিক থেকে উক্ত সাহিত্য যতই আধুনিক হোক মতিগতির দিক থেকে একে প্রাচীনপন্থী বলতে হবে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র যেমন যুগবিরোধী, ধর্মধ্বজী কাব্যও তেমনি যুগবিরোধী।

ধর্মকথার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ কত জিনিস লিখলেন, কত সুন্দর কথা শোনালেন তবু তাঁর প্রধান পরিচয় হল গীতাঞ্জলির কবি হিসাবে। এটা পাঠক সমাজের রসগ্রাহিতার খুব বড় পরিচয় নয়। ধর্মকথা মনকে টানে, ধোঁয়াটে কথারও একটা আকর্ষণ আছে, বুদ্ধির মারপ্যাঁচও লোকে উপভোগ করে, স্থূল কথা তো করেই, কিন্তু সূক্ষ্মরস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মনকে স্পর্শ করে না। কাব্যে সাহিত্যে যে সব জিনিসের সত্যিকারের সাহিত্যিক মূল্য আছে সে জিনিসগুলো সহজেই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। ধর্মকথা ছাড়া যেসব কথার খানিকটা সাংসারিক বা ব্যবহারিক মূল্য আছে সেসব কথাই মুখে মুখে চলতে থাকে। অথচ একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে, সে কথার সাহিত্যিক মূল্য খুব বড় নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু ইত্যাদি কথাগুলি যতই ভালো হোক এর মধ্যে কাব্যিক সৌন্দর্য তেমন কিছু নাই। একথা বলবার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন হয় না। মনুমেণ্টের তলায় দাঁড়িয়ে ময়দানের বক্তারা হামেশাই এই জাতীয় কথা বলে থাকেন। কথাগুলো শুনতে জোরালো হলেই তার সাহিত্যিক মূল্য বাড়ল এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। যেসব কবি-বাক্য লোকের মুখে মুখে প্রচলিত—ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি oft-quoted lines তার বেশির ভাগই সস্তা জিনিস। কথা যতই গুরুগম্ভীর হোক রসগ্রাহ্য না হলে সাহিত্য তাকে কোনো গুরুত্ব দেয় না। আবার মজার কথা হল সাহিত্য যাকে গুরুত্ব দেয় বেশির ভাগ পাঠকই তাতে কোন রস পায় না।

সাহিত্যের একমাত্র কর্তব্য আনন্দ দান। জীবনকে বা সমাজকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়বার দায় তার নেই। তবে সৎসাহিত্য পাঠে মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটে, সেইটুকুই সমাজের উপরে সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাব। কিন্তু সেই প্রভাব এত অল্প সংখ্যকের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে, গোটা সমাজের উপরে তা লক্ষ্যগোচর হয় না। এই সম্পর্কে আরো অনেক কথা এসে যায়। যিনি কবি, যিনি সাহিত্যিক তিনি শিক্ষক বা নীতিবাগীশ নন, তিনি রসস্রষ্টা। ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ এর বিচার তিনি করেন না। তিনি সব জিনিসকেই সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে দেখেন, ভালো মন্দ দুই-ই তাঁর কাছে সমান আদরের। শেক্সপীয়ারের চোখে ওথেলো এবং ইয়াগো দুজনেই সমান—দুজনকেই সমান আদরে, সমান অনুরাগে তিনি সৃষ্টি করেছেন। দুজনেই তাঁর মানস সন্তান। একজনের সরলতা, আরেকজনের কুটিলতা তিনি সমদৃষ্টিতে দেখেছেন। একটিকে প্রাধান্য দিতে গেলে অপরটি দুর্বল হত। কবির দৃষ্টিতে পাপপুণ্য দুই-ই সমান উপভোগ্য। কিং লীয়ার তাঁর তিন কন্যার মধ্যে পার্থক্য করেছেন, কিন্তু শেক্সপীয়ার করেন নি। শ্রেষ্ঠ কবি এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্গুণ ব্রহ্মের ন্যায় নির্বিকার। তিনি যা দেখবেন তাই প্রকাশ করবেন, কোনো পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করবেন না। লেখক

যত পক্ষপাতশূন্য হবেন তাঁর আর্ট তত বেশি উৎকর্ষ লাভ করবে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিটি পুরোপুরি রাখতে পারেন নি বলে গল্পের আর্ট কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নিখিলেশের প্রতি তাঁর যে পক্ষপাত সেটি তিনি গোপন করতে পারেন নি। 'নষ্টনীড়' এবং 'পয়লা নম্বর' গল্পের বিষয়বস্তু 'ঘরে বাইরের' সমজাতীয়। গল্পের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে কবি অধিকতর সমতা রক্ষা করতে পেরেছেন বলে আর্টের দিক থেকে গল্প দুটি অধিকতর সাফল্য লাভ করেছে।

এই সূত্রে আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে। কবি, নাট্যকার এবং কাহিনীকার অনেক সময় এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করেন যা আদৌ অনুকরণ-যোগ্য নয়, এমন সব ঘটনার সংঘটন করেন যা সর্বতোভাবে ঘৃণ্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, শিল্প সাহিত্যের দিক থেকে এর কোনো সার্থকতা আছে কিনা। প্রত্যুত্তরে কবি শুধু বলবেন, সংসারে এমন মানুষও আছে, এমন ঘটনাও ঘটে। যদি তাই হয় তাহলেই সার্থক বলতে হবে, আজগুবি কথা না বললেই হল। কবি এবং সাহিত্যিক ঘটনা বা চরিত্রের গুণাগুণ বিবেচনা করেন না। কবির অভিজ্ঞতা আমার অভিজ্ঞতার চাইতে অনেক বেশি দূরগামী। সেই অভিজ্ঞতা তিনি কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য এবং রসগ্রাহ্য করে পরিবেশন করতে পারবেন তারই ওপরে নির্ভর করবে তাঁর শিল্পের উৎকর্ষ। যা যুক্তিগ্রাহ্য নয় তাই আজগুবি এবং যা আজগুবি সাহিত্যে তা বর্জনীয়। আবার মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্যে রসই প্রধান যুক্তি—যা রসগ্রাহ্য তাই যুক্তিগ্রাহ্য। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি—এটিই সকল সাহিত্যের ভূমিকা। সাহিত্য আমাদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার পরিধিকে বাড়িয়ে দেয়, অনেক অভূতপূর্ব ঘটনা, অনেক অদৃষ্টপূর্ব এবং অচিন্ত্যপূর্ব চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। সাহিত্যের এই একটি গুণ যে, একবার পরিচয় করিয়ে দেওয়া মাত্র এ সব চরিত্র অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মনে হবে। পাঠক অবাক হয়ে ভাববেন, তাইতো, এর সঙ্গে এতদিন পরিচয় হয় নি কেন? একে তো খুব চেনা মনে হচ্ছে। কাব্য সাহিত্যের এই হচ্ছে রীতি—ডক্টর জনসন বলেছিলেন, তাই উৎকৃষ্ট কবিতা যা এমন কথা বলবে—

"that which, though not obvious, is acknowledged upon its first production to be just, that which he who never found it, wonders how he missed." খুব খাঁটি কথা—যিনি কবি তিনি এমন কথা বলবেন, শুনে আমার মনে হবে,—আশ্চর্য, এমন খাঁটি, এমন সহজ কথাটা এতকাল আমার মনে হয় নি! এ জিনিসটা কি করে আমার চোখ, আমার মন এড়িয়ে গেল! শিল্পী-মনে আর সাধারণ মনে এই হচ্ছে মূলগত তফাত।

বাইরের জগতের সঙ্গে, বৃহত্তর মানব সমাজের সঙ্গে সাহিত্য আমাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়, কিন্তু সবচেয়ে বড় যে কাজটা সাহিত্য করে সেটা হচ্ছে আমাদের নিজের মনের সঙ্গেই সে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। নিজের মনকেই আমরা জানি না। কবি, সাহিত্যিক আমাদের মনের অনেক অন্ধকার কুঠরীর দরজা খুলে দেন। তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টির আলো না পড়লে আমার মনের অনেক রহস্য আমার নিজের কাছেই অজ্ঞাত থেকে যেত। মনকে সজাগ অর্থাৎ সরস করে তোলাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু মানুষের মন এমনই যে, জাগিয়ে দিলেও বেশিক্ষণ সজাগ থাকে না। মনের যে দরজা ক্ষণকালের জন্য খুলে গিয়েছিল সেটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের মনের মত পিচ্ছিল স্থান আর নেই, মন থেকে সবই পিছলে চলে যায়। এই জন্যেই এত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার যে সাহিত্য, সেই সাহিত্য মানুষের জীবনকে, সমাজকে সুন্দর করতে পারে নি। নিকট ভবিষ্যতেও যে পারবে এমন মনে হয় না। মানুষের মন ক্রমেই যেন স্থূল হয়ে যাচ্ছে, মানুষের অনুভূতি ভোতা হয়ে আসছে—ফলে সমগ্র সমাজে স্থূলতা দেখা দিয়েছে। আগে যদিবা করত এখন আর লজ্জার ব্যাপারে লজ্জা বোধ করে না, ঘৃণার ব্যাপারে ঘৃণা বোধ করে না। সব জিনিস সব মানুষের গা-সহা। সাহিত্য সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়েছে, এ শুধু তারই প্রমাণ। দেখা যাচ্ছে এত কবি এত সাহিত্যিক মিলেও মানুষের রুচিকে মার্জিত করতে পারেন নি। আবার আমার মতে সাহিত্যের ব্যর্থতা সভ্যতারই ব্যর্থতা কারণ সাহিত্যের মধ্যেই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

ম্যাথু আর্নল্ড যে শেলী সম্পর্কে বলেছিলেন—an ineffectual angel সেটিকে লোকে কটূক্তি বলে মনে করে। আসলে কটূক্তি কিছুই নয়, খুব খাঁটি উক্তি এবং এটি সকল কবির প্রতিই প্রযোজ্য। মহাকবিরা সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি—angel তুল্য, কিন্তু তাঁরা ineffectual কারণ তাঁরা ব্যর্থকাম,—তাঁদের রুচি, তাঁদের সৌন্দর্যবোধ, তাঁদের জীবনাদর্শ সমাজ কখনো গ্রহণ করে নি। দান্তে, শেক্সপীয়ার, গ্যয়টে, রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ সমাজে ব্যর্থ হয়েছেন। এঁরা এত সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন, ভাবতে অবাক লাগে, তার এতটুকু রং আমাদের মনে বা সমাজের গায়ে লাগল না।

মানুষের সভ্যতা আজও নড়বড়ে কারণ তার ভিত্তি, ধর্ম এবং রাজনীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এই দুটির একটিও নির্ভরযোগ্য জিনিস নয়। দুটিই দলগত ব্যাপার—যত সহজে দাঙ্গা বাধাতে পারে তত সহজে মনকে রাঙাতে পারে না। সেটি কেবলমাত্র সাহিত্যই পারে যদি মানুষ ঠিকভাবে তাকে গ্রহণ করতে শেখে। সমাজের স্তরে স্তরে যেদিন সাহিত্যের প্রভাব বিস্তৃত হবে, যেদিন মানুষের রুচি বদলাবে, সৌন্দর্যবোধ তার মনে মজ্জায় প্রবেশ করবে সেদিন সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ সভ্যতা যেদিন সাহিত্য-বাহন হবে সেদিন পৃথিবীতে নতুন যুগ আসবে।



জীবন ও সাহিত্য

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে এই কথাটি বলবার চেষ্টা করেছি যে, জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান অথচ জীবনের উপরে সাহিত্যের প্রভাব যৎসামান্য। বাস্তবিকপক্ষে জীবন সাহিত্যকে যতখানি প্রভাবিত করে সাহিত্য জীবনকে ততখানি প্রভাবিত করে না। ভারতবর্ষের মতো যেসব দেশে বেশির ভাগ মানুষ অক্ষর-পরিচয়হীন সে সব দেশের জীবনে সাহিত্যের মস্ত বড় একটা প্রভাব দেখা যাবে এমন আশা করাও অবশ্য অস্বাভাবিক। যে কালে কাব্য কাহিনী গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে গেয়ে কিংবা পড়ে শোনানো হত সেকালে জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্যের পসার তবু কিছু ছিল, এখন তাও নেই। বলা বাহুল্য কোন জিনিসের প্রচার হলেই তার পসার হয় না। সিনেমা এবং রেডিয়ো মারফত সাহিত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা এখনও রয়েছে—বেশ প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে—কিন্তু জনসাধারণের কাছে সহজপাচ্য করবার জন্য তাতে এত অধিক পরিমাণে জল মেশানো হচ্ছে যে, সেটা শেষ পর্যন্ত আর সাহিত্য থাকে না। সাহিত্যের স্বাদ সিনেমায় মেটে না। আমি যে চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ মহাভারত পাঠের কথা বলেছি সেখানে নির্জলা কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসই পড়ে শোনানো হতো। সেখানে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হত না। এ তো গেল নিরক্ষর অশিক্ষিত দেশের কথা, কিন্তু যে সব দেশে শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার, সেখানেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সাহিত্যের খুব একটা ছাপ পড়েছে এমন কথা জোর করে বলা চলে না। সাহিত্যপাঠের প্রধান যে ফলশ্রুতি—মার্জিত রুচি এবং রসজ্ঞান—মানুষের আচার ব্যবহারে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। কাব্যসাহিত্য সব দেশেই খানিকটা যেন পোশাকী জিনিস হয়ে আছে।

অনেক প্রকার প্রভাব মিলে জাতীয় চরিত্রের সৃষ্টি হয়। ভৌগোলিক অবস্থান, জলহাওয়ার গুণাগুণ, দীর্ঘকালীন জীবনধারা—এসব তো আছেই, এ ছাড়াও অনেক রকমের প্রভাব জাতির চরিত্রের ওপরে ক্রিয়া করে। আজকের বাঙালী চরিত্রে কত রকমের প্রভাব মিশে আছে—আর্য অনার্য হিন্দু বৌদ্ধ রীতিনীতির আচার বিচার তো আছেই, এ ছাড়াও আছে কিছু বৈষ্ণব সাধনা, কিছু শাক্ত আরাধনা, কিছু-বা আউল বাউল। পরবর্তী যুগে এসেছে ইংরেজী শিক্ষা—সেই আমলে। আবার কিছু রামমোহন, কিছু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, কিছু বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ, আর সর্বভারতীয় নেতারূপে গান্ধীজী। সব মিলিয়ে ধর্মীয় প্রভাবই প্রধান। স্বদেশী আন্দোলনের শুরু থেকে সাম্প্রতিক ইতিহাসে রাজনীতির প্রভাব ক্রমে প্রবল হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের দান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাজনীতি বাদ দিয়ে যদি কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক প্রভাব হিসেবে দেখা যায় তাহলে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাঙালী জীবনে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যৎসামান্য। অর্থাৎ সাহিত্যের প্রভাবটা সব চাইতে কম। শুধু বাঙলা দেশে নয়, সব দেশের বেলাতেই একথা প্রযোজ্য। যে ব্রিটিশ চরিত্র—বলা বাহুল্য অনেক গুণ সেই চরিত্রে, সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না—যে চরিত্র একদিন পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল কে তার প্রতিভূ—শেক্সপীয়ার মিল্টন না ক্লাইভ হেস্টিংস? বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, সব জাতির চরিত্রেই সূক্ষ্মের চাইতে স্থূলের প্রভাবটাই বেশি।

আদিকাল থেকে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজকে গড়বার চেষ্টা চলেছে। ধর্ম জিনিসটা মূলত কিছু খারাপ নয়, মানুষের ভালো করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ফল কিছুই হয় নি। ভালো যেটুকু করেছে তার চাইতে বিপত্তি ঘটিয়েছে বেশি। ধর্মের বিরোধ পৃথিবীময় অশান্তির সৃষ্টি করেছে। সমাজকে ভেঙেছে গড়তে পারে নি। মানুষের জীবনে ধর্ম যতখানি ব্যর্থ হয়েছে সাহিত্য ততখানি। ধর্মের মতো সাহিত্যও অনেক বড় বড় আদর্শ মানুষের চোখের সুমুখে তুলে ধরেছিল, সব আদর্শেরই অপমৃত্যু ঘটেছে। অবশ্য নীতি প্রচার করাটা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, সে সুন্দরের প্রচার করে। সাহিত্যের

জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত সৌন্দর্য সৃষ্টি সে করেছে আজকের জীবনে তার ছাপ কোথায়? সত্যি কথা বলতে গেলে আজকের জীবন যতখানি কুৎসিত আকার ধারণ করেছে সভ্যতার ইতিহাসে এমনটা বোধ করি কোনোকালে দেখা যায় নি। সাহিত্য রসের ভাণ্ডার, সেই রসই বা গেল কোথায়? মানুষের জীবন আজ নিরস নিরানন্দ। এই বঞ্চিত খণ্ডিত আনন্দবর্জিত জীবনের চিত্রই এলিয়ট এঁকেছেন তাঁর কাব্যে। দেখা যাচ্ছে সাহিত্য জীবনকে প্রভাবিত করে না, কিন্তু জীবন সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এই যে অসুন্দর জীবনের চিত্র, সাহিত্যের মাপকাঠিতে তাও আবার সুন্দর অর্থাৎ জীবনের সুন্দর আর সাহিত্যের সুন্দর এক জিনিস নয়। বাস্তব জীবনের দুঃখকষ্ট নৈরাশ্য হিংসা বিদ্বেষ কুটিলতা হিংস্রতা আমাদের দৃষ্টিতে কুৎসিত বলেই মনে হয়, সেই দৃশ্য মনকে ক্লিষ্ট করে। কিন্তু সাহিত্যিক যখন সেই কুৎসিত জীবনেরই সার্থক চিত্র আঁকেন তখন তা মনকে রসাপ্লুত করে। এর কারণ আমাদের সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে আমরা জীবনের সবটুকু দেখি না। ভাসমান বরফস্তূপের ন্যায় জীবনের অতি সামান্য অংশই প্রত্যক্ষ, বৃহত্তর অংশ অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগোচর যে জীবন আমরা তাকে বাস্তব আখ্যা দিয়েছি, আমি একে বলব জীবনের রূপ। সাহিত্যিক এই আপাতদৃষ্ট রূপটিকে আশ্রয় করে জীবনের যে অপ্রত্যক্ষ বা গভীরতর রহস্যকে উদ্ঘাটন করেন সেটি হল জীবনের স্বরূপ। জীবনের রূপ এবং স্বরূপে তফাৎ আছে। প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়ে জীবনের মধ্যে অপ্রত্যক্ষের যে সম্ভাবনা আছে সাহিত্যিক তাঁর কল্পনার দৃষ্টিতে সেটি দেখতে পান। দৃষ্ট এবং অ-দৃষ্ট—এই দুইকে মিলিয়ে দেখাই সত্যিকারের দেখা। কবি, সাহিত্যিকের সেই সত্য দৃষ্টি আছে। তিনি আপাতদৃষ্ট রূপকে ছাড়িয়ে জীবনের গভীরতর রূপকে দেখতে পান। আমি একেই বলেছি জীবনের স্বরূপ। মনে রাখতে হবে যে, ফ্যাক্টকে ছাড়িয়ে গেলেই ফিকশান হয় না। সাহিত্যে আমরা যাকে ফিকশান বলি তা অবিশ্বাস্য আজগুবি জিনিস নয়। আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যে সম্ভাবনা

লুক্কায়িত আছে তার আবিষ্কারকেই বলে ফিকশান। ফিকশান ফ্যাক্টেরই পরিস্রুত সংস্করণ। বাস্তব যখন কল্পনাপ্রবণ মনের মধ্য দিয়ে filtered বা পরিস্রুত হয়ে আসে তখনই তা সাহিত্যরসে পরিণত হয়। সকল কাব্যসাহিত্যই মূলত সার্থক ফিকশান।

সাহিত্যরসের মর্ম গ্রহণ করতে হলে পাঠকের পক্ষেও অল্পবিস্তর কল্পনা-শক্তির অনুশীলন প্রয়োজন। সেই জিনিসটিরই একান্ত অভাব। সাহিত্য যে মানুষের চিত্তমার্জনায় সক্ষম হয় নি তার কারণ বেশির ভাগ পাঠকই কল্পনাশক্তির অভাবে সাহিত্যের মধ্যে জীবনের সেই স্বরূপটিকে খুঁজে পায় না। সাহিত্য পাঠ সেই কারণে ব্যর্থ হয়। সাহিত্যের ছোঁয়া সোনার কাঠির ছোঁয়ার মতো। যে অতি অল্পসংখ্যক পাঠকের মনে এর সুরটি লাগবে তার সর্ব অঙ্গে মনে তার ছাপ পড়বে, তার মুখের বাক্য, মনের চিন্তা, নিত্যদিনের কর্ম রুচিসম্মত হবে, সমস্ত জীবন শ্রীমণ্ডিত হবে। এঁদের সংখ্যা যদি বৃহৎ হত তবে সমগ্র সমাজে সেই শ্রী সৌন্দর্য বিস্তৃত হত। সাহিত্যের প্রভাব তবেই সমাজজীবনে স্পষ্টত লক্ষ্যগোচর হত। সাহিত্যই সভ্যতার সব চাইতে বড় বাহন। দুঃখের বিষয় সেই বাহন সর্বত্রগামী হয় নি। রবীন্দ্রনাথের যে দুঃখ সকল কবিরই সেই দুঃখ—আমার কবিতা, জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

মোটামুটি দেখা যাচ্ছে সাহিত্য এ যাবৎ জীবনকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে নি ; কিন্তু জীবন যে সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। সে প্রভাব দিনে দিনে বাড়ছে। অতি প্রাচীনকালে জীবন ছিল সাদাসিদে, সে জীবনে উপকরণ বাহুল্য ছিল না। কবিরা প্রচুর পরিমাণে কল্পনার রং মিশিয়ে তাকে সাজাতেন। বীরপুরুষরা লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হতেন, গোটা পাহাড় কাঁধে করে বয়ে আনতেন, পুষ্পক বিমানে আকাশে পাড়ি দিতেন। এককালে আজগুবি মনে হত, কিন্তু কবি কল্পনা যে বাস্তবকে ছাড়িয়ে মানুষের শক্তির সম্ভাবনাকে রূপ দিতে পারে এসব তারই দৃষ্টান্ত। আজকের বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এই সেদিনও চাঁদে হাত দেওয়াকে লোকে হাস্যকর আস্পর্ধা বলে মনে করত,

কিন্তু তোড়জোড় যা চলছে তাতে মনে হয় চন্দ্রলোকে মানুষের পায়ের ধুলো পড়তে আর বিলম্ব নেই। আজকের দিনে নিছক বাস্তব কবিকল্পনাকে হার মানিয়েছে। কবি সাহিত্যিককে এখন আর কল্পনায় রং চড়িয়ে কিছু বানিয়ে বলতে হয় না। অবশ্য তাতে কবিকল্পনা হ্রাস পেয়েছে কিংবা পাবে এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, আজগুবি কথা বানিয়ে বলার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই, কারণ তার মধ্যে খাঁটি কল্পনাশক্তির প্রকাশ নেই। কবিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস, সে জিনিস কখনো সম্ভাব্যতার সীমাকে লঙ্ঘন করে না। বাস্তবের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, কিন্তু এমনি তার মোহিনী শক্তি যে, অতি পরিচিত বস্তুর মধ্যেও সে অপরিচয়ের মোহ সঞ্চার করতে পারে, পুরাতনকে নতুন করে, সাধারণকে অসাধারণ। নিছক বাস্তবকেও চোখের সম্মুখে জাজ্বল্যমান করে তুলতে হলে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। ইস্পাতকে যেমন বারম্বার তাপ এবং শৈত্যের স্পর্শ দিয়ে temper করে নিতে হয় কবি সাহিত্যিকরাও বাস্তবকে ঠিক একই প্রক্রিয়ায় আপন মনের শীতাতপ স্পর্শে কাব্যের উপযোগী করে নেন। ইমাজিনেশন বা কবিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে আর কিছু নয়—সাহিত্যের উপকরণকে temper করে নেওয়ার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সকলের আয়ত্তাধীন নয়। যে উপকরণ আমার হাতে পড়ে নেতিয়ে পড়বে সেই উপকরণই যোগ্যপাত্রে পড়লে অর্থাৎ যে মানুষের কল্পনা সিদ্ধিলাভ করেছে সেই কবিমনের স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

এ যুগের সাহিত্যে আজগুবির স্থান সঙ্কুচিত হয়েছে, কিন্তু তাই বলে কল্পনার পথ রুদ্ধ হয় নি। বিজ্ঞানের যুগে যুক্তির প্রতি মানুষের আগ্রহ স্বাভাবিক। পূর্বকালের সংশয়হীন মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাব কমে আসতে বাধ্য। বল্গাহীন অবাধ কল্পনার প্রশ্রয়ও কমে এসেছে। তবে জলের গতি যেমন রোধ করা যায় না, একদিকে বন্ধ হলে অন্যদিকে পথ করে নেয়, মানুষের কল্পনাও তেমনি—অপ্রতিহত তার গতি। যে বিজ্ঞান এককালের যুক্তিহীন কল্পনাকে সংযত করেছে সেই বিজ্ঞানই আবার নতুন নতুন দিকে অজ্ঞাত বিস্ময়ের দ্বার উন্মুক্ত করেছে এবং মানুষের কল্পনাকে নতুন পথে পরিচালিত

করেছে। অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কবি সাহিত্যিকরা এখন প্রত্যক্ষ জগৎকে ছেড়ে মানুষের মনোজগতে প্রবেশ করেছেন। মানুষের মনের গহনে অন্ধকার অলিতে গলিতে কবিমনের কৌতূহলী সঞ্চরণ। ফ্রয়েড সেই মনোজগতের পথ বাৎলে দিয়েছেন। এ ছাড়াও বিজ্ঞানের নানা বৈচিত্র্য এ যুগের সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এইচ. জি. ওয়েলস আধুনিক বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে মনোহারী নানা উদ্ভট কাহিনী রচনা করেছেন। অগণিত মানুষ পাঠ করে আনন্দ পেয়েছে, পৃথিবীর নানা ভাষায় সে সব গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। আবার এই সূত্রেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ওয়েলস পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য উগ্র স্বাদেশিকতার নিন্দা করে বিশ্বমৈত্রীর জয়গান করেছেন। তাঁর রচিত বিশ্ব ইতিহাস একই মানব পরিবারের ইতিবৃত্ত হিসেবে লেখা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে ভবিষ্যদ্বাণী করে মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে-ছিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হয় নি। মানবপ্রেমিক সাহিত্যিক হিসেবে ওয়েলস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। সমাজজীবনে সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের প্রভাব যে কত সামান্য এখানেই তার প্রমাণ।

দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের দান সমাজ বেশির ভাগই বর্জন করেছে, গ্রহণ করেছে যৎসামান্য; ওর প্রভাবকে সে মোটামুটি অস্বীকার করেছে। কিন্তু সাহিত্য সমাজকে বা জীবনকে এড়িয়ে চলতে পারে নি, কোনো কালে পারবেও না। নদীর স্রোতে আর সাহিত্যের স্রোতে সাদৃশ্য আছে। নদী তার দুই তীরবর্তী প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিকে বহন করে চলে, সেজন্যে নদীর অন্য নাম চিত্রবহা। সেদিক থেকে কাব্যসাহিত্যকেও বলা চলে চিত্রবহা, কারণ প্রত্যেক যুগের সাহিত্য আপন যুগের ছবিকে বহন করে চলে। এ যুগের কাব্যসাহিত্যের ওপরে একালের ছাপ পড়বে তাতে আর বিচিত্র কি? কলকারখানার যুগ—কলকারখানার কালিঝুলি ধোঁয়া সাহিত্যের গায়েও লেগেছে। লোহা ইস্পাতের যুগ—ইস্পাতের ধার এবং কাঠিন্যও বেশ খানিকটা এসেছে আজকের সাহিত্যে। আবার চিমনির ধোঁয়া ছাড়া আরো

আছে বারুদের ধোঁয়া। যুদ্ধের আতঙ্ক সর্বত্র। পৃথিবীর কোনো না কোনো অংশে ছোটখাট দ্বন্দ্ব লেগেই আছে, যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। এই নিয়ে মানুষের মনে গভীর অস্বস্তি। অ্যাটম বম নিয়ে ঘর করার বিপত্তি মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এই যুগের সব চাইতে বড় ব্যাধি মানসিক উদ্বেগ—এগজিস্টেনশিয়ালিস্টরা যাকে বলেছেন Angst ; এই সর্বব্যাপী উদ্বেগের নিঃসংশয় ছায়া পড়েছে আজকের সাহিত্যে। পর পর দুই মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম মহাদেশে জীবন সম্বন্ধে মানুষের মনে আর নিশ্চয়তার নিশ্চিন্ত ভাবটি নেই। যুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মানুষের জীবন যৌবন ধন মান আজ আছে তো কাল নেই। আবার যুদ্ধই উদ্বেগের একমাত্র কারণ নয়। আজকের ভারতবর্ষের কথাই ভেবে দেখুন—নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসের অভাবে মানুষের প্রতিদিনের সংসারযাত্রা বিপর্যস্ত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানুষের মনে গভীর উদ্বেগ এবং হতাশা, জীবন সম্বন্ধে মানুষ বীতস্পৃহ। জীবনদর্শনের গভীরতর উপলব্ধি থেকে যদি এই নিস্পৃহতার জন্ম হত তাহলেও না হয় এর কিছু মূল্য থাকত। কিন্তু এর জন্ম নিছক তিক্ততা থেকে। এই কারণে এটি যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অস্বাস্থ্যকর।

যুদ্ধ এবং আর্থিক দুর্গতি—এই দুই স্থূল কারণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে এই উদ্বেগ এবং হতাশার মূলে। একথা নিশ্চিত যে আজকের জীবনে নানা অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। অনেক ব্যাপার ঘটছে যা আপাত-দৃষ্টিতে এক রকম কিন্তু একটু খুঁটে দেখলেই মনে হবে ঠিক তার উল্টো। দৃষ্টান্ত—দেশের পর দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করছে কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। এক কালে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা অনেক বেশি ছিল। এই যে বৃহৎ মানবসংসার প্রত্যেক মানুষের না হলেও বহু সংখ্যক মানুষের তাতে অল্পবিস্তর হাত ছিল, নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করবার খানিকটা অধিকার তার ছিল। রাজশক্তি চিরকালই বীরবাহু কিন্তু সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করবার মত এমন দীর্ঘবাহু কোনোকালে ছিল না। রাজা রাজস্ব আদায় করতেন, প্রজাপালনের জন্যে তার নিরাপত্তা

ব্যবস্থা করতেন। বহিঃ-শত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করতেন। সমাজ বলে একটা ব্যাপার ছিল—বাকি সব করণীয় সমাজের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হত। এখন রাজশক্তি যত হাত বাড়াচ্ছে সমাজ তত হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। রাষ্ট্র এখন সর্বগ্রাসী, রাষ্ট্রের শক্তি ক্রমেই এত বাড়ছে যে, কোনো মানুষেরই জীবন এখন পুরোপুরি তার আয়ত্তের মধ্যে নেই। সেজন্য মনে তার সুখ নেই, শান্তি নেই, জীবনে আনন্দ নেই। অতি অল্প সংখ্যক মানুষ সমস্ত পৃথিবীর রাষ্ট্রপরিচালনা করছেন। জনকয়েক রাষ্ট্রনায়ক সেনানায়ক আর শিল্পনায়ক পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসে আছেন। কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রনায়কের হাতে ঝুলছে। পশ্চিম মহাদেশে দুই মহাযুদ্ধের পরে সাধারণ মানুষ আর ভবিষ্যতের কথা ভাবছে না। আমেরিকার বীট্ সম্প্রদায়, ইংল্যাণ্ডের অ্যাংরি ইয়াং মেন ভবিষ্যতে বিশ্বাস করেন না। 'এক লহমা সময় আছে, সর্বনাশের মধ্যে তোর'—অতএব বর্তমান মুহূর্তটিই তোমাব একমাত্র ভরসা।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়ছে অভাবনীয় গতিতে। সীমাবদ্ধ আয়ে সুবৃহৎ পরিবার পালনের যে সঙ্কট সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধরিত্রীমাতা আজ সেই সঙ্কটের সম্মুখীন। সারা পৃথিবীতে অন্নসঙ্কট। মাতা বসুন্ধরা তাঁর বিরাট পরিবার অগণিত পোষ্য নিয়ে নাজেহাল। এতবড় পরিবার প্রতিপালনের উপকরণ, আয়োজন তাঁর হাতে নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বহ। প্রত্যেকে নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত, কেউ কারো কথা ভাববার সময় পায় না, স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই চাকরি করতে হয়, দুজনেই ক্লান্ত, ক্লান্ত দেহে মনের একমাত্র আশ্রয় গৃহ, সেই গৃহ ছত্রভঙ্গ। আমাদের গৃহ, ওদের হোম জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত। পূর্বে যে অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করেছি এখানেও সেই অসঙ্গতি—লোকসংখ্যা যত বাড়ছে মানুষ তত বেশি নির্জন বোধ করছে। অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে থেকেও মানুষ নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ নিঃসহায় মনে করে। টি. এস. এলিয়ট তাঁর কাব্যে এই নির্বান্ধব, নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ মানুষের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা আজ ৩০০ কোটি। যে হারে বাড়ছে তাতে আর পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা এর দ্বিগুণ হয়ে যাবে। শুধু এই

কারণেই পৃথিবীতে যুদ্ধ অনিবার্য হবে। মাও সে তুঙ নেহেরুকে অত্যন্ত নির্বিকার চিত্তে বলেছিলেন, আণবিক যুদ্ধ যদি বাঁধে তো তাঁর দেশের পঁচিশ ত্রিশ কোটি লোক অবশ্যই মারা যাবে, তাহলেও আরো পঁচিশ ত্রিশ কোটি বেঁচে থাকবে, কাজেই সেটা এমন কিছু একটা ভয়ের ব্যাপার নয়। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি যে শেষ পর্যন্ত লোকক্ষয়কর ব্যাপারে দাঁড়াবে, এসব তারই আভাস। ইতিমধ্যেই চীনদেশে যুদ্ধ এবং ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। লোকসংখ্যা বিস্ফোরণ আর চীনের আণবিক বিস্ফোরণ নিতান্ত নিঃসম্পর্ক ব্যাপার নয়।

লোকসংখ্যা হ্রাসের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এর প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু এর ফলে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে ঘোরতর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যৌন সম্পর্কের সঙ্গে একটি মৌন সম্পর্ক —নীরব মনের যোগ বিদ্যমান। কনট্রাসেপসনের ফলে দেহ এবং মনের বিচ্ছেদ ঘটেছে। নানা কারণে আমাদের যাবতীয় মানবিক সম্পর্ক—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, পিতাপুত্রের সম্পর্ক, গুরুশিষ্যের সম্পর্ক, বন্ধুতে বন্ধুতে সম্পর্ক সমস্তই খানিকটা অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্য মূলত এই সব মানবিক সম্পর্কেরই ইতিহাস। কাজেই মানুষে মানুষে সম্পর্ক যেমন বদলাচ্ছে সাহিত্যের প্রকৃতিও ঠিক সেইভাবে বদলে যাচ্ছে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

আধুনিক সমাজের যে সব লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলো বিশেষ-ভাবে পাশ্চাত্ত্য জগতের সমস্যা। আমাদের দেশে এর সবগুলো সমস্যাই খুব তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে এমন কথা বলা যায় না। কলের দ্বারা পরি-চালিত যে কলি যুগ সেটি পশ্চিম মহাদেশে আগেই এসেছে। আমাদের দেশে সেই কলসর্বস্ব যুগ এখনও পুরোপুরি আসে নি, সবে তার সূচনা হয়েছে। যন্ত্র আমাদের আঙিনায় এসে পৌঁছেছে, অন্দরে ঢোকে নি। আমাদের মনকে এখনও গ্রাস করে নি তথাপি এর ভয়াবহতা আমাদের সাহিত্যে খানিকটা তার ছায়াপাত করেছে। স্বীকার করতেই হবে যে, এর খানিকটা এসেছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুকরণ থেকে। এককালে এই অনুকরণ-প্রিয়তাকে ঠাট্টা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, হাট নেই ত্রিসীমানায়, কিন্তু

হট্টগোল আছে পুরোমাত্রায়। অর্থাৎ কিনা যে সব সমস্যা আমাদের দেশে এখনও দেখা দেয় নি, জোর করে তার আমদানি করা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যখন একথা বলেছিলেন তখন তাঁর উপহাসবাক্য যতখানি সত্য ছিল আজ আর ততখানি নেই। ওপারের হাট এপারে এসে গিয়েছে। পৃথিবীর সাত সমুদ্র এখন এক সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। আটলান্টিকের ঢেউ ভারত সমুদ্রের তটে এসে লাগছে। অ্যাটম বম-এর জন্ম পশ্চিমে, কিন্তু তার ব্যবহার হয়েছে প্রাচ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইয়ুরোপের রণক্ষেত্রে যখন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ ঘটছিল তখন বাঙলা দেশে বহু লক্ষ লোক অনাহারে মরেছে। যুদ্ধের চাইতে তার ভয়াবহতা কিছুমাত্র কম ছিল না। আজকে দেশে আবার যে অভাব অনটন অব্যবস্থার সূচনা দেখা দিয়েছে তাতে যুদ্ধ-পীড়িত ইয়ুরোপে জীবন সম্পর্কে যে অনাস্থা এবং অনিশ্চয়তা এখানেও সেই অনিশ্চয়ের আশঙ্কা দেখা দিতে বাধ্য। আমাদের সদ্য পাওয়া স্বাধীনতা জনসাধারণের মনে নতুন জীবনের আস্বাদ তো দূরের কথা তার আশ্বাসও দিতে পারে নি। ফলে আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মনে ব্যর্থতাব তিক্ততা। সুতরাং আমাদের ইদানীংকালের সাহিত্যে যদি সেই ব্যর্থতা এবং তিক্ততার ছাপ পড়ে, জীবনের প্রতি যদি বিমুখতা বা অনাসক্তি প্রকাশ পায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।



সাহিত্য ও শালীনতা

যাহা নাই জীবনে তাহা নাই সাহিত্যে—একথা যদি সত্য হয় তাহলে আরেকটি সত্যকেও এই সঙ্গে মেনে নিতে হবে যে, জীবনে যার স্থান আছে সাহিত্যেও তার স্থান থাকবে। কাজেই যদি বলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে—নিত্যকার আচার ব্যবহারে শালীনতার প্রয়োজন আছে তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, সাহিত্যেও তার প্রয়োজন আছে। অবশ্য আমি যত সহজে প্রশ্নটার মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করছি জানি তত সহজে এর চূড়ান্ত মীমাংসা হবার নয়। কারণ এর সঙ্গে আরো অনেক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে শালীনতা বলতে আমরা কি বুঝি। এ কথা বললে বোধকরি কারো আপত্তি হবে না যে, যা শীলতা রক্ষা করে চলে, যা সুস্থ এবং সুষ্ঠু তাই শালীন। যে কথা বা যে ব্যবহার আমার রুচিকে, আমার সৌন্দর্য-বোধকে পীড়া দেয় তা অশালীন।

শালীনতা কথাটি মৌলিক অর্থে বোঝায় 'সলজ্জ ভাব'। বর্তমান আলোচনায় এই অর্থটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিল্পমাত্রেরই স্বভাব নম্র, সে স্বভাবতই লাজুক প্রকৃতির। যে কথা অপরের মুখে বাধে না তা শিল্প সাহিত্যের মুখে বাধে। কোনো প্রকার প্রগলভতা ওর স্বভাব বিরুদ্ধ। এই অপ্রগলভ সলজ্জ ভাবটুকুই শিল্প সাহিত্যের সব চাইতে বড় আকর্ষণ। লজ্জা শরম যার যত বেশি তত সহজে তার সম্ভ্রমহানি হয়; সেই কারণে কাব্য-সরস্বতীর সম্ভ্রমহানি অল্পেতেই ঘটতে পারে। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বক্তার যা বলতে বাধে, শ্রোতার যা শুনতে বাধে সে জাতীয় কথার মধ্যেই শালীনতার অভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে, যে কথা মুখে বলতে বাধে সে কথা লেখায় লিখতে বাধে না। আগে বলত—শত কথা মুখে

বোলো, লেখায় লিখো না। এখন হয়েছে উল্‌টো—যা খুশি লিখতে পার, মুখে উচ্চারণ কোরো না। ছাপার অক্ষর বোবা, ও চ্যাঁচাতে পারবে না।

লজ্জা যে কেবল রমণীর ভূষণ এমন নয়, শিল্প সাহিত্যেরও ভূষণ। রমণীস্বভাবের সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের স্বভাবের আরো অনেক মিল আছে। রমণীয়তাই রমণীর শ্রেষ্ঠ গুণ, শিল্পসাহিত্যেরও তাই। রমণীর রমণীয়তা কেবলমাত্র দেহসৌষ্ঠবে নয়, শিল্পসাহিত্যেরও আকর্ষণ উপকরণে নয়। উভয়েরই রমণীয়তা তার আচরণে। যে রমণীর দেহসৌষ্ঠব নেই সেও মানুষের মনকে টানে—স্বভাব মাধুর্যের গুণে। সাহিত্যের দৈহিক রূপ তার বিষয়বস্তুতে এবং ভাষার পরিচ্ছদে। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় না হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত রসস্রষ্টার হাতে পড়লে সেও প্রসাদগুণে প্রসন্ন হয়ে ওঠে। যে রমণীর মুখশ্রী অনিন্দনীয় তারও পোশাক দৃষ্টিকটু, চলন বলন শ্রীহীন হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। লেখক যেখানে মধুর রসের অবতারণা করেছেন সেখানেও ভাষার অসংযমে, ইঙ্গিতের স্থূলতায় সে রস গাঁজিয়ে উঠতে পারে। রস বড় সূক্ষ্ম জিনিস, ওখানে স্থূল জিনিসের ভেজাল চলে না। অনাবশ্যক সামগ্রী মেশাতে গেলে কিছুতেই মিশ খায় না। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা ধাত আছে কাব্য সাহিত্যেরও তেমনি ধাত আছে, মেজাজ আছে—সব জিনিস তার ধাতে সয় না। শিল্পের সব চাইতে বড় কথা পরিমিতি-বোধ—sense of proportion—ঠিক যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই সে গ্রহণ করে। অতিরিক্ত মশলা মেশাতে গেলে খাদ্য যেমন অখাদ্য হয়ে ওঠে যে কোনো রকমের আতিশয্য কাব্যরসকে তেমনি বিরস এবং বিস্বাদ করে তোলে। কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে গৃহিণীপনা চাই। গ্রহণীয়কে গ্রহণ, বর্জনীয়কে বর্জন—এরই নাম সাহিত্যের গৃহিণীপনা। একেই বলে পরিমিতিবোধ—সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঔচিত্যবোধ। রসবিচারে ঔচিত্যবোধকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু পরিবেশনে সামঞ্জস্য বা স্বাভাবিকতা রক্ষার নামই ঔচিত্য। কাশ্মীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র তাঁর ঔচিত্যবিচারচর্চা নামক গ্রন্থে বলেছেন—যে বস্তু যার সঙ্গে সদৃশ অর্থাৎ মানানসই সেই বস্তুই তার পক্ষে উচিত (উচিতং প্রাহুরাচার্য্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ)। যা সদৃশ নয়

তাই বিসদৃশ, তাই বেমানান এবং যা বেমানান তাই অসুন্দর। আবার আলঙ্কারিকদের মতে যা অসুন্দর তাই অশ্লীল।

এ হল একেবারে গোড়াকার কথা কিন্তু এখানেও মতান্তরের সম্ভাবনা আছে। আমার চোখে যা মানানসই অপরের চোখে তাই বেমানান হতে পারে আবার অপরের মনকে যা পীড়া দেয় না, আমার মন তাতেই পীড়া বোধ করতে পারে। এখানে সাহিত্যিককে খানিকটা দায়িত্ব বহন করতে হয়। সমাজের রুচি গঠনে সাহিত্য তথা সাহিত্যিক অনেকখানি সহায়তা করতে পারেন। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে সামাজিক রুচি এবং সামাজিক নীতি—এক কথা নয়। যা নীতিবিগর্হিত তা রুচিবিগর্হিত নাও হতে পারে। সমাজ যে জিনিসে আপত্তি করে রস সে জিনিসে অনেক সময়েই আপত্তি করে না। পরকীয়া প্রেম সমাজের বিচারে দূষণীয়, রসের বিচারে নির্দোষ। তাহলেই দেখা যাচ্ছে সামাজিক ঔচিত্য এবং রসের ঔচিত্য এক জিনিস নয়। সাহিত্য একমাত্র রসের দাবিকেই মানে, নীতির দাবিকে মানতে সে বাধ্য নয়। রসের রাজ্যে নীতির প্রবেশ অনেক সময়েই অনধিকার প্রবেশ, কিন্তু রুচির প্রবেশ স্বাভাবিক অধিকারে। কারণ রুচি বলতে আমি বুঝি সূক্ষ্ম রসবোধ। সাহিত্য সূক্ষ্ম অনুভূতির জিনিস এবং সেই কারণেই যে কোনো প্রকারের স্থূলতা সেখানে বেমানান। স্থূল কথাবার্তা স্থূল রসিকতা স্থূল ব্যবহার রুচিবিগর্হিত এবং রুচিবিগর্হিত বলেই সাহিত্যে বর্জনীয়। সাহিত্যে রসবোধ এবং রুচিবোধ অতি নিকট আত্মীয়তা সম্পর্কে আবদ্ধ। কারণ সূক্ষ্ম রসানুভূতির আনন্দকে উদ্দীপিত করেই সাহিত্য মানুষের রুচিকে মার্জিত করে।

অবশ্য স্থূল এবং সূক্ষ্ম রুচির বিচারেও তর্কের অবকাশ আছে। গ্রাম্য কথাবার্তা আচার ব্যবহার মাত্রই স্থূল এমন কথা কেউ বলবে না। যে যেমন স্তরের মানুষ সে ভাষাতেই সে কথা বলবে। তার মুখে তাই সদৃশ অর্থাৎ মানানসই। সে ভাষা যতই গ্রাম্য হোক তা স্থূলতা দোষদুষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের একটি গ্রাম্য ছড়ায় 'ভাতারখাকী' শব্দের পরিবর্তে 'স্বামীখাকী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন আমার মতে সেটা অহেতুক বাড়াবাড়ি। যার

মুখে ঐ শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে তার মুখে ভাতারখাকী কথাটি বেমানান তো নয়ই বরং স্বামীখাকীর চাইতে অনেক বেশি লাগসই। লোকসাহিত্যে লৌকিক ভাষার যদি স্থান না হয় তবে সে সাহিত্য অলৌকিক হয়ে ওঠে। এসব কথা যে কেবল খিড়কি দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে এমন নয়, সাহিত্যের সদর দরজায়ও এদের প্রবেশাধিকার আছে। একটা খুব সাধারণ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রাজশেখর বসু মশায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিশেখর বসু মশায় একখানা অতি সুখপাঠ্য ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বই লিখেছেন। তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে 'বেফাঁস' কথার প্রয়োগ থাকত বলে কেউ কেউ আপত্তি করেছিলেন। তার জবাবে তিনি বলেছেন, "কেন, এতে আপত্তির কি আছে? বঙ্কিমবাবুতে তো 'মাগী' দেদার।" ঠিকই বলেছেন—আপত্তির কিছুই নেই। বঙ্কিমবাবুর মাত্রাজ্ঞান অত্যাশ্চর্য। তিনি যেখানে উক্ত শব্দের ব্যবহার করেছেন সেখানে সাহিত্যিক শালীনতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। এমন কি শশিশেখরবাবু যেরূপ কৌতুকের সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন তাও সাহিত্যের প্রসাদগুণ লাভ করেছে। সাহিত্যের দুই ভঙ্গি—এক দৃষ্টিভঙ্গি আরেক প্রকাশভঙ্গি। প্রকাশভঙ্গিতে গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার আপত্তিজনক নয়। দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি গ্রাম্যতা অর্থাৎ স্থূলতা প্রকাশ পায় সেটি অবশ্যই দূষণীয়। শালীনতা অশালীনতা কেবল ভাষার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তার আসল পরিচয়।

দেবী সরস্বতী স্বভাবতই সহনশীল। যে দেবী হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক সহ্য করতে পারেন ভাষার ইতর বিশেষ সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই দেবী বীণাপাণি। একবার সুরে অর্থাৎ রসে লাগাতে পারলে যে কোনো ভাষায় যে কোনো বিষয় তাঁর বীণায় ঝঙ্কৃত হবে। ভাষার কৌলীন্য কিংবা বিষয়বস্তুর গুরুত্ব দিয়ে তাকে ভোলানো যাবে না। তিনি একমাত্র রসের নৈবেদ্যটুকুই গ্রহণ করেন। রসসৃষ্টির আরেক নাম সৌন্দর্যসৃষ্টি। সাহিত্য সুন্দরের উপাসক। সুন্দরের কোনো জাত নেই। এজন্যে সাহিত্য বিষয়বস্তুর কোনো বাছবিচার করে না। জীবনে যা মানিয়ে যায় সাহিত্যে কখনো তা বেমানান হয় না। অবশ্য সাহিত্যশিল্পীকে একটি বিষয়ে সতর্ক

দৃষ্টি রাখতে হবে—জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভাষার বৈষম্য আছে—জ্ঞান বুদ্ধির বৈষম্য আছে, অভিজ্ঞতারও বৈষম্য আছে। কাজেই কোন্‌খানে কোন্‌টা মানাবে সেই জ্ঞান না থাকলে মাত্রাজ্ঞানের অভাব প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য, যেখানে মাত্রাজ্ঞানের অভাব সেখানে শালীনতারও অভাব।

মাত্রাজ্ঞান শিল্পী সাহিত্যিকের পক্ষে অপরিহার্য। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই শিল্পের অপমৃত্যু ঘটে। 'সাহিত্যে অনাবশ্যকের কোনো স্থান নেই—যা অনাবশ্যক সাহিত্যে তাই অশালীন। সাহিত্যের একটি প্রধান কর্তব্য অপরিচিতকে আমাদের কাছে পরিচিত করা কিংবা এতকাল আমার কাছে যা পরিচিত বলে মনে হত তারও মধ্যে নতুনত্বের সৃষ্টি করে নতুন পরিচয়ের রোমাঞ্চ সঞ্চার করা। যে জিনিস অতিপরিচয়ে ম্লান, নিত্য অভিজ্ঞতায় জীর্ণ, যা obvious বা স্পষ্টত প্রতীয়মান, যা না বললেও চলে তার প্রতি সাহিত্যের কোন ঔৎসুক্য নেই। কাব্য সাহিত্য শিল্প মাত্রই ইঙ্গিতময়। ইঙ্গিতের দ্বারা অজ্ঞাতের প্রতি পাঠকের দৃষ্টিকে প্রসারিত করাই তার কাজ। যে জিনিস সুপরিজ্ঞাত, নিত্য অভিজ্ঞতার আয়ত্তের মধ্যে—তার সুবিস্তৃত বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনের সত্যতা কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু এর যথাযথ বর্ণনা না দিলে এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় না এমন কথা যিনি মনে করেন তিনি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকে খুব বেশি সম্মান দেন না। ডি. এইচ. লরেন্স প্রণীত লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার নামক গ্রন্থে expurgated edition বা কর্তিত সংস্করণ আর অধুনা প্রকাশিত অবর্জিত (আবর্জনা সমেত) সংস্করণ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন যে, প্রথমোক্ত সংস্করণ অনেক বেশি শিল্পসম্মত। রসিক পাঠকের কাছে পথের ইঙ্গিতই যথেষ্ট—তাকে ঝুরি-নামা বট গাছের পাশ দিয়ে, বাঁশ-ঝাড়ের তলা দিয়ে ক্ষান্তবুড়ির আঙিনা দিয়ে একেবারে ঘরের দোরে পৌঁছে দেবার কোনো প্রয়োজন হয় না। মানুষ ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত এবং কামার্ত জীব। আহার নিদ্রা মৈথুন জীবনের মস্ত বড় অংশ, কিন্তু সেটাই মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। এটাকে বলা যায় জীবনের পটভূমিকা, জীবনের

কাঠামো। চতুর্দিকস্থ উঁচু পাড়ি, এরই মধ্যে জলাশয়—সেইখানে মানুষের সঞ্চরণ, সন্তরণ, অবগাহন ; তার স্নেহ ভালবাসা, দয়া মায়া, অনুরাগ বিরাগ, ঘৃণা বিদ্বেষ, ক্রোধ ক্ষমা, উত্তেজনা নিস্পৃহতা। এই সমস্তটা নিয়ে মানুষের সমগ্র জীবন।

দেহের দাবিগুলো শুধু বড় নয়, প্রচণ্ড। প্রচণ্ড বলেই এর মূর্তি স্বাভাবিক নয়। মানুষ মাত্রই ক্ষুধার্ত জীব কিন্তু সারাক্ষণ ক্ষুধার্ত নয়, ক্ষুন্নিবৃত্তি হলেই সে অন্য মানুষ। কামার্ত মানুষেরও কাম নিবৃত্তি হলে সে অন্য মানুষ। সমগ্র মানুষের পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। তাকে খণ্ডিত করে কোনো রিপুকবলিত মূর্তিতে দেখাতে গেলে তার প্রতি ঘোরতর অবিচার হয়। সব রিপুর মধ্যেই একটা প্রচণ্ডতা আছে কিন্তু সেই প্রচণ্ডতা শান্ত হতেও খুব বেশি সময় লাগে না। প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি—এই দোটানার মধ্যেই মানুষের জীবন। দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারলে তবেই মানুষের সত্য পরিচয় দেওয়া সম্ভব। একটিকে প্রাধান্য দিতে গেলে একদেশদর্শিতার অপরাধ হয়। ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিক, কিন্তু যে মানুষ সারাক্ষণ ক্ষুধা ক্ষুধা করে তার প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে বিরক্তির উদ্রেক হয়। লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার (unexpurgated edition)-এর কথা একটু আগে বলেছি। এর মধ্যে এমন একটা অতিশয়তা আছে যা বিরক্তির উদ্রেক করে। কোনো কিছু জাহির করতে যাওয়া স্থূল মনের পরিচায়ক—বিদ্যে জাহির করা, টাকার গুমোর দেখানো, মানমর্যাদার বড়াই করা—কোনোটাই সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। এমন যে ধর্ম তাও ধার্মিকতা জাহির করতে গেলে হাস্যাস্পদ হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সব চাইতে অসহ্য spiritual arrogance ; ঠিকই বলেছেন। ডি. এইচ. লরেন্সের মধ্যে সেই arrogance অন্য আকারে দেখা দিয়েছে—তাকে বলা যেতে পারে sex সংক্রান্ত arrogance। ভাবটা যেন, এই দেখ না কেমন খোলাখুলি বলে দিয়েছি। জৈবধর্মে মানুষে আর পশুতে যে তফাত নেই সেই কথাটা একেবারে দিনের আলোয় স্পষ্ট করে দিয়েছি। যেন খুব একটা নতুন তথ্য। এই জাহির করবার প্রবৃত্তি সর্বত্রই দৃষ্টিকটু,

শিল্পে সাহিত্যে নিতান্তই বেমানান। অথচ ইদানীংকার সাহিত্যে এরই নাম হয়েছে সাহসিকতা। মানব জীবনের কোনো অজ্ঞাত রহস্যের উদ্ঘাটনে দুঃসাহসিক কল্পনা, ক্ষিপ্রবুদ্ধি এবং মুক্ত মনের প্রয়োজন আছে; কিন্তু যে কথা সকলের জানা, যা উল্লেখ করাও নিষ্প্রয়োজন সে কথা বলার মধ্যে সাহসিকতা কোথায় আমি বুঝে উঠতে পারি নে।

আধুনিক সাহিত্যের বাহন কথ্য ভাষা, কিন্তু বিষয়বস্তু অনেক সময় অকথ্য। আর বিষয় যদি অকথ্য হয় তো ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে অকথ্য হয়ে ওঠে—Lady Chatterley's Lover তার প্রমাণ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সাহিত্য সাহচর্যের বাহন। কেবলমাত্র লেখক এবং পাঠকের সাহচর্য নয়, পাঠকে পাঠকে সাহচর্য। সাহিত্য আনন্দ দান করে—আলাপে আলোচনায় পাঠকে পাঠকে সেই আনন্দের বিনিময় হয়। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, বন্ধু বন্ধুনীর সঙ্গে কি অকথ্য বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা চলতে পারে? এই যে রস বা আনন্দের পরিক্রমা—বিদ্যুৎ প্রবাহের সঙ্গে তার তুলনা চলে। গতিরুদ্ধ হলে short circuit হয়ে দুর্গতি ঘটায়। লরেন্সের উপরোক্ত গ্রন্থে রসের শর্ট সার্কিট হয়েছে কারণ ওর গতি ওখানেই রুদ্ধ। রস জিনিসটা সচল—মুখে মুখে পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বই-এর পাতায় যেটুকু চলেছে সেটুকুই ওর চলা। বৈঠকখানায় এসে ও অচল। রসের চলৎশক্তি যেই রহিত হল অমনি তার অপমৃত্যু ঘটল। এই ক্ষেত্রে লরেন্সের অসামান্য প্রতিভাও সেই বিপত্তি রোধ করতে পারে নি।

সাহিত্য সমগ্র মানবজীবনকে, মানবচরিত্রকে অনাবৃত করে দেখাতে পারে, তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মহৎ সাহিত্যে একটা বৃহৎ অনাবরণ আছে। মানুষের মানবত্ব এবং পশুত্ব কিছুই সে গোপন করে না। সমগ্র মানুষের পরিচয় আছে বলে সেই অনাবরণ অশ্লীল নয়। কিন্তু আংশিক অনাবরণ—যেখানে মানুষকে খণ্ডিত করে, একপেশে করে দেখানো হয়—সেই অনাবরণ অশ্লীল। শেক্সপীয়ারে যা বৃহৎ, জোলায় তা আংশিক। এই জন্য জোলা অশ্লীল, শেক্সপীয়ার অশ্লীল নয়। ঠিক ঐ কারণেই ভারতচন্দ্র অশ্লীল, কিন্তু মহাভারত অশ্লীল নয়।

শ্লীলতা অশ্লীলতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন। নীতি প্রচার সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় একথা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে সাহিত্যে নীতি প্রচার অসঙ্গত হলেও দুর্নীতির প্রশ্রয় সঙ্গত কিনা। এক প্লেটো ছাড়া প্রাচীন সাহিত্যাচার্যদের মধ্যে আর কেউ নীতির ওপরে খুব একটা জোর দেন নি। প্লেটো শিল্প-সাহিত্যকে মানুষের সৃজনবিলাসী আনন্দের আয়োজন হিসেবে দেখেন নি। তিনি ছিলেন রাষ্ট্র-অন্ত প্রাণ। সব কিছুর ওপরে রাষ্ট্রকে স্থান দিতেন। শিল্প-সাহিত্যকে দেখেছেন রাষ্ট্র-পরিচালনার সহায়ক হিসেবে। সমাজের বাঁধন বা রাষ্ট্রের কাঠামোকে দুর্বল করতে পারে এমন কিছু প্রচার করাকে তিনি সমাজবিরোধী কাজ বলে মনে করতেন। এই জন্যে কবিদের তিনি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন। গ্রীক মহাকাব্যে দেবদেবীদের যে বর্ণনা আছে তাতে তিনি আপত্তি করেছেন। আচারব্যবহারে, পরস্পর দ্বন্দ্বকলহে, অবাধ প্রেমলীলায় দেবদেবীরা লোকচক্ষে হাস্যকর প্রতিপন্ন হয়েছেন। দেবলোকে নীতিবোধ শিথিল—এই যদি লোকের ধারণা হয় তবে সমাজে সেই শিথিলতা প্রশ্রয় পেতে পারে—এই ছিল প্লেটোর আশঙ্কা। দেবতার মানহানি আমাদের মহাকাব্যেও অল্পবিস্তর ঘটেছে। সমাজে যে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে তারও প্রমাণ রয়েছে সাধারণে প্রচলিত প্রবাদবাক্যে—দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা। অবশ্য রসিক ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন যে, কবিরা কিছু অন্যায় করেন নি। সারাক্ষণ দেবতাদের মান বাঁচিয়ে চলতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ কাউকে দেন নি। বরং কবিরা দেবলোকের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে রসজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছেন। অ্যারিস্টটল প্লেটোকে পুরোপুরি সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে সাহিত্যে রসের বিচারই মুখ্য বিচার—নীতির প্রশ্ন গৌণ। আনন্দ দান সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য—কতখানি আনন্দ দিয়েছে তাই দিয়েই তার শেষ মূল্য যাচাই হবে। কিন্তু অ্যারিস্টটল এই সূত্রে বলতে ভোলেন নি যে, সেই আনন্দকে নির্মল (সেন অ্যাণ্ড হোলসাম) হতে হবে। সাহিত্য ব্যক্তিগত সৃষ্টি, কিন্তু সমাজের সম্পদ। সুতরাং সেই আনন্দ সুবুদ্ধি প্রণোদিত এবং সমাজের পক্ষে

স্বাস্থ্যকর হওয়া বাঞ্ছনীয় এ কথা যদি কেউ বলেন তো আপত্তির কোনো কারণ দেখি না।

রমণীস্বভাবের সঙ্গে সাহিত্যের স্বভাবের মিল আছে সে কথা গোড়াতেই উল্লেখ করেছি। রমণীর যেমন খানিকটা আব্রু সব সময়েই প্রয়োজন সাহিত্যেরও সেই আব্রুর প্রয়োজন আছে। কতটুকু অন্দর মহলে প্রবেশের অধিকার পাবে আর কোন্ জিনিসকে সদর দরজা থেকেই বিদায় করতে হবে লেখকের আপন রসবোধই তার নির্দেশ দেবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রসের নিজেরই একটা আব্রু আছে। বর্তমান সাহিত্যে যে একটা বে-আব্রু ভাব দেখা দিয়েছে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যরসের স্বভাবজাত আব্রুর উল্লেখ করেছেন। নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন তিনি তোলেন নি। তাঁর মতে যিনি সত্যিকারের রসিক ব্যক্তি তাঁর মনের একটি আভিজাত্য আছে; সেই আভিজাত্যই ঐ আব্রু রচনা করে। এককালে সকল দেশে কবির স্থান ছিল রাজসভায়, গুণীসভায়—গুণপনার প্রমাণ দিয়ে তবে সমাদর লাভ করতে হত। সস্তা রসিকতা দিয়ে সম্মান লাভ সম্ভব ছিল না। আজকে রাজার স্থান দখল করেছে জনসাধারণ। আপাতদৃষ্টিতে জনসাধারণ নামক জীবটি স্থূল প্রকৃতির বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রসগ্রাহিতায় সে খাটো এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে অনেকে এই ভুলটি করেছেন। অতি সহজে পাঠকের মন পাবার জন্যে খাঁটি রসের পরিবর্তে সস্তা উত্তেজনার পরিবেশন করেছেন। রসের মান রাখেন নি বলে সাহিত্যেরও মান রাখতে পারেন নি। সাহিত্যের যদি মান যায় তবে সাহিত্যিককে মান দেবে কে?



সাহিত্যের সঙ্কট

ঋতু বদল যেমন বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম, রীতি বদল তেমনি মানবসমাজের নিয়ম। মানব সভ্যতার ইতিহাস বলতে গেলে এই রীতি বদলের ইতিহাস। আবার রীতির পরিবর্তন মূলত আর কিছু নয় রুচির পরিবর্তন; সুতরাং সভ্যতার ক্রমবিকাশ বলতে আমরা যা বুঝি তা নামান্তরে রুচির ক্রমবিকাশ। সভ্যতার প্রধান বাহন শিক্ষা। শিক্ষার প্রণালী বহুবিধ কিন্তু উদ্দেশ্য এক—সূক্ষ্ম এবং সুষ্ঠু রুচিবোধের সৃষ্টি। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হালচাল, আচার ব্যবহার, রকমসকম বদলাতে থাকে। এক যুগের মানুষ অন্য যুগের মানুষের তুলনায় অশন আসন বসন ভূষণে তো বটেই, ধ্যান ধারণা ভাষণ চিন্তন বিলাস ব্যসনেও বিভিন্ন। সব চাইতে বড় পরিবর্তন ঘটে সুখ দুঃখ আনন্দের অনুভূতিতে। শিক্ষা মানুষের অনুভূতিকে সূক্ষ্মতর এবং তীক্ষ্ণতর করে। যে জিনিসে এক কালের মানুষ দুঃখ পেত না আজকের মানুষ তাতে দুঃখ পায়, যে জিনিসে আনন্দ পেত না আজকে তাতে আনন্দ পায়।

এই যে রীতি বা রুচির পরিবর্তন এটা হঠাৎ একদিনে ঘটে না। প্রথমে অল্পসংখ্যকের মধ্যে দেখা দেয়, ক্রমে বহুর মধ্যে তা পরিব্যাপ্ত হয়। আমরা যে সভ্যতার 'যুগ' কথাটি ব্যবহার করি তাতেই প্রমাণিত হয় যে, বিশেষ বিশেষ সভ্যতার বিস্তার লাভ করতে এবং স্থায়িত্ব অর্জন করতে এক যুগ কেটে যায়। ইদানীং অবশ্য সভ্যতার গতি অনেক বেশি দ্রুততর হয়েছে। এককালে সময় চলত সৌর জগতের নিয়মে, এখন চলে মানব-সংসারের নিয়মে। সময়কে এখন মানুষের মনের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। সময়ের দৌড় আর বুদ্ধির দৌড় এখন সমার্থক। ইয়ুরোপের পূর্বাঞ্চলে গ্রীস দেশে যে সভ্যতার জন্ম হয়েছিল আড়াই হাজার বছর আগে, রেনেসাঁসের আকারে ইয়ুরোপের পশ্চিমাঞ্চলে পৌঁছতে তার লেগেছিল

দু' হাজার বছর ; আজকের দিন হলে দু' বছরও লাগত না। এখন দু' চার বছরেই যুগ বদলে যায়।

সভ্যতার প্রথম উন্মেষ আর কবি-কল্পিত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ—এ দুটি কতকটা এক জাতীয় ঘটনা। বৃহত্তর মানবসমাজের অগোচরে কোনো বিশেষ স্থানে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে একদা জীবনধারায় বৃহৎ কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়। বন্দী নির্ঝরের মতোই একদিন এই নতুন জীবনধারা আপন গণ্ডি অতিক্রম করে বেরিয়ে আসে এবং বন্যার আকারে অগ্রসর হতে থাকে। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে যা আবদ্ধ ছিল ক্রমে তা বৃহত্তর সমাজে বিস্তার লাভ করে। একের জিনিসে বহুর অধিকার জন্মে, জনকয়েকের সম্পত্তি সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে ওঠে। সভ্যতা যদি স্থান বিশেষে বা গোষ্ঠী বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকত তবে প্রাকৃতিক নিয়মেই সে কঠিন হয়ে পাথরে পরিণত হত। প্রাচীন কালের কোনো কোনো সভ্যতা এই কারণেই ফসিলে পরিণত হয়েছে। কোনো না কোনো কারণে মাঝপথে এর গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, নিম্নভূমিতে এসে পৌঁছতে পারে নি। নদী এবং সভ্যতার এই একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—উভয়েই নিম্নগামী, নিচের দিকে তাদের গতি। এতেই তাদের সার্থকতা। মনে রাখতে হবে, সভ্যতার 'অধোগতি'ই তার সদ্গতি। সমতল ভূমিতে নেমে এসে সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে যখন বাসা বাঁধবে তখনই সে সার্থক হবে। নদী যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়, সভ্যতা তেমনি জনসমুদ্রে বিলীন হবে। এই তার ধর্ম।

কাব্য, সাহিত্য, শিল্প—সভ্যতার সন্ততি। সভ্যতা যে নিয়মের অধীন তার সন্তান সন্ততিও সেই নিয়মের অধীন অর্থাৎ কাব্য সাহিত্য তখনই সার্থক হবে যখন তা সর্বসাধারণের অধিগম্য হবে। কোনো বিশেষ সভ্যতার জন্মকালে সে যেমন স্বল্পসংখ্যকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, কাব্য সাহিত্যও জন্ম মুহূর্তে মুষ্টিমেয়র মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। আদি যুগের কবি তাঁর কাব্য গেয়ে শোনাতেন। অব্যবহিত প্রতিবেশী সমাজেই তা সীমাবদ্ধ থাকত। ছাপার অক্ষর যেমন দূরগামী, কণ্ঠস্বর তেমন দূরগামী ছিল না। ইদানীং বেতার যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ তার কণ্ঠস্বরকে দূরান্তরে নিক্ষেপ করবার উপায়

আবিষ্কার করেছে। কিন্তু কণ্ঠস্বর বেচারী স্বভাবতই কুণ্ঠিত—বায়ুভূত নিরাশ্রয়। কাব্য তো কেবল মুখের কথাটি নয়, ওর স্থায়ী আশ্রয়ের প্রয়োজন। ছাপাখানা সেই আশ্রয়। হাতের লেখা পুঁথিতে আশ্রয় যদি বা মিলত প্রশ্রয় মিলত না। ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হত। ছাপাখানা এসেছে বহু যুগ পরে। তাও আবার ছাপাখানা অক্ষর পরিচয়ের মুখাপেক্ষী। অক্ষর পরিচয়ের রাস্তা বড় সুগম নয়। বহু শতাব্দী লেগেছে মানুষকে অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত করতে। যেদিন অক্ষর পরিচয় হল সেদিন কাব্যের সঙ্গে মানুষের চাক্ষুষ পরিচয় ঘটল। এতকাল যে ছিল কর্ণগোচর সে চক্ষুগোচর হল। কাব্যে সাহিত্যে এই পরিবর্তন রীতিমত বিপ্লবের সূচনা করেছে। সে কথা পরে বলছি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, কাব্যরস কানের ভিতর দিয়ে যত সহজে মরমে পশে চোখের ভিতর দিয়ে তত সহজে নয়। এলিজাবেথীয় যুগের সাধারণ মানুষ কতখানি পণ্ডিত ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয় তথাপি শেক্সপীয়ারের কাব্য তাদের কানে সুধা বর্ষণ করেছে। কানে শুনে যত সহজে মর্মোদ্ধার হয়েছে, বই-এর পাতায় চোখে দেখে তত সহজে হত না। নাট্যমঞ্চের শেক্সপীয়ার আর ভেরিয়োরাম শেক্সপীয়ার এক নয়। একটি রোমাঞ্চকর, অপরটি বিভ্রান্তিকর।

অবশ্য নাটকের বেলায় চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন সম্ভব। কানে শোনা এবং চোখে দেখা (অভিনয় মাধ্যমে) একই সঙ্গে চলতে পারে। নিছক কাব্যের বেলায় দুটি এক সঙ্গে চলে না—হয় কানে শুনতে হবে নয়তো ছাপার অক্ষরে চোখে দেখতে হবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে কাব্য মাত্রই ড্রামেটিক। বাস্তবিক পক্ষে, শুধু কাব্য নয়—ভাব প্রকাশের উপায় হিসেবে ভাষা মাত্রই ড্রামেটিক। যে কালে অতি অল্পসংখ্যক লোক পড়তে জানত, বেশির ভাগ ছিল অক্ষর পরিচয়হীন তখন একজন পড়তেন, দশজন শুনতেন। যিনি পড়তেন তিনিই ভাব প্রকাশের সহায়তা করতেন কখনো অঙ্গভঙ্গির দ্বারা, কখনো স্বরভঙ্গির দ্বারা। ক্রমে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে বহুসংখ্যক লোক যখন পড়তে শিখল তখন কাব্যপাঠের রীতি এবং সেই সঙ্গে কাব্য রচনার রীতিও বদলাতে লাগল। এই পরিবর্তনকেই আমি

বিপ্লবাত্মক বলে উল্লেখ করেছি। ছাপার অক্ষর বোবা, সেই কারণে যেদিন থেকে ছাপাখানার প্রবর্তন হল এবং কাব্যপাঠ সাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করল সেদিন থেকে ভাষা প্রধানত ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে। কাব্যের ভাব যখন রচয়িতার কিংবা সরকারী পাঠকের গলার স্বরে এবং সুরে প্রকাশ পেত তখন ভাষার ইঙ্গিতময়তা বা কারুকার্যের তেমন প্রয়োজন ছিল না। যারা ছিল শ্রোতা তারা নিজেরাই যখন পাঠক হল তখন স্বভাবতই ভাষার স্বভাব গেল বদলে। এতকাল রচয়িতা নিজে কিংবা পঠনক্ষম কোনো পাঠক অভিনয় করে শোনাতেন, এখন অভিনেতা বিহনে ভাষাকেই অভিনয়কৌশল অর্জন করতে হল। লিখিত ভাষাকে এখন একলাই অনেক দিক সামলাতে হচ্ছে। একটি লিখিত পৃষ্ঠার মধ্যে কোথাও স্মিত হাস্য, কোথাও কলকণ্ঠ হাস্য, কোথাও ভ্রূকুঞ্চন, কোথাও আরক্ত চক্ষু, কোথাও সলজ্জ অপাঙ্গ দৃষ্টি। স্বরভঙ্গি এবং চোখের চাহনি—এই দুই-এর কাজ এখন ভাষাকেই করতে হয়। লেখক যত বেশি কুশলী হবেন বোবা আখরের মুখে তত তিনি কথা ফোটাতে পারবেন। আবার ভাষা যে সব সময়েই বাচালতা প্রকাশ করবে এমনও নয়। পাঠকের বুদ্ধির উপরে আস্থা থাকলে অনেক কথা অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিতেই বলা চলে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলবার দরকার করে না। যতখানি উক্ত তার চাইতে বেশি থাকে উহ্য। অনেক কথা সোজাসুজি না বলে বাঁকিয়েও বলা চলে।

ইঙ্গিত বোঝা বুদ্ধিসাপেক্ষ সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই ইঙ্গিত যদি আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তা বুঝতে পারবে। আমাদের আউল-বাউলরা অনেক গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সাধারণ উপমা বা অতিপরিচিত ইঙ্গিতের সাহায্যে। কৃত্তিবাস ওঝার লেখায়ও অনেক কথা উহ্য ছিল, কিন্তু নিরক্ষর শ্রোতার পক্ষেও তা বুঝতে কষ্ট হয় নি। এমন কি একালের কবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—দীপ্ত সূর্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে—তখন কথার ইঙ্গিতটা অশিক্ষিতের কাছেও দুর্বোধ্য বলে মনে হয় না; কারণ প্রখর সূর্য এবং তপ্ত বালি—এই দুই-এর সঙ্গে সকলেরই প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। এর

মধ্যে যে ব্যঙ্গটুকু প্রচ্ছন্ন আছে তাও বুঝতে বিলম্ব হয় না। যে ইঙ্গিত বুদ্ধিগ্রাহ্য সে ইঙ্গিত শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই অল্পবিস্তর বুঝতে পারে, কারণ যাদের আমরা অশিক্ষিত বলি, মনে রাখতে হবে তারা নিরক্ষর হলেও নির্বোধ নয়। তবে কাব্যে সাহিত্যে কিছু কিছু জিনিস আছে যা বুদ্ধিগ্রাহ্য ততখানি নয় যতখানি কল্পনাগ্রাহ্য। বিশেষ করে রোম্যান্টিক কাব্যে কিছু কিছু কথা থাকে যা অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে। কল্পনাপ্রবণ মন না হলে তার ইঙ্গিত বোঝা শক্ত। 'জ্যোছনালোকে দেখিতে পাই বসন কার লুণ্ঠিত'—কথাটা সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য নয়, এমন কি বিশ্বাসযোগ্যও মনে হবে না। কিংবা ইংরেজ কবি যখন বলেন—'And I have felt a presence' অথবা—

'of some world far from ours,

Where music and moonlight and feeling are one.'—

কল্পনাবিহীন মানুষের কাছে এসব উক্তি ভূতুড়ে কাণ্ড বলে মনে হবে। প্রত্যক্ষের মধ্যে অপ্রত্যক্ষকে কল্পনা করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়।

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কবি এবং সাহিত্যিকরা মানুষের বুদ্ধি এবং কল্পনাশক্তির উপরে ক্রমেই অধিকতর দাবি জানিয়ে আসছেন। একেবারে সোজাসুজি কথা না বলে কখনো রূপকের সাহায্যে কথা বলছেন, কখনো প্রতীকের। ব্যাপারটা অস্বাভাবিকও নয় অযৌক্তিকও নয়। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভাষা কারো একলার জিনিস নয়। ভাব বিনিময়ের উপায় হিসেবে ভাষা সমাজবদ্ধ মানুষের মিলিত সম্পত্তি। এক তরফা ভাব প্রকাশই ভাষার একমাত্র কর্তব্য নয়। যাকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে তার কাছে যদি বোধগম্য না হয় তবে সেই ভাষার কর্তব্যকর্মে ত্রুটি থেকে যায়। সোজাসুজি না বলে ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে বলার রীতি পূর্বেও ছিল। কিন্তু সেই ঘোরানো বাঁকানো ভাষাও ছিল সামাজিক ভাষা অর্থাৎ সমগ্র সমাজ সেই ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিল। দীর্ঘ পরিচয়ে প্রতীকের অর্থ সাধারণ মানুষের কাছেও সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিত। খ্রীষ্টান সমাজে—the way of the cross কথাটির মর্ম কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। খ্রীষ্টান মাত্রই জানেন যে 'ক্রস' কথাটির মধ্যে খ্রীষ্ট জীবনের সমগ্র আদর্শ পরিস্ফুট।

ইদানীংকালের কবিদের মধ্যে ডাবলিউ. বি. ইয়েটস্‌ প্রতীকের ব্যবহার করেছেন সর্বাধিক। তাঁর ব্যবহৃত প্রতীক—গোলাপ, রাজহংস, সৌধ, ঘোরানো সিঁড়ি ইত্যাদি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান, সামাজিক অভিধানে তার স্থান নেই। সর্বসাধারণের কাছে এ সবের অর্থ সুস্পষ্ট নয়। পাঠকসমাজই কবির constituency ; constituency-কে উপেক্ষা করলে রাজনৈতিক নেতার যে দশা হয় কবিরও সেই দশা হতে বাধ্য। ইয়েটস্‌-এর পাঠকসংখ্যা কমছে বই বাড়ছে না। তাঁর শেষ বয়সের কাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কজন লোক পড়ে ?

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কবির কি নিজস্ব ভাষা সৃষ্টির অধিকার নেই ? তিনি যে ভাষা ব্যবহার করবেন আশা করা যাবে পাঠকসমাজ ক্রমে সেই ভাষাতে অভ্যস্ত হবে। ভাল কথা, কিন্তু ভেবে দেখতে হবে বাস্তবিক পক্ষে তা হয় কিনা। ইংরেজ কবি ডান্‌ চার শ' বছর আগের কবি। রীতিমত শক্তিমান কবি। বেন্‌ জনসন বলেছিলেন, কোনো কোনো দিক থেকে ডান্‌ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তিনি যে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন শুধু সেই কারণেই লোকে তাঁকে ভুলে যাবে। সত্যি সত্যি ভুলেই গিয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে কবি টি. এস. এলিয়ট এবং সমালোচক এফ. আর. লিভিস্‌ প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। ফলে ইদানীং আবার তার নাম শোনা যাচ্ছে, কিন্তু তাই বলে তাঁর দ্বিজত্বপ্রাপ্তি ঘটে নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছেন মাত্র। এটি যথেষ্ট নয়। কোনো কবিকে জীবিত রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম নয়। বিশ্ব-জোড়া যে রসিক সমাজ একমাত্র সে-ই কবিকে দীর্ঘজীবন দান করতে পারে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সাধারণ পাঠক যেমন ডান্‌কে বুঝতে পারে নি, আজকে বিংশ শতাব্দীর সাধারণ পাঠকও তাঁকে বুঝতে পারছে না। যিনি কবি তিনি সমাজের মুখপাত্র, সমাজের কেন্দ্রস্থলে তাঁর স্থান। সমাজের ভাষা ত্যাগ করে তিনি যখন নিজস্ব ভাষায় কথা বলেন, তখন তিনি কেন্দ্রস্থল ত্যাগ করে নিজেকে সমাজের পুরোভাগে স্থাপন করেন ; সমাজকে পেছনে রেখে আগে ভাগে চলতে চান। এটি বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সমাজের পেছনে

পড়ে থাকা যেমন দোষাবহ, সমাজকে পেছনে ফেলে আগে আগে চলাও তেমনি দোষাবহ।

বাস্তবিক পক্ষে কবির নিজস্ব কোনো ভাষা নেই। দশের ভাষাকেই তিনি কবিত্বমণ্ডিত করে নেন, প্রসাদগুণে গুণান্বিত করেন। এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডের যে প্রচলিত ভাষা তার সবচাইতে শ্রীমণ্ডিত রূপ শেক্সপীয়ারের কাব্যে। তেমনি এ যুগের বাঙলা ভাষার সবচাইতে প্রসন্ন মূর্তি রবীন্দ্র কাব্যে। একেক যুগের একেক রকম ভাষা। চসারের ভাষা এক, শেক্সপীয়ারের ভাষা আর। কৃত্তিবাসের ভাষা আর রবীন্দ্রনাথের ভাষা এক নয়। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের প্রচলিত ভাষাকে কাব্যের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ভাষা সমাজের সৃষ্টি। সমাজ যেমন বদলাবে ভাষাও তেমনি বদলাবে। সামাজিক জীবন জটিল হয়েছে, ভাষাও জটিল হবে। সাদা কথার পরিবর্তে নানা রকম ইঙ্গিতের ব্যবহার চালু হবে। সমাজ তার আপন তাগিদেই ভাষাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবে। রূপক বলুন, প্রতীক বলুন সব কিছুর মধ্যে সমাজের রূপই প্রতিফলিত। কিন্তু ইয়েটস যে সব প্রতীক ব্যবহার করেছেন তা আপন রুচিসম্মত হলেও সমাজসম্মত নয়। শুধু ইয়েটস কেন, দেশী বিদেশী অনেক কবি সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। কৌতুকের বিষয় এই যে, আধুনিক কবিরা যত বেশি সমাজ-সচেতন বলে গর্ব করছেন তাঁদের ভাষা তত বেশি অসামাজিক হয়ে উঠছে। ফলে সমাজও কবি এবং কাব্যের প্রতি বিমুখ হয়েছে। বলছে, তোমার ভাষা তো আমার মাতৃভাষা নয়, অপরিচিত ভাষা—বলা যেতে পারে foreign tongue. আধুনিক কাব্যের মস্ত বড় একটা অংশ এই অপরিচিত ভাষায় লেখা। ইংরেজ কবির কথা—Poets are 'men speaking to men'—এই সহজ কথাটি আজকের কবিরা ভুলে গিয়েছেন।

ইঙ্গিত যতক্ষণ বুদ্ধিগ্রাহ্য থাকে ততক্ষণ ব্যাপারটা খানিকটা তবু আয়ত্তের মধ্যে থাকে কারণ বুদ্ধি শিক্ষিতেরও যেমন আছে, অশিক্ষিতেরও তেমনি আছে। কিন্তু ইঙ্গিত যখন প্রধানত বিত্তাগ্রাহ্য হয়ে ওঠে তখনই মুশকিল

দেখা দেয়। আধুনিক কাব্যে এই সমস্যাটি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। কবি হঠাৎ মাঝখানে একটা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে দেন; কখনো শেক্সপীয়ার, স্পেন্সার, দান্তে, বাইবেল, উপনিষদের দিব্যি মানেন। অর্থাৎ যথেষ্ট বিদ্যা অধিগত থাকলে তবেই সে কাব্যের পূর্ণ রস গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এর ফলে সাধারণ পাঠক সেই কাব্যমহলে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। রীতিমত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এর রসোদ্ধারে অসমর্থ। এলিয়টের Waste Land মাত্র ৪৩৩ লাইনের কাব্য। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ফরাসী জার্মান লাতিন সংস্কৃত ইত্যাদি যাবতীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। আমাদের বহু ভাগ্য যে, ইংরেজীও কিঞ্চিৎ ব্যবহার করেছেন। বহু পাণ্ডিত্যসহকারে, বহু তত্ত্ব ঘেঁটে, বহু কবির উক্তি উদ্ধার করে যে কথাটা বলতে চেয়েছেন সেটা খুব যে একটা ভয়ঙ্কর তত্ত্ব এমন নয়, নতুনও কিছু নয়। আমাদের এই বন্ধ্যা সভ্যতার বর্ণনা– এক অভিশপ্ত সমাজ—মানুষের আস্থা নেই, আশ্রয় নেই, ধর্ম নেই, বীর্য নেই, দয়া নেই, মায়া নেই, প্রেম নেই। নিজ নিজ যুগ সম্বন্ধে এমন হতাশার উক্তি পূর্বতন কবিরাও অনেকে করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর কবি সাদা মাটা কথায় বলেছিলেন—"Altar, Sword and pen, Fireside, the heroic wealth of hall and bower, Have forfeited their ancient English dower of inward happiness." জীবনের সর্বব্যাপী অধোগতি। এলিয়ট তাঁর রোমাঞ্চকর কাব্যে এর চাইতে খুব বেশি কিছু একটা বলেছেন বলে মনে করি না। তবে হ্যাঁ, কথাটা ভয়ঙ্কর রকম কায়দা করে বলেছেন এবং চিত্রটা অনেক বেশি বিভীষিকাময় করে দেখিয়েছেন। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে কায়দাটা অভিনব হলেই কাব্য অভিনব হয় না। বরং অতিরিক্ত কায়দার ফলে বক্তব্যটা হিং টিং ছট্‌ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকাররা যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও 'ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ' জাতীয়ই বলতে হবে। অথচ এলিয়টের কবিত্বশক্তি কেউ অস্বীকার করবে না। অপূর্ব কাব্যময় উক্তি এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কবিত্বকে ছাড়িয়ে উঠেছে তাঁর পাণ্ডিত্য। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পাণ্ডিত্য সব সময়ে কবিত্বের সহায়কারী

নয়। বিদ্যুৎপ্রবাহে short circuit হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় কাব্য-প্রবাহে পাণ্ডিত্য ঠিক সেই অবস্থার সৃষ্টি করে। অযথা মাঝপথে তাল কেটে যায়। অল্প বিস্তর পাণ্ডিত্য সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য একথা সকলেই স্বীকার করবেন। সে পাণ্ডিত্য বহুদর্শন, বহুশ্রুতি এবং বহু স্বাধ্যায়ের ফল। সে জিনিস মানুষের রক্তে মাংসে মজ্জায় মিশে যায়—মনকে পুষ্পিত করে, রঞ্জিত করে, গুণান্বিত করে। শিল্প সাহিত্য সৃষ্টিতে সেই পাণ্ডিত্যই কাজে লাগে। বাকিটুকু পাণ্ডিত্য নয়, পণ্ডিতি। কাব্যে সাহিত্যে পণ্ডিতির কোনো স্থান নেই, সে জিনিস সর্বপ্রকারে বর্জনীয়।

মানুষ বুদ্ধিমান জীব। বুদ্ধির উপরে দাবি করাটা অন্যায় নয়, একথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু বিদ্যার উপরে দাবি করাটা জবরদস্তি, কারণ অধিকাংশ মানুষ বিদ্বান নয়। তাছাড়া বিদ্যা মানুষের জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশ, তার প্রয়োজন আলঙ্কারিক, কিন্তু বুদ্ধির ব্যবহার দৈনন্দিন। মানুষ বিদ্যা দেখায়, বুদ্ধি ব্যবহার করে। বিদ্যে দেখানো যদি সমাজে হাস্যকর হয় তবে কাব্যে সাহিত্যেও হাস্যকর। কাব্যসাহিত্য সর্বকালেই সমাজ অনুসারী। সমাজে যা অচল সাহিত্যেও তা অচল। এছাড়া আরেকটি কথা অনুধাবন-যোগ্য। সমাজের আদর্শ যেমন—greatest good to the greatest number, কাব্যসাহিত্যেরও আদর্শ হওয়া উচিত—greatest accessibility to the greatest number, সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং আনন্দদানই সাহিত্যের প্রধানতম কর্তব্য। যত বেশি মানুষের মধ্যে বিকীর্ণ হবে, যত বেশি মানুষকে আনন্দ দেবে তত বেশি তার সার্থকতা। আধুনিক কাব্য এই আদর্শ গ্রহণ করে নি। পাণ্ডিত্যের উপরে ভর করে অবধি বহুসংখ্যক মানুষকে সে কাব্যসংসারে অস্পৃশ্য করে রেখেছে। এটিই আধুনিক কাব্যের সমস্যা।

কবিমাত্রই রসের কারবারী। যে জিনিস নিয়ে কারবার সে জিনিসের স্বভাবধর্ম ভেবে দেখা প্রয়োজন। রস জিনিসটার মধ্যে একটা টলটলে ভাব আছে। দুঃখের বিষয় ইংরেজীতে 'রস' কথাটির প্রতিশব্দ নেই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ যে, তাঁরা 'রস' কথাটির মধ্যেই

ঐ টলটলে ভাবটি রক্ষা করেছেন। পদ্মপত্রে জলের মত সে অস্থির সদা চঞ্চল। সে যে একেবারেই একটা অদৃশ্য, অপার্থিব, সৃষ্টিছাড়া জিনিস এমন মনে করবারও কোনো কারণ নেই। বাতাস যেমন অদৃশ্য থেকেও গায়ে ছুঁয়ে তার অস্তিত্বের জানান দিয়ে যায় রসও তেমনি মনকে স্পষ্টত স্পর্শ করে, রসসিক্ত করে। রস বলতে বুঝি জীবনের রস। জীবন থেকে উদ্ভূত বলেই সে যে কোনো জীবের ন্যায় জীবন্ত। সে যে জীবন্ত তার প্রমাণ—যুগের পরিবর্তনে তার ব্যঞ্জনার পরিবর্তন হয়। শেক্সপীয়ারের যুগে তাঁর কোনো কথাকে যে অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে আজকে তাকে অন্য অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব। কারণ, কাব্যের প্রাণস্বরূপ যে উচ্ছল টলটলে ভাবটি সেটি তার মধ্যে বর্তমান। প্রকৃত কাব্য সাময়িকতার উর্ধ্বে কারণ প্রাণের উচ্ছলতা তাকে সচলতা দিয়েছে। শেক্সপীয়ারের কাব্য এলিজাবেথীয় যুগকে আশ্রয় করেই রচিত। কিন্তু এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সে মালা বদল করেছে মাত্র, গাটছড়া বাঁধে নি। আধুনিক কাব্য অতিমাত্রায় সাময়িক স্থান কাল পাত্রের দ্বারা তার ব্যঞ্জনাকে সে সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করেছে। অস্থির টলটলে ভাবটি আর নেই। অনেক সদুক্তি আছে, অত্যুক্তি এতটুকু নেই। এত বেশি প্রাজ্ঞ এবং স্থিরমতি যে অতি সহজে প্রস্তরীভূত হবার আশঙ্কা আছে। অযথা পাণ্ডিত্য (পণ্ডিতি বলাই ভালো) ওর উচ্ছল টলটলে ভাবটিকে বিনষ্ট করেছে। পরগাছা যেমন মূল গাছের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে, পাণ্ডিত্য তেমনি কাব্যের টুটি চেপে ধরে তাকে শ্বাসরোধ করে মারে।

কাব্যের চলচ্ছক্তি ততদিন যতদিন তা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য। আধুনিক কাব্য নিজেকে বিপন্ন করেছে সাধারণকে বাদ দিয়ে। নিতান্ত বুদ্ধিবিভ্রম হয়েছে বলেই সে এমন মানুষকে ভর করেছে যে আদৌ নির্ভর-যোগ্য নয়। একালের কাব্য পড়লেই মনে হবে এ সব প্রাকৃতজনের জন্যে লেখা নয়। লেখা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ডিগ্রীপ্রার্থী ছাত্রদের জন্যে। পরীক্ষা পাশ করা এবং পাশ করানোর তাগিদ না থাকলে যাবতীয় রেফারেন্স বই ঘেঁটে, এনসাইক্লোপিডিয়া তোলপাড় করে এই কাব্যমৃত পান করবার আগ্রহ ছাত্র মাস্টার কারোই থাকত না। আমার পাঠকরা

ইতিহাসের নজির মানেন কিনা জানি না। যাঁরা মানেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এ বিষয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য বড়ই মর্মান্তিক। কোনো কালে কোনো দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কাব্যসাহিত্যের আবাসভূমি বলে পরিচিত হয় নি। কাব্যসাহিত্য সেখানে পরবাসী। বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাচর্চার স্থান। কাব্যসাহিত্য, শিল্প—সৃজনধর্মী কোনো জিনিসের চর্চা সেখানে হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃজনমুখী বিদ্যাচর্চার অনুকূল ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন। একটি সুবৃহৎ সৃষ্টিশীল মন এর প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত ছিল বলেই সৃজনমুখী কিছু কিছু কাজের সূচনা সেখানে হয়েছিল। এছাড়া 'বিদ্যা'কে তিনি অনেক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র সৃজনধর্মী বিদ্যাচর্চার মধ্যেই মনের মুক্তি সম্ভব। (বলা বাহুল্য একদিকে U. G. C. অপর দিকে আমরা মাষ্টাররা মিলে ইতিমধ্যেই তাঁর বিদ্যালয়ের যথারীতি সংস্কার সাধন করে নিয়েছি)। যাক্, যে কথা বলছিলাম—বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কাব্য-সাহিত্য চর্চার পক্ষে অনুকূল ক্ষেত্র নয়। এমন যে বিশাল ইংরেজী সাহিত্য—ভাবলে অবাক লাগে—এ. ই. হাউসম্যান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অধ্যাপকের নাম সেখানে নেই এবং তাঁরও সাহিত্যকীর্তি যৎসামান্য। ম্যাথু আর্নল্ড যখন সাহিত্যের (পোয়েট্রির) অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাঁর কবি-জীবন সমাপ্তপ্রায়। অবশ্য অধ্যাপক-জীবন স্বল্পকালের হলেও তিনি কায়মনো-বাক্যে আজীবন ইস্কুলমাস্টার ছিলেন। রসজ্ঞ পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন, এর ফলে তাঁর কাব্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৌতুকের বিষয় এই যে, তিনি কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে যে-সব রীতি এবং নীতির প্রচার করেছেন, আপন অজ্ঞাতসারে যখন তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, কেবলমাত্র তখনই তাঁর কাব্য রসোত্তীর্ণ হয়েছে। দেশে-বিদেশে বহু সাহিত্যযশলিপ্সু অধ্যাপকের বেলায় দেখা গিয়েছে—অধ্যাপনায় যত বেশি হাত পেকেছে সাহিত্যের হাত তত বেশি কাঁচা হয়েছে। অনেক সময় মনে হয়েছে, অধ্যাপকজাতীয় মানুষের উপর বোধ করি দেবযানীর অভিশাপ আছে—

'তুমি শুধু তার ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ; শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।' এর কারণ অধ্যাপকের মন এবং সাহিত্যিকের মন বিপরীতমুখী। অধ্যাপকের মন স্থিতিশীল, সাহিত্যিকের মন সৃষ্টিশীল। সাহিত্যের অর্থোদ্ধার করতেই অধ্যাপকের সারাজীবন কেটে যায়, রসোদ্ধারের অবকাশ কোথায়? বাস্তবিকপক্ষে সাহিত্য সম্পর্কে যত উদ্ভট কথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শোনা যায়, এমন আর কোথাও নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা বানান সংস্কার করেছেন, কিন্তু বাঙলা ভাষা কিংবা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেছেন, এমন কথা কেউ বলবে না। সে কাজ করতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাহিত্যিকদের। অবশ্য এ কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা নয়। পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই এবিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবাসীরা বানান এবং ব্যাকরণ নিয়েই ব্যস্ত। এই কারণে কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে এঁদের মতামত অনেক সময়েই নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ রসবস্তু এঁরা গিলে খান, রসজ্ঞ ব্যক্তিরা চেখে খান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতিটাই গিলে খাওয়ার পদ্ধতি। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যেমন জাতলিখিয়ের সৃষ্টি হয় নি, তেমনি জাত পাঠকেরও সৃষ্টি হয় নি। এ কথা স্বীকার্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় সৎসাহিত্যের সঙ্গে ছাত্রকে পরিচিত করে দেন, কিন্তু সে পরিচয় খুব কম ক্ষেত্রেই অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। কারণ পরীক্ষা পাশের তাড়ায় অনেক জিনিস তাকে নির্বিচারে গিলতে হয়, রস বা সৌন্দর্যের প্রতি নজর দেবার অবসর থাকে না। দেখা গিয়েছে, এই রসলেশহীন সাহিত্যের পাঠ শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না। এইজন্য সাহিত্যকে বাধ্য হয়ে আশ্রয় খুঁজতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যে রসজ্ঞ পাঠকসমাজ (বলা বাহুল্য এঁরা সাহিত্যের ডিগ্রীধারী ছাত্র নয়), তাঁরাই সাহিত্যের প্রধান ধারক এবং বাহক। শেক্সপীয়ারের যুগে তথাকথিত বিদ্বান বুদ্ধিমান সম্প্রদায়, এমন কি, এক বেন জনসন ছাড়া University wits নামে পরিচিত তৎকালীন শিক্ষিত সাহিত্যিক সমাজও তাঁকে বড় একটা পাত্তা দেন নি। পাত্তা দিয়েছিল পিট্-এ দণ্ডায়মান অশিক্ষিত,

অর্ধশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী। আজকেও শেক্সপীয়ার যে বেঁচে আছেন, তা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের দৌলতে নয়। তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন-এর শেক্সপীয়ার থিয়েটার, রেখেছে লণ্ডনের ওল্ড ভিক্। সেখানে দেশ-বিদেশের সাধারণ মানুষেরই ভিড়। এঁরাই প্রকৃত সমজদার। বলা বাহুল্য, আর সব যুগের মত এ-যুগেও কবি আছেন, 'কাব্য পাঠের রুচি'ও আছে, নেই শুধু বররুচি, যিনি বলতেন, রসের পরিবেশন রসিকজনের কাছেই কোরো অরসিকের কাছে নয়।

পূর্বেই বলেছি, আধুনিক সাহিত্যের গতি বিপরীতমুখী। জলধারার ন্যায় নিম্নগামী না হয়ে সে হয়েছে উর্ধ্বগামী। সাধারণের সমতলভূমি ছেড়ে চড়াই-উতরাই বেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুকনো ডাঙার দিকে সে ধাওয়া করেছে। এটি নিশ্চিত মৃত্যুর পথ। বহু শতাব্দীর ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করেছে যে, সাহিত্য-সৃষ্টিতে এবং সাহিত্য-বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কোনোকালেই বিশেষ গৌরবের নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কোনো কোনো মহলে সাহিত্যের গোরস্থান আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটা আমি খুব অমূলক বলে মনে করি না। মহাজন যে পথে যাবে সেটাই পথ। মহাজন বলতে আমি বুঝি বহুজন। বহুমানুষের পথই সভ্যতা এবং সাহিত্যের পথ। মুষ্টিমেয়কে আশ্রয় করলে তার মুষ্ঠ্যাঘাতেই—ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদির—আঘাতেই সাহিত্যকে মরতে হবে। এই সূত্রে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মহাদেবের জটায় যখন আবদ্ধ ছিলেন গঙ্গা, তখন পুণ্যসলিলা ছিলেন না, যেদিন ভূতলে অবতীর্ণ হলেন, সেদিনই তিনি সার্থক হলেন। জাহ্নবীর ন্যায় কাব্যসাহিত্যও জনসমাজে পুণ্য পীযূষ স্তন্যবাহিনী। যত বেশি মানুষকে স্তন্যদান করবে, তত বেশি তার সার্থকতা।



পুরাণের কাহিনী
ও
জীবনের কাহিনী

আদি যুগের মানুষে এবং এ যুগের মানুষে প্রধান তফাত এই যে, সেকালে মানুষের চোখ থাকত বাইরের দিকে, একালে মানুষের চোখ ভেতরের দিকে। দৃষ্টি ভেতরের দিকে, তার মানে এই নয় যে, তার অন্তর্দৃষ্টি বেশি। আসলে এ যুগের মানুষ নিজের সম্বন্ধে অতি বেশি সজ্ঞান। এখানে নিজ বলতে অবশ্য সে একলা নিজে নয়, তার একান্ত আপন জন—স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়েই সে ব্যতিব্যস্ত। চিন্তা ভাবনা অব্যবহিত চতুষ্পার্শ্ব, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে আবদ্ধ। সেই আদিকালে যখন পরিবার বা গোষ্ঠী সম্পর্ক দানা বাঁধে নি, সুসম্বদ্ধ সমাজ গড়ে ওঠে নি তখন মানুষ ছিল অপেক্ষাকৃত নিঃসঙ্গ। একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক অত্যন্ত ঢিলে ঢালা রকমের ছিল অর্থাৎ সম্পর্কটা মানুষের সঙ্গে যতখানি ছিল তার চাইতে ঢের বেশি ছিল প্রকৃতির সঙ্গে। এরও বিশেষ কারণ ছিল। নিঃসঙ্গ মানুষ নিজেকে নিঃসহায় মনে করে। কাজেই আত্মরক্ষার instinct সারাক্ষণ মনের মধ্যে কাজ করেছে। আহার সংস্থানের জন্যে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হত। রোদ বৃষ্টি, ঝড় জল, বাঘ ভালুক, সাপ খোপের কথাই ভাবতে হত বেশি। কাজেই মানুষের সঙ্গে যতখানি না পরিচয় হয়েছে তার চাইতে ঢের বেশি হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে। তার প্রথম আত্মীয় সম্পর্ক চন্দ্র সূর্য বায়ু বরুণের সঙ্গে। প্রথম থেকে এদেরই মন মেজাজ বুঝে তাকে চলতে হয়েছে, কাজেই এদের কথাই ভেবেছে বেশি। অথচ এরা এমন জন নয় যে, দুদণ্ড বসে এদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে, জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের খোঁজ খবর সব জেনে নেয়। অথচ এদের দ্বারাই তার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কাজেই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এদের কথা তাকে সারাক্ষণ ভাবতে হয়েছে। ভেবে ভেবে এদের নাম ঠিকানা, ঘর গেরস্থালি, স্বভাব চরিত্তির, মর্জি মতলব সম্বন্ধে সে মনগড়া

কাহিনী তৈরি করেছে। নিজের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার জন্যেই খুব মন দিয়ে এদের ভাবভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে। কাজেই এদের সম্বন্ধে সে যেসব কাহিনীর সৃষ্টি করেছে সেটা তার মনগড়া হলেও তাকে নিছক মিথ্যা কল্পনা বলা চলে না, তার মধ্যে সত্যও অনেকখানি ধরা পড়েছে। Observation এবং imagination-এর মিশ্রণে এক অতি চিত্তাকর্ষক জিনিসের সৃষ্টি হয়েছে।

ঐসব নৈসর্গিক শক্তিতে সে অনেক সময় মানবিক দোষগুণ আরোপ করেছে। মানুষ যেমন স্নেহ প্রেম, হিংসা বিদ্বেষ, শত্রুতা মিত্রতার বশবর্তী, এদেরও সেই ভাবেই কল্পনা করেছে। এইভাবেই মিথলজি গড়ে উঠেছে। মানুষের নিজের সমাজ সংসার যেমন গড়ে উঠেছে তেমনি এই আরেক নতুন সংসারও সে গড়ে তুলেছে। এদের মর্জির উপরে নিজের ভাল মন্দ অনেকখানি নির্ভর করে বলে এদেরকে সব সময়েই সে ভয় এবং সম্ভ্রমের চোখে দেখেছে। এদের দোর্দণ্ড প্রতাপে সে অভিভূত। আপন শক্তিতে এদের ক্ষমতাকে রোধ করবার কথা সে তখনও ভাবতেই পারে নি। কাজেই পূজো নৈবেদ্য দিয়ে তাদের তোয়াজ করবার চেষ্টা করেছে। তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি এইভাবেই হয়েছে। প্রকৃতির যে রহস্য মানুষের বুদ্ধির অগোচর থেকেছে তাতেই সে দেবত্ব আরোপ করেছে। প্রকৃত পক্ষে রহস্যের অপর নাম দেবতা, সেই কারণেই দেবতা আমাদের কাছে রহস্যময়। প্রকৃতির বহু রহস্যেরই সমাধান সেদিনের মানুষ করতে পারে নি, কিন্তু তাই বলে myth-এর সবটুকুই মিথ্যা নয়। প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক সব সময়ে সে বুঝে উঠতে পারে নি কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তিগুলির স্বভাবচরিত্র সে মোটামুটি বুঝে নিয়েছিল। সেটাকে বিজ্ঞানের সূত্রে বাঁধতে পারে নি, বিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রকাশ করতে পারে নি। প্রকাশ করেছে কতকটা রূপকের ভাষায়। সেজন্যে পুরাণ কথা খানিকটা রূপ কথার আকার নিয়েছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পশ্চিম দেশীয় পুরাণ কথায় আর আমাদের পুরাণ কথায় অনেক জায়গায় মিল আছে। তার কারণ আদি যুগের সব মানুষ

সব দেশে প্রকৃতিকে অনেকটা একই ভাবে দেখেছে। সব দেশেরই মিথলজি অর্ধেক সত্য, অর্ধেক কল্পনার সৃষ্টি। কল্পনাই মুখ্য, তবে সত্য কখনো কল্পনাকে একেবারে ফাঁকি দিতে পারে না, কিছু তার কল্পনার জালে ধরা পড়বেই। এদিক থেকে দেখতে গেলে স্বভাবতই মনে হবে যে, মিথলজি রচনায় এবং কাব্য রচনায় খানিকটা সাদৃশ্য আছে। পুরোপুরি মিল অবশ্যই নেই। কাব্য-রচয়িতারা কল্পনার চোখ দিয়ে সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। পুরাণ রচয়িতা চর্মচক্ষে যে সত্যকে আংশিকভাবে দেখেছেন তার অবোধ্য বা দুর্বোধ্য অংশকে কল্পনার দ্বারা ভরাট করবার চেষ্টা করেছেন। জিজ্ঞাসার পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মিথলজিস্ট মাত্রই কবিপ্রকৃতির মানুষ। কবিকল্পনা ছাড়া myth-এর সৃষ্টি সম্ভব নয়। আবার কবিমাত্রই myth-বিলাসী। সকল কবিই অল্পবিস্তর myth-এর সৃষ্টি করেন। আদি যুগের কবিরা তো করেছেনই, এ যুগের কবিরাও করছেন। তবে সে অন্য ধরনের। আধুনিক কবিরা যেখানে কোনো Type চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন ক্রমে তাই mythological personage-এর স্থান গ্রহণ করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এলিয়টকৃত Prufrock চরিত্রের নাম করা যেতে পারে। এ যুগের নির্মোহ, নিস্পৃহ, বিভ্রান্ত, বিষণ্ণ মানুষের সে প্রতীক। প্রাচীনেরা প্রকৃতির মধ্যে জীবনের প্রতীক খুঁজতেন, আধুনিকেরা চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের মধ্যেই জীবন যৌবনের প্রতীক খুঁজছেন।

খাঁটি পুরাণ বলে যা পরিচিত তা Pagan সমাজের সৃষ্টি। বহু দেবতায় বিশ্বাসী সমাজেই myth-এর সৃষ্টি স্বাভাবিক। আজকের বেশির ভাগ মানুষই বহু দেবতায় বিশ্বাস করে না, এমন কি অনেকে একমেবাদ্বিতীয়ম্-কেও বিশ্বাস করে না। যারা করে তারা pantheism-এ বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, একই দেবতা বা সর্বব্যাপী কোনো শক্তি সর্বঘটে বিরাজমান। আগেকার মানুষ প্রতি ঘটে পৃথক পৃথক দেবত্ব আরোপ করত। myth-এর সৃষ্টি ঐ থেকেই হয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মের উদ্ভব প্যাগান সমাজের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে। অপর পক্ষে Paganism এবং mythology-তে এমন নিকট সম্পর্ক যে, একের মৃত্যু অপরের মৃত্যু ঘটাতে বাধ্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থ দুঃখ করে বলেছিলেন,

এ যুগের সুসভ্য মানুষ না হয়ে যদি আদিম যুগের 'অসভ্য' প্যাগান হতাম তা হলে—

So might I..
Have glimpses that would make me less forlorn;
Have sight of Protens rising from the sea;
Or hear old Triton blow his wreathed horn.

তবে এ কথাও সত্য যে myth-এর প্রতি মানুষের এমন সহজাত আকর্ষণ, যে ধর্মের মৃত্যু যত সহজে ঘটে myth-এর মৃত্যু তত সহজে হয় না। Pagan সমাজের উচ্ছেদ হয়ে যখন খ্রীষ্টান ধর্মের উদ্ভব হল তখন myth-এর উচ্ছেদ হয় নি। খ্রীষ্টান ধর্মের আদি গ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেণ্টে বিশ্ব-সৃষ্টি এবং মানবমানবীর জন্ম কাহিনী যেভাবে বিবৃত হয়েছে তাকে myth ছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব নয়। Old Testament একাধারে ইহুদী জাতির ইতিহাস এবং খ্রীষ্টীয় mythology। সকল দেশেই জাতির আদি ইতিহাস এবং তার পুরাণ কাহিনী মিলে মিশে একাঙ্গীভূত হয়ে আছে। খ্রীষ্ট পরবর্তী গ্রেল কাহিনীও খ্রীষ্টান মিথলজির অন্তর্গত। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে বহুদেবতায় বিশ্বাস্ নেই সেখানেও মিথলজির প্রভাব প্রতিপত্তি কিছু কম নয়। পুরাণে বিশ্বাস অনেকটা মানুষের সংস্কারগত ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে এর খুব একটা যোগ নেই।

Mythology-র সব চাইতে বড় শত্রু বিজ্ঞান। পুরাণের আশ্রয় হল বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের ভিত্তি হল যুক্তি। যুক্তি ছাড়া কোনো জিনিসকে সে গ্রহণ করে না। পৃথিবীর বয়স বিবেচনায় বিজ্ঞান ওল্ড টেস্টামেণ্টের সাক্ষ্য কিংবা ভারতীয় পুরাণের সাক্ষ্য মানবে না, Geology-র মতকেই স্বীকার করে নেবে, মানুষের বয়সের বেলায় Anthropology-র। ভূতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব পুরাণ-বর্ণিত সৃষ্টি কাহিনীকে নাকচ করে দিয়েছে। শুধু সৃষ্টি কাহিনী নয় বিজ্ঞানের পরীক্ষায় সমগ্র মিথলজিই বরবাদ হয়ে যাবে। এই সূত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে তার যেমন শত্রুতা সাহিত্যের সঙ্গে তেমনি তার মিত্রতা। বিজ্ঞানের স্বভাব বড় একরোখা, সে যা সত্য বলে জেনেছে তার থেকে

তিলমাত্র নড়চড় হবার জো নেই। সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি ঢের বেশি উদার। রসসৃষ্টির ব্যাপারে তার কোনো রকম শুচিবাই নেই, তার কাছে truth-এর যতখানি মর্যাদা myth-এর ততখানি। বিজ্ঞানের সত্য বড় ক্ষীণপ্রাণ, একটু এদিক ওদিক হলেই বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত, একটুতেই সে সত্যভ্রষ্ট হয়। সাহিত্যের সত্য আইনের বিচারে হেরে গেলেও রসের বিচারে জয় লাভ করে। বিজ্ঞানের রসজ্ঞানটা কম, সেজন্যেই ওর কথায় কোনো ফাঁক থাকে না, ফাঁকিও থাকে না ; একেবারে নিখাদ, নিরেট। সাহিত্য অত মাপজোক করে, হিসেব করে কথা বলে না। বিজ্ঞানের স্বভাবটাই কাটখোট্টা, সেজন্যে ওর কথাবার্তায় ছিরি নেই। সাহিত্য যাকে বলে হৃদয়, ও তাকে বলে হৃৎপিণ্ড। সাহিত্য বলে—তোমার হৃদয় আমার হোক আমার হৃদয় তোমার। কথাটা বাস্তব জীবনে অনেক সময় myth-এ পরিণত হয়। তথাপি শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আর বিজ্ঞান যখন heart transplant -এর কথা বলে তখন প্রাণ আঁৎকে ওঠে। সে বলে, একের হৃৎপিণ্ড অপরের বুকে বসুক।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে মিথলজির প্রভাব কমে গিয়েছে, এ কথা সত্য। কিন্তু বড় দরের বিজ্ঞানীরা মিথলজিকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে নি। এ যুগের মনোবিজ্ঞানীরা ঈডিপাস্ কাহিনীকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। ডিডেনাস এবং আই-কেরাস্-এর কাহিনী কিংবা কুবেরের পুষ্পক রথ যে নিতান্ত উদ্ভট কল্পনা নয়, এ যুগের আকাশযান তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বহু দূর ভবিষ্যতে যা মানুষের সাধ্যায়ত্ত হবে, দূর অতীত কালে মানুষ তাকে কল্পনার চোখে দেখেছে। বহু দর্শনের ফলে myth-এর জন্ম সেজন্যে সে দূরদর্শীও বটে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে পুরাণের সম্পর্ক একটু শিথিল হয়ে এলেও সাহিত্যের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বে আজও ফাটল ধরে নি। আগেই বলেছি যে, পুরাণ রচয়িতা মাত্রই কবিসুলভ কল্পনাশক্তির অধিকারী অর্থাৎ পুরাণ রচয়িতারাও কবি সাহিত্যিকের গোষ্ঠীভুক্ত। সাহিত্যের একটা মস্ত বড় অংশ পুরাণ কাহিনী। একদিকে যেমন অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত, অপরদিকে তেমনি অষ্টাদশ মহা-

পুরাণ। বলতে গেলে সাহিত্যের জন্মই হয়েছে myth-কে আশ্রয় করে। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হলে সাহিত্যের মূলচ্ছেদ হয়ে যাবে। সাহিত্য সে কথা ভাবতেই পারে না। সকল দেশেই পুরাণাশ্রিত কাহিনী সাহিত্যের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী। এমন কি হাল আমলের সাহিত্যেও পুরাণ কাহিনীর উল্লেখ পদে পদে। এর কারণ পাঠকমাত্রই এ সব কাহিনীর সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। লেখক জানেন যে, এর উল্লেখে বা ইঙ্গিতে তাঁর নিজের রচিত কোন ঘটনা বা situation-এর তাৎপর্য স্পষ্টতর রূপে উদ্ঘাটিত হবে।

সব দেশেই লোক শিক্ষার প্রধান উপাদান ছিল পুরাণ কাহিনী। মুখে মুখে প্রচারিত হত, নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এ সব কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিল। গ্রীক নাটকের স্বর্ণ যুগে যত নাটক লেখা হয়েছে তার সবই গ্রীক পুরাণের কাহিনী। নাটকের ঘটনা এবং পাত্র-পাত্রীদের কাহিনী দর্শকদের অজানা ছিল না। আমাদেরও যাত্রার পালা এবং পরবর্তীকালের অধিকাংশ নাটক পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং তারও কারণ এই যে, দর্শকরা এ সব কাহিনীর সঙ্গে পূর্বাবধি পরিচিত। পুরাণের মস্ত বড় গুণ সে কখনো পুরাতন হয় না। তার মধ্যে এমন কোনো নিত্য সত্যের আভাস আছে যে, আজকের জীবনেও তার relevance সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি। তার প্রমাণ আগামেনন অরিষ্টিস্ প্রভৃতির কাহিনীকে ভিত্তি করে এ যুগের নামী সাহিত্যিকরাও নাটক রচনা করছেন। দেখা যাচ্ছে সে কালে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে আজকের জীবনেও সে সঙ্কট বর্তমান। এমন কি সেই দূর অতীত যুগে যে সঙ্কটের আভাস মাত্র ছিল না, যার স্পষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ করা পুরাণ রচয়িতার পক্ষে সম্ভবই ছিল না, কল্পনার সাহায্যে তারও আভাস তিনি দিয়েছেন। কৃষি-সভ্যতার বিনাশ এবং শিল্প সভ্যতার উদ্ভবে সমাজে যে সঙ্ঘাত অনিবার্য—স্বর্ণলঙ্কা-র অধিপতি রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ তারই কল্পিত চিত্র দেখেছেন। রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঐ সঙ্ঘাতটিকে এ যুগের উপযোগী করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক লেখকেরা পুরাণকে

বর্জন করেন নি। তাঁরা পুরাণকে নতুন ভাবে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তাতে নতুন তাৎপর্য আরোপ করেছেন।

কাব্যে সাহিত্যে myth-এর ব্যবহার আগেও যেমন চলছিল, এখনও তেমনি চলতে থাকবে। তবে এ কথাও ঠিক যে, মানুষের myth সৃষ্টির ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসছে। সে কারণ সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং অপরিচয়ের ব্যবধান myth সৃষ্টির সহায়ক। বিশ্ব জগৎ সম্বন্ধে এবং প্রাকৃতিক phenomena সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যতদিন অসম্পূর্ণ ছিল ততদিনই সে myth সৃষ্টি করেছে। এখন মানুষের জ্ঞান যে পরিমাণে বাড়ছে তার myth-সৃষ্টির ক্ষমতা সেই পরিমাণে কমছে। আমাদের সমস্ত চতুষ্পার্শ্ব আজ অতি পরিচয়ে জীর্ণ, তাকে নিয়ে এখন কল্পনার জাল বোনা মোটেই সহজ নয়। এমন যে লক্ষ যোজন দূরের চন্দ্রগ্রহ তারও গায়ে গিয়ে যদি ঢুঁ মারা যায় তাহলে সেই চাঁদকে নিয়ে কে আর কবিত্ব করবে? যে মানুষ Diana Artemis-এর privacy নষ্ট করছে সে তাদের নিয়ে কোন্ কাহিনী রচনা করবে? আমরা যে সেই আদ্যিকালের চরকা-কাটা চাঁদ-বুড়ীটার কথা শুনে এসেছি সে কি আর সেখানে আছে? মানুষের ভয়েই পালিয়েছে।

অনেকের মনেই এই ধারণা যে, জীবন কাহিনীর (reality) সঙ্গে পুরাণ কাহিনী (myth)-এর একটা বিরোধ আছে। এ কথা যে সত্য নয় তা আমার এই আলোচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে। বিরোধ তো নেই-ই বরং দুটিতে দিব্যি মিলে মিশে বসবাস করছে। খুব মজার কথা এই যে, আমাদের এই ভয়ঙ্কর রকমের বাস্তব যুগেও নানাবিধ myth আমরা সৃষ্টি করেছি অথচ তাদের myth বলে আমরা চিনি না, কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। নিত্য দিনের অতি পরিচয়ে যখন কোনো জিনিসের অনন্যতা, অসাধারণতা নষ্ট হয়ে যায় তখন খুব পরিচিত জিনিসও myth হয়ে ওঠে। কোনো মহৎ ব্যাপারে কার্যত মর্যাদা না দিয়ে যখন শুধু মৌখিক পুজো নিবেদন করি তখন তাও myth-এ পর্যবসিত হয়। দু একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরেকটু স্পষ্ট হবে। ষোড়শ শতাব্দীর রাণী এলিজাবেথ শক্তিতে সাধ্যেতে রাজ-

মহিমায় গরীয়সী ছিলেন। তাঁর তুলনায় আজকের রাণী এলিজাবেথ সর্বপ্রকারে বিগতমহিমা, সিংহাসনের অধিকারিণী মাত্র। কাজেই পূর্ববর্তী এলিজাবেথকেই বলতে হবে real, আজকের এলিজাবেথ myth। মাত্র কুড়ি বৎসর আগেও গান্ধীজী এ দেশের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, ত্রিশ বৎসর কাল আমাদের জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, এ যুগের ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেই মানুষ বিশ বৎসরের মধ্যেই বিস্মৃতপ্রায়; আজকের ভারতবর্ষের জীবনে তিনি নিশ্চিহ্ন। আমাদের আচারে ব্যবহারে, চিন্তায় কর্মে তাঁর প্রভাবের বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। কাজেই যদি বলি আজকের ভারতবর্ষে গান্ধী একটি myth তাহলে খুব মিথ্যা বলা হবে না। সর্বোপরি আমরা যে আজ নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করি সেই স্বাধীনতাও কি একটি myth নয়?



ইতিহাসের পরিহাস

ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্লিও (Clio) স্বভাবত কৌতুকপ্রবণা। মানবজাতির জীবননাট্য পরিবেশনের ভার তাঁর হাতে—খানিকটা নাটকীয়তা তাঁর স্বভাবে থাকবে সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। চমকপ্রদ ঘটনার প্রতি ওঁর স্বাভাবিক ঝোঁক; উনি হাঁক ডাক জাঁক ভালবাসেন। যেখানে সোরগোল সেখানেই ওঁর কৌতুহল। যা নীরবে নিঃশব্দে ঘটে তার দিকে উনি ফিরেও তাকান না। এইজন্যে ইংরেজ মনীষী ক্রোভের সঙ্গে বলেছিলেন, প্রচণ্ড ঝড় এসে যখন বাড়ির ছাত উড়িয়ে নেয়, গাছ ওপড়ায়, ডালপালা ভাঙে, প্রাণনাশ ঘটায় তখন সেটা ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু যে মৃদুমন্দ দক্ষিণ বাতাস ফুলের রেণু নিঃশব্দে ছড়িয়ে দিয়ে যায় এবং নতুন সৃষ্টির বীজ বপন করে তার খোঁজ কেউ রাখে না, ইতিহাসে তার উল্লেখ থাকে না। যে ব্যাপার ঘটা করে ঘটে তার নামই ঘটনা। যে জিনিস ঘটা করে না, হৈ চৈ করে না সে ইতিহাসের ছাঁকনির ফাঁকে গলে যায়, ধর্তব্য বলেই গণ্য হয় না। অর্থাৎ যথেষ্ট সোরগোল করে না ঘটলে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ জিনিসও হিসেবের খাতায় বাদ পড়ে যায়।

ইতিহাসের স্বভাবে এমন আরো অনেক বৈপরীত্য আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে দেশ যত বেশি উন্নত সে দেশের ইতিহাস তত বেশি নিস্তরঙ্গ, সে দেশে চমকপ্রদ এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনা খুব একটা ঘটে না। এর কারণ শক্তিতে সামর্থ্যে শিক্ষায় সম্পদে যে দেশ অগ্রসর সে দেশে একটা স্থিতি-স্থাপকতা এসে যায়; সেখানে জীবনযাত্রা সচ্ছন্দ এবং নির্বিঘ্ন। তারা পারৎপক্ষে কোনো পরিবর্তন চায় না। এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডে বাণিজ্য বিস্তার এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপে যে জীবনচাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল গত চারশ' বছরের মধ্যে সে চাঞ্চল্য ওদেশে আর ফিরে আসে নি।

এলিজাবেথের যুগে যার শুরু ভিক্টোরিয়ার যুগে তার চরম পরিণতি। ইংল্যাণ্ড তখন ঐশ্বর্যের উচ্চতম শিখরে গিয়ে পৌঁচেছে। ভিক্টোরিয়ান যুগের sense of security অর্থাৎ 'বাঃ তোফা আছি'—এই মনোভাব আজ পরিহাসের বস্তু হয়েছে। সুখ সমৃদ্ধি যে পরিমাণে বেড়েছে জাতির জীবনীশক্তি সেই পরিমাণে ক্ষীণ হয়েছে। বঙ্কিমবাবু বলেছেন, মহাজনের নৌকা গজেন্দ্রগমনে চলে কারণ তার নিজের গরজ নাই। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর যায় কারণ গরজটা তার নিজের। অভাবের দেশ হাটুরিয়া নৌকার দেশ, সে নিজের গরজেই দ্রুত চলে।

অবশ্য উন্নত দেশ যে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকে এমন নয়, তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তার উন্নতি খুব দ্রুত তালে চলে না। যে দেশ হীনবল, সহায়সম্পদহীন, শিক্ষায় দীক্ষায় পশ্চাদপদ, দ্রুত উন্নতির অবকাশ সেখানেই, বিপ্লবাত্মক ঘটনা সে সব দেশেই ঘটে থাকে। যাদের সব আছে তাদেরই সর্বনাশের ভয়, তারা সর্বস্ব আঁকড়ে ধরে থাকে, সেখানে বিপ্লব ঘটে না। যাদের কিছুই নেই তাদের সর্বনাশের ভয়ও নেই, বিপ্লব সেখানেই ঘটে। বিপ্লব ঘটেছে অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে, বিংশ শতকের গোড়ায় রুশ দেশে, মাঝামাঝিতে চীন দেশে। যখন বিপ্লব ঘটেছে তখন ওসব দেশে জনগণের দুর্দশা চরমে পৌঁচেছিল অর্থাৎ উন্নতির প্রশস্ত অবকাশ রচিত হয়েছিল। মানুষ অভাবের তাড়নায় মরীয়া হলে তবে চেনা পথ ছেড়ে অচেনা পথে চলতে শেখে। অবশ্য কৃতিত্বটা সমস্তই জনতার এমন নয়, জননেতাদের কৃতিত্বও স্বীকার করতে হবে, তাঁরাই নতুন পথ চিনিয়ে দেন।

কিন্তু ইতিহাসের কৌতুকটা এখানেই শেষ নয়। বিপ্লবের নেতারা মুখে বলেন, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় নেতারা যেই না ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তক্ষুনি বিপ্লবী জনতার হাত থেকে বিপ্লবের হাতিয়ার কেড়ে নেন। বলেন এখন আর গোলমাল হৈ চৈ নয়, এখন দেশকে গড়তে হবে, এখন শুধু কাজ। এখন আর মারামারি কাটাকাটি নয়, এমন কি কথা কাটাকাটিও নয়। খেতে পরতে দেব, মুখে রা'টি করবে

না, আমাদের কথায় উঠবে আর বসবে। চোখ মুখ বুজে হুকুম তামিল করার নাম হল বিপ্লবোত্তর বিপ্লব। যে বেপরোয়া জনতা বিপ্লব ঘটিয়েছে তাদের বিপ্লবী মনোভাব বিনষ্ট করতে না পারলে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয় না। ফরাসী বিপ্লবের নেতারা এই ব্রহ্মাস্ত্রটির কথা জানতেন না। সেখানে সকলে মিলে প্রথমে কথা কাটাকাটি পরে মাথা কাটাকাটি করেছে; ফলে সে দেশে বিপ্লব স্থায়ী হয় নি। ডিমক্রেসির দেশে বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব মাত্র আঠারো বৎসর জীবিত ছিল। রাশিয়া লেলিনের মৃতদেহকে যেমন রাসায়নিক ক্রিয়ায় মমী করে রেখে দিয়েছে তাদের বিপ্লবকেও রাশিয়ান প্রক্রিয়ায় তেমনি মমী করে রেখেছে। আশা করা যায় গুটিপোকার মত chrysalis অবস্থায় আরো বহুকাল থাকবে। ইতিমধ্যে জনসাধারণ যদি সত্যিকারের পুণ্যফল কিছু লাভ করে তাহলে এর থেকেই একদিন প্রজাপতি বের হবে এবং শুধু রাশিয়ায় নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইতিহাসের গতি কুটিলা গতি। সর্বজনের সর্বাঙ্গীণ সুখসমৃদ্ধির অভিযানকেই বলে বিপ্লব। সে অভিযান যদি কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মারণাস্ত্র নির্মাণে এবং চন্দ্র অভিযানে নিয়োজিত হয় তাতে বিপ্লবের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হবে? চীন দেশের নেতারা সত্তর কোটি মানুষের খাওয়া পরার ব্যবস্থা কদ্দূর কি করেছেন কে জানে, কিন্তু আণবিক বোমা ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছেন। এ ছাড়া তাঁদের নাবালক বিপ্লবকে আরো শক্ত পোক্ত করে নেবার জন্যে এরই মধ্যে আরেক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। তার কারণ চীনের নেতারা এখনও নিঃসপত্ন হয়ে ক্ষমতার নিশ্চিন্ত আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি। আর বিপ্লবকে সত্যি সত্যি যদি এঁরা জীইয়ে রাখতে চান তাহলে যে বিপদের আশঙ্কা সে কথা আগেই বলেছি। প্রাণ রাখতে যেমন প্রাণান্ত বিপ্লব রাখতে তেমনি বিপ্লবান্ত ঘটে যাবে।

সাধারণ নিয়মে দুর্গত দেশই বিপ্লবের জন্মভূমি। তাই বলে উন্নত দেশে বিপ্লব আদৌ ঘটে না, এমন কথাও জোর করে বলা চলে না। পৃথিবীতে পর পর দুটো মহাযুদ্ধ হল। যুদ্ধও এক ধরনের বিপ্লব। সে বিপ্লব ঘটিয়েছে

জার্মেনি। অন্য দেশের বিপ্লব ঘটেছে অভাবের তাড়নায়, জার্মেনির বিপ্লব ঘটেছে কিছু তার বৈভবের তাড়নায়, কিছু স্বভাবের। জার্মেনি শাক্তধর্মী দেশ, শতাব্দীকাল ধরে এরা শক্তি পূজা করে এসেছে। অস্ত্রবিদ্যায় এরা সব্যসাচী, শিল্পনৈপুণ্যে বিশ্বকর্মা। প্রচুর অর্থ, প্রচুর সামর্থ্য। জার্মেনির মুখে এক বুলি—এত থেকেও যদি ইয়ুরোপের অধিপতি না হলাম তবে কিমহং তেন কুর্যাম। অতএব যুদ্ধং দেহি। ফল হয়েছে মারাত্মক। জার্মেনদের মত এমন জাতি গরিমা আর কোন জাতির নেই। সেই জার্মেন জাতি আজ দ্বিধা-বিভক্ত। দু ভাগে মুখ দেখাদেখি নেই। এটাও ইতিহাসের এক কৌতুক। অনুন্নতকে যেমন উন্নত করতে হয়, উন্নতকেও তেমনি অবনত করতে হয়।

গত মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর মানচিত্র বদলে গিয়েছে। যুদ্ধের সময় একটা বুলি অহরহ শোনা যেত—one world. দেশে দেশে ভেদ থাকবে না—সব দেশ মিলিয়ে এক দেশ, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সে দেশের নাম বসুন্ধরা। ইতিহাসের পরিহাস দেখুন। যুদ্ধ থামল—কোথায় সব মিলিয়ে এক দেশ হবে না এক দেশ ভেঙে দু-তিন দেশ হল। পূর্ব জার্মেনি, পশ্চিম জার্মেনি; উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া; উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এমন আরো কত। ভারতবর্ষ তিন টুকরা—একদিকে ভারত, অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান। একে উন্নতি বলবেন? বোধকরি বলাই উচিত কারণ দেশ যখন এক ছিল তখন দেশবাসীর দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না, এখন পূর্ব পশ্চিম জ্ঞান হয়েছে এবং খুব ভাল রকম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত পৃথিবীকে প্রাচ্য প্রতীচ্য—এই দুই ভাগে বিভক্ত দেখেছিলেন এবং এই দুইকে মেলাতে চেয়েছিলেন। এখন বেঁচে থাকলে তিনি কোন্ প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিল ঘটাতেন? যে কোরীয় যুবকের কথা এককালে বলেছিলেন সে উত্তরাপথের কোরীয়ান না দক্ষিণাপথের?

দেশ ভাগাভাগির কাজে ইন্ধন জুগিয়েছে প্রধানত ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা। ইংরেজের সাম্রাজ্য গিয়েছে, এখন সে হীনবল, হৃতগৌরব। সর্বনাশে সমুৎপন্নে ইংরেজ পণ্ডিত এখন যেখানে পারছে অর্ধেক ছেড়ে বাকি

অর্ধেক রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। একদা চরিত্রগুণে ইংরেজ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিল, এখন শুধু সাম্রাজ্য হারায় নি, তার চাইতে ঢের বড় জিনিস—চরিত্র হারিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের চাইতে ব্রিটিশ-চরিত্রের পতন অনেক বেশি শোচনীয় ঘটনা। আমেরিকার সাম্রাজ্যও নেই, চরিত্রও নেই, এমন কি বুদ্ধিও না। আছে টাকা—সিন্দুক ভরতি ডলার, গোলা ভরতি গম, গুদাম ভরতি গোলা বারুদ। বিচিত্র এক দান খয়রাতির ব্যবসা ফেঁদেছে। দেশে দেশে ডলার দিয়ে, গম দিয়ে, ট্যাঙ্ক আর জঙ্গী বিমান দিয়ে পৃথিবীময় যুদ্ধ ফিরি করে বেড়াচ্ছে। আমেরিকার বন্ধুত্ব হয়েছে আজকের পৃথিবীতে সব চেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার। এত শক্তি এত সামর্থ্য থাকতে সর্বত্র এমন অপদস্থ হতে কাউকে দেখা যায় না। ইতিহাসের এটাও এক পরিহাস।

ভারতবর্ষ দুর্গত এবং অনুন্নত দেশ। এ দেশে যে আজ পর্যন্ত বিপ্লব ঘটে নি তার কারণ আমরা বাহুবলে বিশ্বাস করি না, দৈববলে অর্থাৎ miracle-এ বিশ্বাস করি। গুরুবাদের দেশ—গুরুকৃপায় যদি কার্যসিদ্ধি হয় তো নিজ হাতে কৃপাণ ধারণের প্রয়োজন বোধ করি না। ভারতবর্ষের এক মহা দুর্ভাগ্য এ দেশে কিছুকাল পরে পরে বিরাট বিরাট মানুষের জন্ম হয়েছে। অথচ সে তুলনায় সমগ্র জাতির তেমন কোনো লাভ হয় নি। দেশের সাধারণ মানুষ যে সাধারণ সেই সাধারণই থেকে গিয়েছে। মহাপুরুষের দেশে বেশির ভাগ মানুষ কাপুরুষ হয়। তাঁদের নামে দেশ বড় হয়, জাতি বড় হয় না। বিসমার্ক সম্পর্কে গ্লাডস্টোন বলেছিলেন, He made Germany great but Germans small.

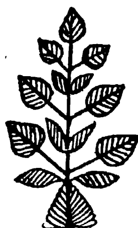
সেই দুর্দৈব আমাদের দেশেও ঘটেছে। এর মানে এই নয় যে, আমাদের মহাপুরুষরা আমাদের ছোট করে দিয়েছেন। আসলে তাঁরা এতই বড় এবং তাঁদের তুলনায় আমরা এতই ছোট যে, আমরা আদৌ মনুষ্য-পদ-বাচ্য কিনা সেই সন্দেহ মনে জাগে।

আধুনিক ভারতবর্ষের মহত্তম ঘটনা গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। আবার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবে দেখতে গেলে এটি এ

যুগের বৃহত্তম কৌতুক। কোনো বিরাট মানুষের আবির্ভাবকে আমরা ঐতিহাসিক কারণ সম্ভূত বলে মনে করি। কোনো দেশেরই মহামানবরা ভুঁই ফোঁড় নন, এঁরা মাটি থেকে হঠাৎ গজান না, আকাশ থেকেও ধপাস করে পড়েন না। ইদানীং কালের থিওরী মতে ইতিহাসের তাগিদে এঁদের জন্ম। অর্থাৎ গান্ধী রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের যখন জন্ম হয় তখন ধরে নিতে হবে যে, জাতির জীবনে এমন কোনো চেতনা এসেছিল যার তাগিদে এরূপ মানুষের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। তাহলে এ কথাও বলতে হয় যে, দেশ এবং জাতি এঁদের আগমনের জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে যে, এ অনুমান ঠিক নয়। গান্ধী যা করেছেন তাতে তাঁর নিজের কৃতিত্ব যতখানি সে তুলনায় দেশের কৃতিত্ব যৎসামান্য। কোনো মানুষের একক সাধনায় যে জিনিস সিদ্ধ হয় দেশ তাঁকে গ্রহণ করলেও রক্ষা করতে পারে না। গান্ধীকে নিয়ে সোরগোল যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তিনি জাতির জীবনে খুব একটা চেতনার সঞ্চার করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। সোরগোলটা একটা প্রমাণ নয়, বরং অজ্ঞ এবং অপদার্থ মানুষের ভিড় যত বেশি সোরগোলও তত বেশি। গান্ধীর আবির্ভাব যদি জাতীয় চেতনার ফল হত তাহলে তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বৎসরের মধ্যে তাঁর জীবনের সকল কাজ এমন ভাবে নির্মূল হয়ে যেত না। রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও তাই ঘটেছে। গান্ধীর মত তিনিও done to death and buried seven fathom deep. দেশ যদি প্রস্তুত না থাকে তাহলে যিনি যত বড় মহাপুরুষ তাঁকে তত বেশি অপদস্থ হতে হয়। ভারতবর্ষের ট্র্যাজেডি রবীন্দ্রনাথের গল্পে বর্ণিত বোষ্টমীর ট্র্যাজেডির মত—"আমার গোপাল আসিয়া দেখিল তাহার জন্য ননি প্রস্তুত হয় নাই।"

প্রকৃতি দেবীর স্বভাবে একটা বেহিসাবী উড়নচণ্ডী ভাব আছে—এই যে গাছপালা, লতাপাতা, ফুল ফল যা দেখছি তার শতগুণ ঝরে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, পচে যাচ্ছে। শক্তির কী অজস্রতা এবং কী তার অপচয়! ইতিহাসেও তাই ঘটে। গান্ধী রবীন্দ্রনাথ সদৃশ মানুষের উদ্ভব বেহিসাবী প্রাকৃতিক phenomenon-এর মত। আমাদের জাতীয় জীবনের স্ফুরণের

ফলে যদি এঁদের উদ্ভব হত তাহলে এঁদের জীবন আমাদের জীবনে এতখানি ব্যর্থ হত না। আমাদের যোগ্যতার তুলনায় পাওনাটা এত বেশি হয়ে গিয়েছে যে, তাকে আমরা কোনো কাজেই লাগাতে পারি নি। এটা ইতিহাসের অপচয় ছাড়া আর কি?



আত্মদীপ

ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, আত্মদীপো ভব—নিজেই নিজের আলো হবে অর্থাৎ নিজ বুদ্ধির আলোকেই নিজের পথ বেছে নেবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং নিজ গুণে, নিজ সাধনা বলেই বোধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু প্রভুর যখন তিরোধান হল তখন শিষ্যরা সমস্বরে উচ্চারণ করলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি অর্থাৎ বুদ্ধির আশ্রয় না নিয়ে তাঁরা বুদ্ধের আশ্রয় নিলেন। প্রত্যেক মহাপুরুষই জীবন জিজ্ঞাসার কয়েকটি সূত্র ধরিয়ে দিয়ে যান। তার ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগবিধি যার যার বুদ্ধি মত যে যে করে নেবে, এই তাঁরা চান। গুরু শিষ্যের সম্পর্ক তো প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। সেখানে ভাবের আদান-প্রদান, বুদ্ধির স্ফুরণ। এজন্যে দু-এর মধ্যে ভাবনার মিল যতখানি সাধনার মিল ততখানি নয়। রামকৃষ্ণের সাধনা এবং বিবেকানন্দের সাধনা এক নয়, মার্কস লেনিন এক নন, গান্ধী নেহেরুও এক পথের পথিক নন। অতিশয় অনুগত শিষ্য হয়েও নিজ নিজ পথ তাঁরা নিজেরাই করে নিয়েছেন। অনুগামী হলেই পশ্চাদগামী হতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। অনেক ব্যাপারে অনুগামীরাই অগ্রগামী হন। কোনো মহাপুরুষই কোনো কালে মানুষের বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করতে চান নি। মহাপুরুষ মাত্রই মুক্তিদাতা, মানুষের মনকে তাঁরা সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন, কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত, কারণ মানুষ মুক্তি চায় না, সে চায় অবলম্বন। একটা কিছুকে ভর করে দাঁড়াতে চায়। বেশির ভাগ মানুষেরই মন নিরুদ্দম, নিরুৎসুক। ভাবনা-চিন্তার দায় এড়াতে পারলে আরাম বোধ করে, নিজের মত করে আর ভাবতে চায় না। জীবনযাত্রার ব্যাপারে যেমন দোকানের রেডিমেড পোশাক, হোটেলের রেডিমেড খানা, ঘরে ইনস্ট্যাণ্ট চা কফি, চিন্তার ব্যাপারেও তেমনি কতকগুলো ধরতাই বুলি সম্বল। জীবন যত বেশি

জটিল হয়ে উঠছে তত বেশি আমরা সহজ পন্থার অনুসন্ধানী হয়ে উঠছি। ভুলে যাচ্ছি যে, জীবন যেখানে জটিল, বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজন সেখানেই বেশি।

আমাদের সমাজে বিচারের চাইতে আচারের প্রাধান্য চিরকালই বেশি। সমাজপতিরা কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছেন, মনু পরাশরের বিধান মতে সমাজ চলেছে। এখনও অবস্থার খুব যে একটা পরিবর্তন হয়েছে এমন নয়। এখন সমাজপতির স্থান নিয়েছেন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। তাঁরাও আগের মত সেই শাস্ত্রবাক্যই আওড়াচ্ছেন। মনু পরাশরের স্থান নিয়েছেন কোনো ক্ষেত্রে গান্ধী, কোনো ক্ষেত্রে মার্কস লেনিন মাও সে-তুঙ। সেকালের সমাজ-পতিদের কিছু তবু দয়ামায়া ছিল। শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করলে বড় জোর এক-ঘরে করা হত, ধোপা নাপিত বন্ধ হত। এখন আর এক-ঘরে করে না, তার বদলে একমাত্র ঘরটি পুড়িয়ে দেয়। ধোপা নাপিত বন্ধ করে না, নিজেরাই মাথা মুড়িয়ে দেয়। সজ্ঞানে বিরোধিতা করলে অঙ্গহানি, চাইকি প্রাণহানি ঘটে। আগেকার সমাজে শাস্ত্রের দৌরাত্ম্য ছিল, এখন শাস্ত্রও আছে শস্ত্রও আছে। ফলে আজকের মানুষ ঢের বেশি সন্ত্রস্ত সশঙ্ক।

অবশ্য এ কথাও সত্য যে, শাস্ত্রের ঘাড়ে যতখানি দোষ চাপানো হয় শাস্ত্র ঠিক ততখানি দোষী নয়। কোনো শাস্ত্রই এমন কথা বলে নি যে, শাস্ত্রবাক্য বিনা বিচারে মেনে নিতে হবে। এমন যে হিন্দু শাস্ত্র সেও বলেছে—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে।

দেখা গিয়েছে, শাস্ত্র ব্যাখ্যাতারা যতখানি অবিবেচক শাস্ত্র ততখানি নয়। তাছাড়া বাঙালী সমাজে শাস্ত্রবিদরাও খুব বড় রকমের জখম কিছু করতে পারেন নি। কারণ এক তরফা শাস্ত্রের বিধান এ দেশে খুব বেশি লোক মেনে নেয় নি। বাঙলা দেশ নৈয়ায়িকের দেশ। তাঁরা প্রতি পদে যুক্তির তর্ক তুলেছেন। তাতে আর কিছু না হোক বুদ্ধিচর্চার যথেষ্ট সহায়তা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসে sophist সম্প্রদায় যে কাজ

করেছেন বাঙলা দেশে নৈয়ায়িকরা তাই করেছেন। যুক্তিবাদ এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে মূল্য এবং সম্মান দিতে এঁরা শিখিয়েছিলেন। অবশ্য এর একটা অন্য দিকও আছে। কোনো জিনিসেরই আতিশয্য ভাল নয়। অতিরিক্ত তার্কিকতার ফলে কোনো বিষয়ে কোনো মতবাদই ঠিক শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি। বাঙালীর সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন তাকে একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তেমনি আবার ঐ স্বভাবই তাকে কোনো বিষয়ে দলবদ্ধ বা জোটবদ্ধ হতে দেয় নি। কোনো ব্যাপারেই কোনো একজন নেতা অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব লাভ করেন নি। একমাত্র বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য ছিল বলে সকল বাঙালী কিছুকালের জন্যে এক মন এক প্রাণ হয়েছিল। বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি এবং স্বাতন্ত্র্যবোধকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও তার সামাজিক ঐক্যবোধের অভাব রবীন্দ্রনাথ গোড়াগুড়িই লক্ষ্য করে এসেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি যে স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই সম্পর্কে তিনি একজন সমাজপতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন। শিক্ষায় দীক্ষায় কর্মে চিন্তায় চরিত্র-মহিমায় সর্বজনবরেণ্য কোনো ব্যক্তিকে ঐ সমাজপতির আসনে সমগ্র সমাজ বরণ করে নেবে এবং সকলে তাঁর নেতৃত্বকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এ সম্পর্কে তিনি সেদিনের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম করেছিলেন। "একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমস্ত সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয় স্থাপন, আপন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় দেখি না।"

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী একবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। গান্ধী নেতৃত্বের প্রথম পর্বে শুধু বাঙলা দেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষকেই আমরা এক পতাকার তলায় মিলিত হতে দেখেছি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি অভূতপূর্ব ঘটনা, এমনটি কোনোকালে ঘটে নি। বাঙলা দেশের নেতা সেদিন চিত্তরঞ্জন। স্বদেশী আন্দোলনের পরে সেই দ্বিতীয় বার বাঙালী এক ছত্রছায়ায় মিলেছিল। এমন কি গান্ধীজীর কংগ্রেস ত্যাগ করে

চিত্তরঞ্জন যখন স্বরাজ্য পার্টি স্থাপন করলেন তখনও তিনি বাঙলা দেশের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তাঁর অধিনায়কত্ব অপর কোনো বাঙালী নেতা এক দিনের জন্যও চ্যালেঞ্জ করতে পারেন নি। চিত্তরঞ্জনের পরে বাঙলার রাজনীতিতে সেই যে ভাঙ্গন ধরেছে আজ পর্যন্ত সে আর জোড়া লাগে নি। এখন সেই ভঙ্গদশা চরম পর্যায়ে পৌঁচেছে। রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টিতে দেশের এই দুর্দৈব ধরা পড়েছিল। এজন্যে স্বদেশী যুগে যে কথা বলেছিলেন মৃত্যুর মাত্র দু বৎসর পূর্বে বাঙলা দেশকে তিনি আবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে 'দেশনায়ক'-এর পদে বরণ করে সমগ্র বাঙালী জাতিকে তাঁর পতাকা তলে মিলিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। "আমি আজ তোমাকে বাঙলা দেশের রাষ্ট্রনেতার পদে ববণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে······। ······একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোক এক হতে পারলে তবেই হবে অসাধ্য সাধন।"

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন মানুষের প্রতি জাতির আনুগত্য প্রার্থনা করেছিলেন যিনি দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যাঁর শক্তিমত্তা এবং চরিত্রমাহাত্ম্য প্রশ্নাতীতরূপে প্রমাণিত। একে কোনো মতেই অন্ধ আনুগত্যের আবেদন বলা চলে না। কিন্তু এই ব্যাপারেও আমাদের অন্ধতা এবং বিচার-বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ পেয়েছে অন্য আকারে। সে কথাটি বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের নিকট দেশনায়ক আখ্যা লাভের বৎসর কাল পরে দেশ থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান। অতি বড় বিস্ময়ের কথা যে, রবীন্দ্রনাথের 'দেশনায়ক' রাতারাতি, দেশবাসীর একাংশের কাছে দেশদ্রোহী কুইস্‌লিং হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, এঁদের মতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আমাদের পরম মিত্র বিবেচিত হল। আরো কি দেশ বিভাগের দাবিতে এঁরা মুসলিম লীগের সমর্থক হলেন। রাজনৈতিক illiteracy-র চরম দৃষ্টান্ত বলতে হবে। যুক্তিহীনের বিচারে কতখানি বুদ্ধিহানি ঘটতে পারে এ সব তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত। যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী বাঙালীর ইতিহাসে এ এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

এককালে বুদ্ধিজীবী জাতি হিসেবে বাঙালীর খ্যাতি ছিল। আজ সে গৌরব অস্তমিত। নিজের বিচারবুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বাঙালী আজ

তোতাপাখীর মত শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে। যূথবদ্ধ পথ-পরিক্রমা আর দলবদ্ধ শ্লোগান উচ্চারণ বিরুদ্ধ মতকে যে পরিমাণে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি সে পরিমাণে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। তিরিশ বছর আগে শেখানো বুলি উচ্চারণ করে করে যাঁরা রাজনীতির পাঠ নিয়েছেন আজকে তাঁরাই দেশের নেতা হয়েছেন। এখন তাঁরা সর্দার পোড়ো; তাঁরা ধূয়া তুলে দেন আর হাজার কণ্ঠে জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। যুক্তফ্রণ্টের চৌদ্দ শরিক পথে ঘাটে, বাজারে গঞ্জে হানাহানি মারামারি করছে, তা চোখে দেখেও বুদ্ধি-বন্ধক দেওয়া বাঙালী সন্তান সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি তুলছে—ফ্রণ্ট 'মাঈকী' জয়। ফ্রণ্টের নাভিশ্বাস উঠেছে দেখেও চেঁচাচ্ছে—যুগ যুগ জিও (বাঙলা ভাষার কী দশাই হয়েছে!) খুনজখম, রাহাজানি, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ নিত্যকর্ম পদ্ধতি অথচ ফ্রণ্টমন্ত্রী আমাদের সজ্ঞানে বিশ্বাস করতে বলছেন যে, এটি নাকি পৃথিবীর সুসভ্যতম গবর্নমেণ্ট। ফ্রণ্টমন্ত্রীর এই উক্তি বাঙালীর বুদ্ধির প্রতি সব চাইতে বড় affront।

বাঙালী স্বভাবত তার্কিকের জাত, প্রতি পদে তর্ক করেছে। অতিরিক্ত তার্কিকতা অনেক কর্মের উদ্যোগকে বাধাও দিয়েছে। নিরন্তর রন্ধ্রসন্ধানী তার্কিকতাকে রবীন্দ্রনাথ নিষ্কর্মা বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতা বলে তিরস্কারও করেছেন। কোনো জিনিসেরই আতিশয্য ভাল নয়। তথাপি এটুকু বলতে হবে যে, তর্ক আর কিছু না করুক, মানুষকে একটু সতর্ক করে। অপরিণত বুদ্ধির অসতর্ক আত্মসমর্পণের চাইতে পরিণত বুদ্ধির সতর্কতা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, সব শেয়ালের এক রা যতখানি স্বাভাবিক সব মানুষের এক রা ততখানি অস্বাভাবিক। কর্মে কথায় কাজে যে regimentation-এর চেষ্টা চলছে সে আর কিছু নয়, সকল মানুষের নাবালকীকরণ। এটা সভ্যতার স্বভাবধর্ম বিরোধী। মানুষের বুদ্ধিকে পরিণতি দিয়ে তাকে সাবালক করে তোলাই সভ্যতার উদ্দেশ্য। পরিণত বুদ্ধির পথে অগ্রগতিকেই বলে evolution। অবশ্য আজকের মানুষ evolution-এ বিশ্বাসী নয়, revolution-এ বিশ্বাসী। কিন্তু কর্মে কথায় চিন্তায় regimentation-এর দ্বারা রিভলিউশন আসবে এমন কথা

যাঁরা ভাবেন তাঁরা রিভলিউশনকে পূর্ণ মর্যাদা দেন না। কারণ মানুষকে নাবালক বানিয়ে বিপ্লব ঘটানো যায় না, বিপর্যয় ঘটানো যায়।

অর্বাচীন নেতৃত্বের নির্বিচার আজ্ঞাবহন কতখানি সর্বনাশের হেতু হতে পারে হিটলার-এর জার্মেনী তার দৃষ্টান্ত। জার্মেনী বুদ্ধিজীবীর দেশ, কিন্তু মতিভ্রান্ত হয়ে চোখ বুজে আজ্ঞা বহন করেছে আর হাইল হিটলার বলে চেঁচিয়েছে। স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করেছে বলেই এত বড় সর্বনাশ ঘটতে পেরেছে, জার্মেনীর মত দেশ আজ দ্বিধা-বিভক্ত। জার্মেন জাতির একাংশ অপরাংশের শত্রু, মুখ দেখাদেখি নেই। মজার কথা এই যে, এ কুকীর্তি যার কর্মফল সেই হিটলার-এর নাম আজ পূর্ব-পশ্চিম দুই জার্মেনী থেকেই বিলুপ্ত। ঐ তো হয়, নেতারা নিজ কর্মফল ভোগ করেন না, ভুগতে হয় দেশবাসীকে বহুকাল ধরে। বাঙলা দেশেও ঐ একই ট্র্যাজেডি ঘটেছে। প্রাচীনের নেতৃত্বে দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে, অর্বাচীনের নেতৃত্বে দেশ আজ শতধা বিদীর্ণ হতে চলেছে। ভ্রান্ত নেতৃত্ব সমস্ত দেশকে বিভ্রান্ত করে।

মানুষের বুদ্ধিকে যদি ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় তাহলে নেতৃত্ব মাত্রই অভ্রান্ত হয়ে ওঠে। কারণ ভ্রান্তি ঘটলেও ভ্রান্তি দর্শাবার লোক থাকে না। এ যুগের রাজনৈতিক সংহিতা মতে ভাববার বুঝবার দায় একমাত্র দল-নায়কের, বাদবাকি সকলে শুধু আজ্ঞা পালন করবে। অগ্রগমনের অধিকার কেবল দলপতির আর সকলে অনুগামী। যথাবিহিত অনুগমনের জন্যে বুদ্ধিদমন অত্যাবশ্যক। দলের ভার বাড়াতে হলে বুদ্ধির ধার কমাতে হয়। এর ফল আখেরে ভাল হয় না। কারণ এর মধ্যেই ভবিষ্যতের দুর্বলতা লুক্কায়িত থাকে।

দ্বিধাহীন একনিষ্ঠ আনুগত্যের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সে একনিষ্ঠতা দাবি করবার জন্যে যে মনীষা, যে কল্পনা শক্তি, যে চরিত্রমাহাত্ম্য এবং হৃদয়বত্তার প্রয়োজন, অপ্রিয় সত্য হলেও স্বীকার করতে হবে যে, বাঙলা-দেশের নেতৃত্বে আজ তার অভাব ঘটেছে। দেশবন্ধুর পরে একমাত্র সুভাষ-চন্দ্রই প্রকৃত দেশনায়কের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। দেশনায়ক এককালে একজনই মাত্র হতে পারেন, কারণ তিনি সর্বপ্রকারে অনন্য এবং

অদ্বিতীয়। দেশনায়কের অভাবেই বহুনায়কের উদ্ভব। সমস্ত দেশের মন পায় না বলে ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করতে হয়। ফলে বহুনায়কের দেশ বহুধা বিভক্ত হয়—আজ বাঙলাদেশের যা অবস্থা হয়েছে। অমিট্ রায়ের একটি উক্তি সামান্য অদল-বদল করে বলা যেতে পারে—সতী দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যেখানে পড়ল সেখানেই একটি করে পীঠস্থান তৈরি হল। আমাদের দেশপ্রেমও টুকরো টুকরো হয়ে যেখানে সেখানে নেতৃত্বের আখড়া তৈরি করেছে। খুদে খুদে নেতায় দেশ ছেয়ে গেল। তাদের কোনো গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের কোনো ডিগ্‌নিটি বোধ নেই।

দলের দাবিতে বড় জোর দলপতি হওয়া যায়। সমগ্র দেশের দাবিকে যিনি নিজ দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেন তিনিই দেশনায়ক। বাঙলাদেশে আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশনায়কের, কারণ নিত্য দেখা যাচ্ছে দলের প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজন উপেক্ষিত। দুঃখিনী বঙ্গমাতা বহু দলের পদতলে দলিত নিপীড়িত। বঙ্কিমচন্দ্র যাঁকে বলেছিলেন বহুবলধারিণীং আজ তিনি হয়েছেন বহুদলধারিণীং। সেদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, আজ যদি আবার প্রশ্ন হয়, অবলা কেন মা এত বলে তাহলে বঙ্গমাতাকে বলতে হবে, অবলা করেছে মোরে এত দলে মিলে। কারণ দলনেতারা দল নিয়ে এত ব্যস্ত যে দেশের কথা ভাববার সময়ই তাদের নেই।

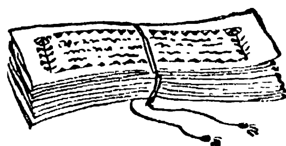
অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে দলনিরপেক্ষ দেশ-অন্ত-প্রাণ কোনো নেতার আবির্ভাব হলে তবেই দেশ রক্ষা পাবে। বলা নিষ্প্রয়োজন দেশে আজ সেই নেতা নেই; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাঁর আবির্ভাব সুনিশ্চিত। দেশনায়কের জন্ম দেশের স্বতঃউদ্গত ইচ্ছাশক্তি বা will power-এর মধ্যে নিহিত। 'ইচ্ছা হয়ে জন্মেছিলি মনের মাঝারে'—সকল দেশের সকল জননায়ক সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। বাঙলা দেশের সেই অনাগত নেতা আজকের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই রয়েছেন। অবশ্য আজকের বিক্ষোভকারী শ্লোগান-উচ্চারী অস্থিরচিত্ত তরুণ সমাজে ভাবী দেশনায়কের উদ্ভব সম্ভব এ কথা ভাবা কঠিন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হবেন সে মুহূর্তেই তাঁরা সম্বিৎ ফিরে পাবেন। মানুষ পথভ্রান্ত হয়, আমাদের যুবকরা দলভ্রান্ত।

তাঁরা ভুলে গিয়েছেন, যে, যুবক সম্প্রদায়ই একটা দল এবং দেশের বৃহত্তম দল। বিভিন্ন দলের সমষ্টি United Front-এর কথা না ভেবে তাঁদের উচিত সমগ্র দেশের হয়ে একটি Youth Front গঠন করা। তাঁরা কোনো দলের কথা না ভেবে দেশের কথা ভাববেন, তাঁদের আনুগত্য দেশের সকল মানুষের প্রতি, কোনো দলের প্রতি নয়। কোনো দলগত ideology-র কথা না ভেবে যুবক সম্প্রদায়ের উচিত সর্বাগ্রে যৌবনধর্ম পালন করা। যৌবন itself একটা ideology। যৌবনকালে সেই ideology পালন করলে তবেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট হবে। আমাদের যুবক সমাজ যৌবনের স্বভাবধর্ম পালন করছেন না। যৌবন যুক্তিপন্থী, সে প্রশ্ন করে, তর্ক করে, অন্ধের মত আজ্ঞা বহন করে না। গতানুগতিক জীবনযাত্রার, সেকেলে ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করা যৌবনের স্বভাব—'দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা'—ইংরেজীতে যাকে বলে iconoclast। আজকের যুবকরাও ভাঙছেন কিন্তু ভাঙছেন জানালা দরজা, ফাটাচ্ছেন মানুষের মাথা। যৌবনশক্তির এমন স্থূল ব্যবহার দেখলে কষ্ট হয়। একে সুস্থ বলিষ্ঠ শক্তি বলা চলে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাঙলা দেশের তরুণ একদিন 'স্বতঃউদ্যত ইচ্ছা' বলে বলীয়ান হয়েছিল। আজ সেই তরুণ সম্প্রদায় স্ব-ইচ্ছার বল হারিয়ে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করছে, এ কথা ভাবতে ভাল লাগে না। বাঙলা দেশের যৌবন একদিকে যেমন দুঃখবরণের মহিমায় উজ্জ্বল অপরদিকে তেমনি নির্ভীকতায় সমুজ্জ্বল। সন্ত্রাসবাদের সমর্থন রবীন্দ্রনাথ কোনো কালে করেন নি, তথাপি গর্বের সঙ্গে বলেছেন, "একদিন ইচ্ছার অগ্নি-গর্ভ রূপ দেখেছি বাঙলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়ে জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, কিন্তু সেই ব্যর্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তা দেখি নি।" বাঙলার তরুণ চিত্ত আজও তেমনি নির্ভীক, তেমনি তেজস্ক্রিয়, কিন্তু তার পূর্ব গরিমা বা মহিমা নেই। কারণ আগে যে সংগ্রাম ছিল প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে আজ সে সংগ্রাম অতি

ক্ষুদ্র দলীয় সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। সেদিনের যুবকরা যা করেছেন দেশের জন্যে আজকের যুবকরা তা করছেন দলের জন্যে। এ দু-এর মধ্যে যোজন ব্যবধান। দেশ আর দল এক নয়। যেখানে দেশনায়কের প্রয়োজন সেখানে যদি দলনায়কের আবির্ভাব হয় তাহলে উদ্যোগ আয়োজন সাধনা এবং সিদ্ধি সমস্তই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। আজকের তরুণ সম্প্রদায় সেই ক্ষুদ্রতার পাকে জড়িয়ে পড়েছেন।

কিন্তু দেশের আশা ভরসা তাঁরাই। এ গুরু দায়িত্ব তাঁদেরকেই গ্রহণ করতে হবে। দেশনায়কের যোগান দিতে হবে তাঁদের মধ্য থেকেই। এ জন্যে চাই অসীম ধৈর্য, নিরলস সাধনা। এখন যে ভুল তাঁরা করছেন সেটি হল, প্রস্তুতি পর্বের পূর্বেই তাঁরা সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। বহু ধৈর্য ধরি দিবস শর্বরী কাটাতে হবে। গুরু গোবিন্দের মত বলতে হবে, বন্ধু এখনো সময় নয়। তিল তিল করে শক্তি সঞ্চয় করে, 'আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ দেখিব যবে' সেদিন সময় হবে। যথার্থ দেশনায়কের আবির্ভাব সেদিনই হবে যাহার জীবনে লভিয়া জীবন জাগিবে সকল দেশ।



আদি পাপ

খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে Original sin বলে একটা কথা আছে। আদি মানব আদম এবং ইভ্‌ সৃষ্টিকর্তার আদেশ লঙ্ঘন করেছিলেন। এটিই আদি পাপ, এরই ফলে স্বর্গ থেকে তাঁদের বহিষ্কার এবং মর্তে নির্বাসন। সেই থেকে তাঁদের বংশধর মর্তবাসী মানুষ সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ বহন করে আসছে—রোগ শোক জরা মৃত্যু ভোগ করছে। মানুষ পাপক্লিষ্ট জীব, পাপে তার জন্ম, পাপের মধ্যেই জীবন ধারণা। খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে তো বটেই, ইয়ুরোপীয় কাব্যে সাহিত্যেও এই আদি পাপের তত্ত্বটি মস্ত বড় জায়গা জুড়ে আছে। আমি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নই, ধর্ম নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই না। ধর্মবোধের দ্বারা যেমন অনুপ্রাণিত নই, পাপবোধের দ্বারাও তেমনি ক্লিষ্ট নই। তাছাড়া এই পাপ তত্ত্বের উৎপত্তি কাহিনীটি আমি যেমন বিশ্বাস করি না আজকের দিনে অনেকেই তা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই কাহিনীকে যদি আমরা আক্ষরিকভাবে গ্রহণ না করে একে একটি রূপক হিসেবে দেখি তাহলে এর মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রূপকটির তাৎপর্য এই যে, কোনো ব্যাপারের মূলে যদি কোনো অসত্য বা অন্যায় থাকে তাহলে তার পরিণতি কখনো ভাল হতে পারে না। এর মধ্যে সর্বনাশের বীজ লুক্কায়িত থাকে এবং মানুষকে এক দুর্গতি থেকে অপর দুর্গতিতে নিয়ে যায়।

আমার মুখে ধর্মকথা কেউ কখনো শোনে নি, আজকে হঠাৎ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি বলে অনেকেই নিশ্চয় বিস্মিত বোধ করছেন, কিন্তু শুনে আপনারা আশ্বস্ত হবেন যে, সত্যি সত্যি আমি ধর্মকথা বলতে বসি নি। আমি ভাবছিলাম আমাদের স্বাধীনতার কথা। শত বৎসরের তপস্যার ফল আমাদের এই স্বাধীনতা। অনেক ত্যাগ, অনেক দুঃখ, অনেক কৃচ্ছ্র সাধনের ফল। বহু মৃত্যু দিয়ে অমৃত ফল লাভ করা গিয়েছিল। মাত্র কুড়িটি বৎসর,

কোথায় গেল সেই অমৃত? বিশ বৎসরেই সমস্ত বিষিয়ে উঠল, এতদিনের সাধনার ধন প্রহসনে পরিণত হল। এর কারণ কি? এর কারণ সেই Original sin বা আদি পাপ। আমাদের স্বাধীনতার জন্ম হয়েছে একটি বিরাট অসত্য এবং অন্যায়ের ভিত্তিতে—সেটি হল দেশ বিভাগ। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রচার করেছিলেন—আমাদের একটিমাত্র দেশ আছে, সে দেশের নাম বসুন্ধরা ; একটি মাত্র জাতি আছে, সে জাতির নাম মানব জাতি—সেই যুগে একই ভূভাগে বাস করে দেশবাসীর একাংশ বললে, আমরা ভিন জাতি, অতএব ভিন দেশী। একই পরিবারে দুই ভাই যেমন দুই ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী হতে পারে তেমনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হতেও বাধা নেই। তাই বলে দুই ভ্রাতা যদি বলে আমরা ভিন্ন জাতি, তার চাইতে অযৌক্তিক কথা আর কিছু হতে পারে না। যা যুক্তিবিরোধী তাই ধর্মবিরোধী। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানি প্রজায়তে। তথাপি হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মপ্রাণ জাতি একটি বিরাট অধর্মকে মেনে নিয়ে দেশকে ভাগ করে নিলে, মাতৃভূমিকে কেটে দুখানা করলে। সেই গল্পের মত একই শিশুকে দুই রমণী নিজ সন্তান বলে দাবি করেছিল। চতুর বিচারক বললেন, দুজনে কেটে ভাগ করে নাও। নকল মা তাতেই রাজি। আসল মা বললেন দরকার নেই, ওকেই দিয়ে দিন। এখানে সে গল্পটাই উল্টো আকারে দেখা দিয়েছে। দুই সন্তান মাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। ইংরেজ কাজি বললেন, দুজনে কেটে ভাগ করে নাও। দুই সন্তানই তাতে রাজি। প্রমাণিত হল যে, দুটিই নকল সন্তান। মায়ের জন্যে কারোই মাথাব্যথা নেই, মায়ের ভিটের ভাগটা পেলেই হল।

কী এমন সঙ্কট দেখা দিয়েছিল যে, এমন উদ্ভট প্রস্তাবও মেনে নিতে হল। সর্বনাশ সমাগত হলে শুনেছি অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতজী কি এতই হিসেবী পণ্ডিত ছিলেন? এই পরম লাভের জন্যে নেহেরু চৌদ্দ বৎসর কারাবরণ করেছিলেন? একমাত্র গান্ধীজীর মুখেই রামচন্দ্রের খেদোক্তি শোনা গিয়েছে—'বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে।' আসল কথা, দেশ যখন ভাগ হল তখন

দেশ-নেতারা সকলেই প্রায় ষাটের কোঠার পৌঁছেছেন, সকলেই war-broken soldiers—যুদ্ধক্লান্ত সৈনিক। জীবদ্দশায় স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাটাই তাঁদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভবিষ্যতের কথা তাঁরা ভাবেন নি। খণ্ডিত দেশের অর্থ যে খণ্ডিত স্বাধীনতা সে কথা ভাববার সময় তাঁদের ছিল না। এককালের সত্যাগ্রহী নেতারা সেই যে এত বড় একটা অসত্যকে মেনে নিলেন সেই দুর্বলতার পাপেই নেতৃত্ব ক্রমে দুর্বলতর হতে লাগল। অনেক দিন দাসত্ব করা গিয়েছে এবার প্রভুত্ব করব, অনেক ত্যাগ করেছি এবার ভোগ করব, অনেক ক্লেশ স্বীকার করেছি এবার আরাম করব। ক্ষমতার লোভই মানুষকে সব চাইতে বেশি অক্ষম করে। ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সর্বক্ষমতা লোপ পেল। নেহেরুর মত মহারথীও এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, গাণ্ডীব উত্তোলনের শক্তি তিনি হারিয়েছিলেন, বহু অন্যায়কে নীরবে সহ্য করেছেন কিংবা জ্ঞাতসারে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

এ সমস্তই ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রমতে অর্থাৎ নিতান্তই logical কারণে ঘটেছে। স্বাধীনতার পূণ্য মুহূর্ত হিন্দু মুসলমানের রক্তে কলঙ্কিত হয়েছে। পূর্ব পশ্চিম দুই প্রান্ত থেকে এক কোটি মানুষ অকস্মাৎ নিরাশ্রয় হয়ে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। এদিক থেকেও বহুসংখ্যক চলে গিয়েছে ‘স্বদেশে’ অর্থাৎ ‘স্বজাতি’র দেশে। বলা বাহুল্য স্বদেশী আমলে স্বদেশ এবং স্বজাতি বলতে যা বোঝাত এখন আর তা বোঝায় না। স্বাধীন রাষ্ট্রের সবে ভিত গড়বার কল্পনা চলছে, সেই মুহূর্তে এক বিপুল জনস্রোত এসে সমস্ত ছত্রাকার করে দিলে। দেশে দেশে পণ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা আছে। আমরা মানুষকেই পণ্য হিসেবে গণ্য করে লোক বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছি। ফলে সমগ্র ভূভাগ বিপর্যস্ত। কুড়ি বৎসরেও দেশ সে ধাক্কা সামলাতে পারে নি। সামলে উঠতে আরো বহু বৎসর লাগবে। অবিভক্ত দেশের স্বাধীনতা যতখানি শান্তি শৃঙ্খলা দিতে পারত, বিভক্ত দেশের স্বাধীনতা ঠিক ততখানি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। একেই তো দেশ নানা ধর্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এখন ‘রিফিউজী’ নামে এক বিরাট সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে।

পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা করে এঁদের কৃতজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করা হয় নি বরং অবহেলার দ্বারা বিরূপতার সৃষ্টি করা হয়েছে।

অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা বহু সমস্যার সমাধান করেছে, আমাদের স্বাধীনতা অগণিত সমস্যার সৃষ্টি করেছে কারণ এর মূলে রয়েছে দেশ বিভাগের পাপ। খ্রীষ্টানদের ত্রাণকর্তা আপন প্রাণ দিয়েও আদি পাপ থেকে অভিশপ্ত মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন নি; আমাদের একমাত্র নেতা যাঁকে ত্রাণকর্তা বলা যেতে পারত তিনিও সে দুর্দৈব থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারেন নি। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, গান্ধীজী জিন্না সাহেবকে যে blank cheque দিতে চেয়েছিলেন সেটি আর কিছু নয় ঐ খাঁটি মায়ের কথা। দেশ ভাগ করবার প্রয়োজন কি? আপনার ইচ্ছামত গোটা দেশটারই শাসনভার আপনি নিন। কিন্তু দেখা যায় যেখানে ধর্ম নিয়ে কলহ সেখানে ধর্মকথা কেউ শোনে না। জিন্না সাহেবও শোনেন নি। গান্ধীজী বলেছিলেন, Divison of the country is a sin; বলেছিলেন, you can divide the country only over my dead body.

সত্যব্রত মানুষের কথা কখনো মিথ্যা হয় না। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। ত্রাণকর্তা যীশুর ন্যায় গান্ধীও প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু অধর্মকে রোধ করতে পারেন নি।

খ্রীষ্টান জগতে এ যুগে যা ঘটছে তা যেমন যীশুখ্রীষ্টের ট্র্যাজেডি, আজকের ভারতবর্ষে যা ঘটছে তাও তেমনি মহাত্মা গান্ধীর ট্র্যাজেডি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনায় গান্ধীজী দেশের সম্মুখে যে কার্যসূচী রেখেছিলেন তার মধ্যে প্রধান ছিল অহিংসা, হিন্দু মুসলিম ঐক্য, চরকা আর সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দী শিক্ষা। ইতিহাসের আশ্চর্য পরিহাস—মহাত্মার নেতৃত্বাধীনে যে দেশ ত্রিশ বৎসর কাল অহিংসার মহড়া দিয়েছিল সে দেশে আজ কথায় কথায় বোমা নিক্ষেপ, মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার। অপর পক্ষে হিন্দু মুসলিম ঐক্যবোধ এমনি জোরদার হল যে, দেশের দুই প্রান্তে দু দুটো পাকিস্তানের সৃষ্টি হল। আর এখন সর্বভারতীয় ভাষা নিয়ে দেশময় কুরুক্ষেত্র

বেধেছে। বাকি রইল চরকা, সেটি আমরা metaphorically গ্রহণ করেছি অর্থাৎ প্রত্যেকে যার যার নিজের চরকায় তেল দিচ্ছি। দেশের কথা, দশের কথা ভাবতে হবে না—শুধু নিজের স্বার্থটি বজায় থাকলেই হল। ভাবলে অবাক লাগে, মহাত্মাজী যা কিছু চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর মাত্র বিশ বৎসরের মধ্যে আমরা তাঁর সমস্তই বিসর্জন দিয়ে বসে আছি। একেই বলে ইতিহাসের অট্টহাস্য। বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাসের এত বড় পরিহাস বড় একটা দেখা যায় না। আজকে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে তাণ্ডব চলছে তার মূর্তিটি একবার মনে মনে কল্পনা করে দেখুন—এ হচ্ছে দেশের আকর্ণবিস্তৃত বিকট অট্টহাস্য। এই তাণ্ডবের মধ্যে বৎসরকাল পরে মহাসমারোহে গান্ধীজীর যে শতবার্ষিকী পালিত হবে সেটি হবে ইতিহাসের চরমতম পরিহাস। তবে এ কথাও বলে রাখা প্রয়োজন যে, যা কিছু ঘটছে তা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, গান্ধীজী দেশকে ভুল পথে চালিত করে-ছিলেন। বরং এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর নির্দেশিত পথই ঠিক পথ। সেই পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলেই আজ দেশের এই অবস্থা।

পাপে যার জন্ম পাপেই সে লিপ্ত থাকে। আমাদের কুড়ি বৎসরের স্বাধিনতার ইতিহাস পাপ কলঙ্কিত। এক পাপ অপর পাপকে প্রশ্রয় দেয়, এক বিভাগ বহু বিভাগের পথকে উন্মুক্ত করে। মূলগত ঐক্যটির মূলচ্ছেদ করা হয়েছে বলে কোনো দিক দিয়েই কোনো ঐক্য আর দানা বাঁধছে না। পাকিস্তানের পরে শিখীস্থান, দ্রাবিড়ীস্থানের ধূয়া উঠেছে। ভাষাগত বিভাগ তো হয়েই গিয়েছে—মারাঠী গুজরাটী এক সঙ্গে নয়, তামিল তেলেগু এক সঙ্গে নয়, কানাড়া মারাঠী এক সঙ্গে নয়, অসমীয়া বাঙালী এক সঙ্গে নয়। দেশকে যখন দুভাগে বিভক্ত করা গিয়েছে তখন শতধা বিভক্ত করতে দোষ কি? এখন আবার ভাষা আন্দোলন অন্য আকার ধারণ করেছে (সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই)। তবে যে আকারই ধারণ করুক সমস্ত ব্যাপারটাই কদাকার। রাজনীতির ক্ষেত্রেও দলগত বিভাগ কম বিভ্রান্তিকর নয়। এত অসংখ্য রাজনৈতিক দল পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। কত রকমারি সোস্যালিস্ট, রকমারি মার্ক্সিস্ট; কম্যুনিস্টদের মধ্যেও রকমফের।

কংগ্রেসের উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। এককালে বলা হত, যেখানেই বাঙালী সেখানেই দলাদলি, সেখানেই পাঁঠাবলি। এখন যেখানেই কংগ্রেস সেখানেই একটি dissident কংগ্রেস। আর দেশকে তো কংগ্রেসকর্তারা গোড়াতেই বলি দিয়ে বসে আছেন। তাও কেবল কংগ্রেসেরই দোষ নয়। যে দেশে এত দল সে দেশে দলটাই মুখ্য, দেশটা গৌণ। সর্বত্র ভাগাভাগি দলাদলি। লোকে বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না, আমাদের ভাগের মায়ের গঙ্গাপ্রাপ্তির আর বিলম্ব নেই।

এক ভ্রান্তি বহু ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ফলে সমস্ত দেশ আজ বিভ্রান্ত। ধর্মগত ভিত্তিতে দ্বিজাতি তত্ত্ব মেনে নিয়ে দেশ বিভাগ সম্পন্ন হয়েছে। এখন জোর গলায় বলা হচ্ছে আমরা secular state অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সকল ধর্মের সমান অধিকার। সমান অধিকারের নমুনা—হিন্দু নাগরিকের একাধিক পত্নী নিষিদ্ধ, মুসলমানের চারটি পর্যন্ত আইনসঙ্গত। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা দেশের আইনকেও বিভক্ত করে নিয়েছেন। আইন অবিভাজ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন আইন সম্পূর্ণ বে-আইনী ব্যাপার। সাম্প্রদায়িকতার যে ভেদবুদ্ধি দেশকে দু ভাগ করেছে আইনের দ্বিধা-ভেদ সেই সাম্প্রদায়িকতাকেই আবার নতুন করে প্রশ্রয় দিচ্ছে। আমরা secular রাষ্ট্র—এই কথাটা যে ঘোষণা করতে হচ্ছে,—এটাই একটা লজ্জার কথা। সুসভ্য রাষ্ট্রমাত্রই secular, সেখানে সকল নাগরিকের জন্য একই আইন, একই বিধিনিষেধ, একই সুযোগ সুবিধা। secularism বলতে যদি বোঝায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা তাহলে সেই secular state আমরা চাই না, আমরা চাই একটি civilized state.

এক দেশ ভেঙ্গে যখন দুই দেশ হয় তখন দেশের চাইতে দ্বেষ বড় হয়ে ওঠে। একাংশ অপরাংশের বিদ্বেষের পাত্র হয়। দেশচর্যার স্থান নেয় বিদ্বেষচর্চা। কেউ কারো উন্নতি চায় না বলে কারোই উন্নতি হয় না, দু-এরই অবনতি ঘটে। এখন যেমন হয়েছে, দুটি ভিখারী জাতের জন্ম হয়েছে। দু-এর মুখেই এক কথা—বাঁচবার জন্যে অন্ন দাও, মারবার জন্যে মারণাস্ত্র

দাও। স্বাধীনতার অর্থ যে সর্বাগ্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সে কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। মুখের প্রতিটি গ্রাসের জন্যে যে পরমুখাপেক্ষী তার স্বাধীনতা কোথায়? আসল কথা স্বাধীনতা কথাটাকেই আমরা vulgarize করে নিয়েছি। আমাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হল, যার যা খুশি করবার অধিকার। অবশ্য আমাদের নেতৃবর্গই সর্বপ্রথমে সে অধিকারটির সদ্ব্যবহার করেছেন, দেশকে কেটে দু ভাগ করেছেন। নেতারা পথ দেখিয়েছেন, দেশবাসী তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। মায়ের অঙ্গচ্ছেদ করতে যখন আটকায় নি তখন আর আটকাবে কিসে? সর্বব্যাপারে নিরঙ্কুশ। দেশকে যারা কেটে কুটে ভাগ করতে পারে তারা সব কিছু ভেঙ্গে চুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সাবাড় করতেও পারে। স্বাধীনতার জন্ম মুহূর্তে যে তাণ্ডব শুরু হয়েছিল দেশময় আজও সেই তাণ্ডবই চলছে। কোনো কিছুর প্রতি কারো মায়া নেই। দেশের, জাতির সম্পত্তি কারোই সম্পত্তি নয়। অতএব জ্বালাও, পোড়াও, ভাঙ্গো। সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। স্বাধীনতাও মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিভৎস আকার ধারণ করে। এখন আমাদের দেশের সেই দশা হয়েছে। পৃথিবীতে স্বাধীন দেশ অনেক আছে, কিন্তু এমন অপরিমেয় স্বাধীনতা কোনো দেশের মানুষের নেই। এ এক বিচিত্র দৃশ্য, একে বলে আদেখ্‌লেপনা। দুর্লভ স্বাধীনতা হাতে পেয়ে লোকে যেন গোগ্রাসে গিলতে চাইছে।

এই হচ্ছে ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ আর পাকিস্তান এখনও বুঝতেই পারে নি যে, তার স্বাধীনতা আদবেই হয় নি। ইংরেজের আমলে যে সব অধিকার ছিল এখন তাও নেই, এখন মুখ বুজে সব মেনে নিতে হয়। স্বাধীন মত প্রকাশ নিষিদ্ধ, গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত—ফলে ভারতের মুসলিম সমাজ থেকে সে বিচ্ছিন্ন। ইংরেজ আমলেও বহুসংখ্যকের ভোট দেবার অধিকার ছিল, এখন আট কোটি মানুষের মধ্যে আশি হাজারের ভোটাধিকার আছে অর্থাৎ হাজারে মাত্র একজনের। পরাধীন যুগে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে বা শুনতে কোনো বাধা ছিল না, এখন স্বাধীন হয়ে সে অধিকারটুকুও হারিয়েছে। আমরা যে জিনিস গোগ্রাসে গিলতে গিয়ে কেবলই বিষম খাচ্ছি, পাকিস্তানের

জনসাধারণ সেই স্বাধীনতার ক্ষুদকণাটুকুও পাচ্ছে না। ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান উভয়ে একই পাপের ভুক্তভোগী। এর থেকে নিষ্কৃতি নেই যতদিন না ভারত বিভাগের ক্ষত শুকোবে। ক্ষত শুকোবে সেই দিন যেদিন উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা করবেন। অবশ্য কাটা দেশ আর জোড়া লাগবে না, কিন্তু মন জোড়া লাগতে বাধা কি ? ভাই-এ ভাই-এ না হয় পৃথগন্ন হয়েছে, তাই বলে ভাই পর হয়ে যাবে কেন ?

ভারত ললনা

একদা বাঙালী কবি বলেছিলেন—না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না—এমন খাঁটি কথা খুব কম কবিই বলেছেন। নারী শুধু যে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী এমন নয়, ইংরেজী মতে উত্তমাঙ্গিনী অর্থাৎ কিনা better half। আমাদের ভাষায় উত্তমাঙ্গ বলতে বোঝায় মস্তক। তাহলেই দেখা যাচ্ছে নারীই সমাজের brain বা মস্তিষ্ক। অপরপক্ষে সংখ্যা গণনায়ও যে কোনো দেশেই নারী লোক-সংখ্যার অর্ধেক। অর্থাৎ গুণে যতখানি গুণতিতে ততখানি। অর্ধেক যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে বাকি অর্ধেকও যে ঝিমিয়ে পড়বে তাতে আর সন্দেহ কি ? দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত এই কবিতা বা গানটি লেখা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে —অনুমান ১৮৭৫-৭৬ সালে। এই শত বৎসরে ভারতীয় ললনার জাগরণ কতখানি হয়েছে একটু তার হিসেব-নিকেশ প্রয়োজন।

আমাদের শাস্ত্রে গৃহিণীকেই বলেছে গৃহ। সেই সূত্রমতে নারীসমাজকেই বলব প্রকৃত সমাজ। গৃহে যতখানি গৃহিণীপনার প্রয়োজন সমাজেও ততখানি। নারী যেমন গৃহের শোভা সৌন্দর্য বর্ধন করেন তেমনি সমাজেরও শোভনতা শালীনতা রক্ষা করেন। আমাদের সমাজে আজ সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তাতে মনে হয় না আমাদের ললনারা খুব যথার্থভাবে নারীধর্ম পালন করছেন। এই একশো বছরে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, মেয়েরা অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে মুক্ত হয়েছেন, কিন্তু সমাজ পরিচালনার ভার সেই আগেও যেমন পুরুষের হাতে ছিল এখনও তেমনি আছে। এর ফলে আমাদের সমাজে শোভা সৌষ্ঠব তো দূরের কথা আশানুরূপ ভদ্রতা ভব্যতা শৃঙ্খলাও আসে নি।

পুরুষ স্বভাবধর্মে উচ্ছৃঙ্খল, সে শৃঙ্খলা মানে না। সেখানে নারীকেই

শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়। আমাদের সমাজের সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার ঐ একটি মাত্র কারণ। এখানে পুরুষের পুরুষ হস্তের ছাপ যতখানি নারীর শোভন হস্তের ছাপ ততখানি নেই। আমাদের সমাজে বহুকাল পুরুষের একাধিপত্য চলেছে। পুরুষ মানুষ অমনিতেই হুড়মুড় দুড়-দাড় করে কাজ করে, কাজের কোনো শ্রী ছাঁদ নেই। মেয়েদের হাত পড়লে এরই মধ্যে একটু সুষমা দেখা দেয়। নইলে শ্রীহস্ত বলবে কেন? তাছাড়া, কাজ তো পরের কথা, মেয়েদের উপস্থিতিই চতুষ্পার্শ্বকে শ্রীমণ্ডিত করে। একবার ভেবে দেখুন, যে দেশের রাস্তায় ঘাটে স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ মেলে না, যেখানে ইস্কুলে কলেজে মেয়েরা নেই, আপিসে নারী কর্মী নেই, যেখানে উৎসবে ব্যসনে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ সে দেশকে মরুভূমি বলব না তো কাকে বলব। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, নারীহীন সমাজে আমাদের জন্ম হয়েছিল সে বড় দুঃখের কথা। সে সমাজ জীবনের অনেকখানি শোভা সৌন্দর্য রস থেকে বঞ্চিত। মেয়েদের উপস্থিতি শুধু যে লাবণ্য বিস্তার করে এমন নয়, সমাজের রুচি গঠনে শিষ্টাচার পালনে সহায়তা করে। যেখানে শুধু ছেলেদের মেলা সেখানে ব্যবহারে সব সময় সংযমের বাঁধ থাকে না। কিন্তু যেই মাত্র সেখানে একটি মেয়ে দেখা দিল অমনি অনাবশ্যক উচ্চ কণ্ঠ আপনি মৃদু হয়ে আসবে, ব্যবহার সংযত হবে। এই জন্যেই বলছিলাম যে, মেয়েদের উপস্থিতি সমাজে ডিসিপ্লিনের কাজ করে। সভ্য মানুষ মাত্রেরই মেয়েদের প্রতি একটা সমীহভাব থাকে। মেয়েদের সামনে সে কখনো যদৃচ্ছ ব্যবহার করে না। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে যে, ডিসিপ্লিন জিনিসটা মানুষের সৌন্দর্য বোধ জাত। যেখানে grace বা লাবণ্য সেখানেই ডিসিপ্লিন, এজন্য অসংযত ব্যবহারকে আমরা বলি graceless বা অশোভন ব্যবহার। আর ঐ যে সমীহ কথাটা বলেছি ওটা কিছু অত্যুক্তি নয়। সুবিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাসে Tristram Shandy-র একটি উক্তি এই সূত্রে বিশেষ করে মনে পড়ছে, নায়ক Shandy বলছেন—

That female nicety, madam and inward cleaniness of mind and fancy in your sex, which makes you so much

the awe of ours.' এখনে awe শব্দটি লক্ষ্য করবার মতো, একেই আমি সমীহ ভাব বলেছি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ কথা বলা হয়েছে ইংল্যাণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ সম্বন্ধে, তখন আমাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার কথা ভাবাই যেত না। আমাদের দেশে ব্রাহ্ম-সমাজই সর্বপ্রথম এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার মধ্য দিয়ে একটি অত্যন্ত সুন্দর এবং রুচিপূর্ণ আবহাওয়া তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে তাঁরা সমাজে যে পরিবর্তন এনেছিলেন তাকে বিপ্লবাত্মক বলা যেতে পারে। পূর্বোক্ত গানটির রচয়িতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সে যুগে ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শুধু যে স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারেই অগ্রণী ছিলেন এমন নয় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও পুরোভাগে ছিলেন। পূর্বোক্ত কবিতাটিতে ভারতের জাগরণ বলতে তিনি প্রধানতঃ দেশের স্বাধীনতার কথাই ভেবেছেন।

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। এখন দেখতে হবে স্বাধীনতা এবং জাগরণ এক জিনিস কিনা। স্বাধীনতা লাভের বিশ বৎসর পরে দেশের যে অবস্থা আজ দেখছি তাতে মনে হয় না দেশে সত্যিকারের জাগরণ এসেছে—না পুরুষের সমাজে না মেয়েদের। দেশময় ছেলেরা যে ব্যবহার করছে—চেঁচিয়ে ঘেঁচিয়ে ভেঙেচুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব তছ্‌নছ্‌ করছে—তাতে মনে হয় না এটা সজাগ মানুষের ব্যবহার। বরং ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরলে মানুষ যেমনটা করে এটা অনেকটা সে রকম ব্যাপার—ইংরেজীতে যাকে বলে nightmarish ব্যবহার। আর যাই হোক এটা সুস্থ মানুষের ব্যবহার নয়। আর মেয়েরা? তা, এই সেদিন যাঁরা অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন তাঁরা যখন আজ মন্ত্রী পর্যায় থেকে সমাজের নানাস্তরে জাঁকিয়ে বসেছেন তখন তাঁরা জাগেন নি এমন কথা বলা সাজে না। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে এঁরা জেগে ঘুমোচ্ছেন। এটা আরও সাংঘাতিক। ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো যায় কিন্তু জেগেও যে ঘুমোয় তাকে জাগাবে কে? আমাদের মেয়েরা যে জেগে ঘুমোচ্ছেন তার প্রমাণ, বহু-সংখ্যক মহিলা এখন শিক্ষায় দীক্ষায় পুরুষের সমান, কিন্তু দেশের চেহারা দেখলে মনে হয় না তাঁরা সমাজে কিছু

মাত্র প্রভাব বিস্তার করেছেন। সমাজে যে সব অনাচার চলছে তাঁরা সক্রিয়ভাবে তার প্রতিরোধ করছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। সুসভ্য দেশে নারী সমাজই প্রকৃত Vigilance Committee-র কাজ করে। পুরুষ সমাজ কোথাও একটা autonomous body নয়, তারা অনেকাংশে নারীসমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ প্রত্যেকটি পুরুষই মায়ের সন্তান, ভগ্নীর ভ্রাতা, পত্নীর পতি। কিন্তু আমাদের চোরাকারবারী যখন সাততলা বাড়ি ফেঁদে বসে, দামী গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়, মা কি কখনো জিগগ্যেস করেন, অত টাকা তোর কোত্থেকে আসছে? কালোবাজারীর স্ত্রী কখনো বলেছেন, ও কালো মুখ আর দেখব না? অধার্মিক স্বামীর পত্নীকেও সহধর্মিণী হতে হবে এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে বলেছে? কোনো ঘুষ খোরের স্ত্রীকে কি বলতে শুনেছেন, 'আমি ঘুষের টাকায় কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।' ভেজালের ব্যবসা করে যে ব্যক্তি মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা করছে তার পত্নীকেও কি পতিপরায়ণা হতে হবে? আমাদের দেশে এখন বিবাহবিচ্ছেদ প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় কোনো স্ত্রীকে বলতে শুনি নি, অসাধু ব্যবসায়ীর ঘর করব না।

বাঙালীকে বলা হয়েছে আত্মবিস্মৃত জাতি। কিন্তু আমাদের স্ত্রীজাতির ন্যায় আত্মবিস্মৃত জাতি পৃথিবীতে আর নেই। আমাদের দেশে বিশেষ করে বাঙলা দেশে নারীকে শক্তিরূপিণী হিসেবে পূজো করা হয়েছে। অথচ আমাদের ভাষায় কি করে 'অবলা' শব্দের উৎপত্তি হল সে আমি ভেবে পাই নে। এর একমাত্র কারণ আমাদের বহুবলধারিণীরা নিজেরাই নিজেদের অবলা করে রেখেছেন। আরও মুস্কিল হয়েছে যে, হঠাৎ যখন এঁরা সবলা সাজতে যান তখন আবার মাত্রাজ্ঞান থাকে না। শক্তির প্রকাশ কোথায় এবং কি ভাবে করতে হবে সেটা ঠিক ভেবে দেখেন না।

দেশব্যাপী আজ বিক্ষোভ। সে বিক্ষোভ সরকারের বিরুদ্ধে, মালিকের বিরুদ্ধে নানা প্রকার সুবিধা আদায়ের জন্যে। কিন্তু চোরাকারবার, ভেজালের কারবার, ঘুষ, তহবিল তছরূপ—এসব সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়েছে এমন তো কই শুনি নি। সরকারের বিরুদ্ধে

মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কারণ নেই এমন কথা কেউ বলবে না। পুরুষ মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করতে জানে না। সে যা করে তাই উৎকটভাবে করে অর্থাৎ তার ক্ষোভ বিক্ষোভের আকার ধারণ করে। বিসদৃশভাবে ক্ষোভ প্রকাশের নামই বিক্ষোভ। আমাদের মেয়েরা এখন বিক্ষোভ মিছিলের পুরোভাগে। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভে ছাত্রীরাও যোগ দিয়েছেন। ছাত্রীরা কি বলতে পারতেন না, আমাদের ক্ষোভ অবশ্যই আমরা প্রকাশ করব, কিন্তু সেটা বিনম্রভাবেই করা যাবে। আর কিছু নয়, যাঁদের আমরা ঘরোয়া আবহাওয়ায় দেখে অভ্যস্ত ঘেরাও থেকে তাঁরা যদি দূরে থাকতেন তাহলে শুধু ভারত ললনার নয়, ভারতীয় জীবনের শ্রীসৌন্দর্য অনেকখানি বজায় থাকত।

আমরা যে আমদের মেয়েদের নামের সঙ্গে দেবী পদবী যোগ করে থাকি সেটা ভক্তি-জ্ঞাপক নয়, শক্তি-জ্ঞাপক। দেবতাসদৃশ শক্তি আছে বলেই দেবী আখ্যা। এমন কি নারীচরিত্র সম্বন্ধে যে বলা হয়েছে, দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ তার মধ্যে খানিকটা ব্যঙ্গ মিশ্রিত থাকলেও একটা ভীতির ভাবও এর মধ্যে নিহিত আছে। দেবতারাই এঁদের সঙ্গে পেরে ওঠেন না, পুরুষ তো কোন্ ছার। নারীর এই শক্তির কথা পুরুষরা খুব ভাল করেই জানে, দুঃখের বিষয় মেয়েরা নিজেরাই জানেন না। জানলে সমাজের চেহারা তাঁরা বিলকুল পালটে দিতে পারতেন।

মেয়েদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ কৌতুক করে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। কবি সাহিত্যিকদের ওটা স্বভাব। ইংরেজ কবি এ. ই. হাউসম্যান একটি কবিতায় বলেছেন—

When Adam of the apple ate
He had no friend to keep him straight.
God to a wife ! 'twas hopeless odds.
Friends are a deal more help than gods

তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি লক্ষ্য করে দেখুন—স্ত্রীর সঙ্গে পাল্লা দেবেন ভগবান ! তবেই হয়েছে। স্ত্রীর হাত থেকে স্বামীকে রক্ষা করা ভগবানেরও সাধ্যের

অতীত। রক্ষা করতে পারে কে? না, তেমন যদি বন্ধু থাকে। এই যে কথাটি এটি ভয়ঙ্কর আপত্তিকর। স্ত্রী কি বন্ধু নয়, তার চাইতে বড় বন্ধু আর কে? বিপদে আপদে তিনিই রক্ষাকর্ত্রী, পরামর্শদাত্রী। আমাদের মহাকবি স্ত্রীকে শুধু গৃহিণী বলেই ক্ষান্ত হন নি, বলেছেন সচিব—গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ। পুরুষ অনেক সময় মূর্খের মত কাজ করে; পত্নীরূপিণী মুখ্য সচিব যদি রক্ষা না করেন, মূর্খ পুরুষকে তবে কে রক্ষা করবে?



ব্ল্যাসফেমি

সাহিত্য বিষয়ক কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই আধুনিক সাহিত্যের রীতি-প্রকৃতি নিয়ে কথা ওঠে। এ বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, এখনও বলা হচ্ছে এবং আরো বলা হবে। এর কারণ চলতি বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত কেউ দিতে পারেন না, দিতে চানও না। বলা বাহুল্য, চূড়ান্ত মতামত দেবার অধিকার সাধারণ মানুষদের নেই, সে অধিকার পণ্ডিতদের এবং বিশেষজ্ঞদের। মুশকিল হয়েছে যে, আজকের ব্যাপার সম্পর্কে অর্থাৎ অর্বাচীন বিষয়ের প্রতি পণ্ডিত ব্যক্তিদের আগ্রহ নেই, তাঁদের ঝোঁক প্রাচীনের প্রতি। যতক্ষণ কোনো জিনিসের ধড়ে প্রাণ আছে ততক্ষণ তার প্রতি তাঁরা উদাসীন। এঁরা পোস্ট মর্টেমে বিশ্বাসী। পাণ্ডিত্য জিনিসটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভূতগ্রস্ত। কালের ব্যবধানে যা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে তার ওপরে তাঁরা আলোকপাত করবার চেষ্টা করেন। অবশ্য সে আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হয় কি ঘনীভূত হয়, সেটা বিবেচনাসাপেক্ষ। পরীক্ষার্থী ছাত্রদের যদি বা কোনো কাজে লাগে, রসগ্রাহী—সাধারণ পাঠকের খুব কাজে লাগে বলে মনে হয় না।

আধুনিক সাহিত্যের স্বভাবধর্ম সম্পর্কে আধুনিক লেখকরাই নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে আগ্রহী। নিজ নিজ ব্যবসায় সম্পর্কে সকলকেই ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। ব্যবসায়ী মাত্রই নিজ নিজ সামগ্রীর চাহিদা সম্পর্কে যতখানি সজ্ঞান, সাহিত্য ব্যবসায়ীও ঠিক ততখানি। উন্নত দেশ মাত্রেই পাঠকের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। অল্পসংখ্যকের জন্যে যখন লেখা হত তখন লাভক্ষতির প্রশ্ন অর্থাৎ ব্যবসায়ের প্রশ্নটা বড় ছিল না। তখন কাব্য সাহিত্য রচনা অনেকটা শখের ব্যাপার ছিল; লেখকরা হয় রসিকজনকে আনন্দ দেবার জন্যে লিখতেন, না-হয় তো নির্বোধজনকে জ্ঞানবৃদ্ধি দেবার

জন্যে লিখতেন। এখন সাহিত্যিকরা বুঝে নিয়েছেন যে, সকল রকম জ্ঞানবুদ্ধি রসের মধ্যেই নিহিত আছে। যাকে আমরা নির্বোধ মনে করি, সে আসলে রসজ্ঞানহীন ব্যক্তি। আজকের লেখকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, আজকের মানুষের মনকে জানা এবং চেনা। লেখার আবেদন পাঠকের মনে পৌঁছে দিতে হয়—এরই নাম চাহিদা মেটানো। চাহিদা মেটাতে হবে তার অর্থ এই নয় যে, পাঠকের মন রেখে তাঁরা কথা বলবেন। মন জেনে কথা বলতে হবে। মন জানা আর মন রাখা এক কথা নয়। আজকের মানুষের মনকে জেনে বুঝে যিনি লিখছেন তিনিই আধুনিক লেখক। যিনি না জেনে না চিনে না বুঝে লিখছেন তিনি আজকের হয়েও আজকের নন।

মানুষের জীবনকথা নিয়ে সাহিত্য; কাজেই মানুষের স্বভাবে আর সাহিত্যের স্বভাবে মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যেমন আকৃতি এবং প্রকৃতি বদলায়, সাহিত্যেরও তেমনি। কালের গতিতে সমগ্র সমাজের Physical aspect-এ বিরাট পরিবর্তন এসেছে। একমাত্র লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুনই দেশের, সমাজের চেহারা আশ্চর্যরকম বদলে গিয়েছে। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেও রাস্তায় ঘাটে যানবাহনে এমন অসম্ভবরকম ভিড় আমরা দেখি নি। এমন ঘেঁষাঘেঁষি ধাক্কাধাক্কি করে পথ চলতে হত না, ট্রামে-বাসে এমন ঝুলতে ঝুলতে মানুষ চলত না। এমন হইচই চেঁচামেচি মানুষ আগে শোনে নি। গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ, এঞ্জিনের শব্দ, কল-কারখানার শব্দ, মাইকের কর্ণবিদারক ধ্বনি—এতটা আগে কে শুনেছে? এই যে ঘেঁষাঘেঁষি ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি, তাতেই মানুষের মন মেজাজ খিঁচড়ে থাকে। এর উপরে নিত্যদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব—তাতে মানুষের চিত্ত আরো তিক্ত হয়ে আছে। সমগ্র সমাজের চেহারাটি এবার কল্পনা করুন—তার কপালে ভ্রূকুটি, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে বক্রোক্তি। এক জেনারেশন আগের সমাজে আর আজকের সমাজে যে আকৃতিগত পার্থক্য সেটি তার প্রকৃতিকেও প্রভাবিত করেছে, করতে বাধ্য। মনে রাখা কর্তব্য যে, Angry Youngmen-রা কেবল পশ্চিম দেশেই বাস করে না,

সকল দেশেই আছে। অবশ্য মন মেজাজ খারাপ থাকার দরুন যে স্নেহ প্রেম দয়া মায়া দাক্ষিণ্য সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়েছে এমন নয়। তবে এ কথা নিশ্চিত, এই সব কোমল প্রবৃত্তির চর্চার অবকাশ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। দাম্পত্য প্রেম এককালে যতখানি টেঁকসই ছিল, এখন আর ততখানি নয়, এখন তার পরমায়ু অনেক হ্রাস পেয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই চাকরি করতে হয়; টানাটানির সংসারে একের প্রতি অন্যের টান বেশি দিন থাকে না। যে স্ত্রী একদিন ছিলেন পতি-অন্ত প্রাণ, তিনি এখন চাকুরি-অন্ত প্রাণ। সন্তানরা বড় হয়েই বুঝতে পারে, পিতামাতার সম্পর্কটা একেবারে নিঃস্বার্থ নয়। স্বার্থগন্ধ প্রবেশ করলে নিকষিত হেমও কলুষিত হয়ে যায়। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে খিটিমিটি লেগেই থাকে। এটি ছেলেপেলের মনে অজ্ঞাতসারে কাজ করতে থাকে। ক্রমে পিতামাতা এবং পুত্রকন্যাদের সম্পর্কটাও ঢিলে হয়ে আসে। সকল রকম সম্পর্কের মধ্যেই একটা শিথিলতা এসেছে। আজকের যুবকদের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ কম, কাউকেই তারা আপনজন বলে মনে করে না। এ কথা নিশ্চিত যে, আগে যতটা মনের আদানপ্রদান ছিল, এখন ততটা নেই। এত হইচই ঘেঁষাঘেষির মধ্যেও মানুষ কতকটা যেন নিঃসঙ্গ। স্বামী-স্ত্রীতে, পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে ভাইয়ে, ভাই-বোনে, বন্ধুতে বন্ধুতে, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে যে সম্পর্ক, তারই উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য এই সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। সম্পর্কগুলোর বাঁধন ঢিলে হয়ে যাওয়ার দরুন সমস্ত সমাজেরই বাঁধন আলগা হয়ে গিয়েছে। আজকের সাহিত্য ঐ বাঁধনছেঁড়া সমাজের চিত্র অর্থাৎ disintegration-এর চিত্র। পাশ্চাত্ত্য সমাজে এর উপরে আছে যুদ্ধের করাল ছায়া। জীবন অনিশ্চিত, আজ আছে তো কাল নেই। প্রত্যেকে জানে, কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। প্রত্যেকটি মানুষ ভয়ঙ্কর রকম একলা। আমাদের দেশে আর্থিক দুর্গতি অনুরূপ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। আজকের মানুষের মনে দুটি জিনিসের ক্রিয়া সর্বাধিক—একটি anger, অপরটি anxiety। সাহিত্য মেজাজের সৃষ্টি, সেটাকে মোটামুটি খোশমেজাজ বলা যেতে পারে। এখন ভয়ে ভাবনায় রাগে বিরাগে মানুষের

মেজাজ যদি যায় বিগড়ে তা হলে সাহিত্যের মেজাজও যাবে বদলে। বেশির ভাগ মানুষ এখন বদ মেজাজী, ফলে সাহিত্যও তাই। সাহিত্যের চেহারাই বদলে যাচ্ছে। এখন সেও কুঞ্চিতভ্রূ, রক্তচক্ষু, রূঢ়ভাষী।

উপরে যে সব সম্পর্কের কথা বলেছি, সামাজিক জীবনে যেমন এর মূল্য, ব্যক্তিগত জীবনেও তেমনি। এসব গ্রন্থি শিথিল হওয়ার দরুন প্রত্যেকটি ব্যক্তি আজ নড়বড়ে—একে অন্যের থেকে আলাদা এবং আলাদা বলেই নিঃসহায়। নিঃসহায় মানুষ কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। প্রত্যাশা করবার স্থান নেই, জন নেই বলেই তার আত্মিয়তাবোধও নেই। সে যেমন অপরের কাছে আমল পায় না, সে নিজেও কাউকে আমল দেয় না—এর ফলে জীবন সম্বন্ধে তার কোনো আত্মরেপনা নেই। এটা এক দিকে ভাল—আগের দিনের মানুষের চাইতে সে ঢের বেশি শক্ত। তাকে বাধ্য হয়ে শক্ত হতে হয়েছে। আগেকার মানুষ যা নিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, এখনকার মানুষ তা হেসে উড়িয়ে দেয়। এটা দোষের কথা না হলেও এই যে নিঃসম্পর্ক অবস্থা এরও প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। মমতাহীন মানুষ ক্রমেই আরো বেশি নির্মম হয়ে উঠছে। সাহিত্যেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সাহিত্য মানুষে মানুষে সাহচর্য বা নৈকট্য স্থাপন করে। অর্থাৎ মানবিক সম্পর্কগুলোকে দৃঢ়তর করে, কিন্তু যেখানে সে সম্পর্কের বন্ধন আলগা হয়ে এসেছে সেখানে সাহিত্য একে অন্যকে নিকটে টানে না, দুইয়ের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে। সামাজিক সম্পর্কগুলির মস্ত বড় একটা মূল্য আছে, সে কথা আগেই বলেছি। যে জিনিস মূল্যবান তার একটা sanctity আছে, মানমর্যাদা আছে—সেই মানমর্যাদার অবমাননাকে ইংরেজীতে বলে blasphemy। সেদিন যখন এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন আমি বলেছিলাম যে, সাম্প্রতিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যদি এক কথায় প্রকাশ করতে হয়, তবে বলব, আধুনিক সাহিত্যের আচরণ প্রধানত blasphemous। যুগ পরিবর্তন মাত্রই মূল্যবোধের পরিবর্তন। এক যুগের মূল্যবান জিনিস অপর যুগে মূল্যহীন হয়ে যায়, আবার মূল্যহীন জিনিস মূল্য

লাভ করে। এই দুই-ই ব্ল্যাসফেমির অন্তর্গত। স্নেহ প্রেম করুণা ইত্যাদি যেসব মানবিক হৃদয়বৃত্তির এককালে যথেষ্ট মর্যাদা ছিল, ইদানীং কালের কাব্যে সাহিত্যে তা উপহাসের বস্তু হয়ে উঠেছে। অতিশয় স্পর্শকাতর সম্পর্কগুলির প্রতিও অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করা হচ্ছে। আজ-কালের গল্প-উপন্যাসে দেখা যায়, পিতা-মাতার সম্পর্কে পুত্র-কন্যার মনোভাব আদৌ সম্মানসূচক নয়। পিতা-পুত্রের মধ্যে মতবিরোধ কিংবা বৈরীভাব থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু কথায় এবং আচরণে অবজ্ঞা বা অমর্যাদা প্রকাশ করা খুব স্বাভাবিক নয়। অথচ এ-জাতীয় জিনিস আজ-কাল গল্প-উপন্যাসের পাতায় হামেশাই দেখা যায়। "দরজা খুলেই দেখলাম শ্রীমতী অনসূয়া দেবী দাঁড়িয়ে, যাঁর একমাত্র দাবি হল তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। ভগবান জানে, কিসের দাবি এবং কে সেই দিব্যি দিয়েছিল—" কিংবা ডাক্তারকে "অনসূয়া দেবীর স্বামী সম্পর্কে একটা খবর দেবার ছিল"—ইত্যাদি কথার মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রচ্ছন্ন নয়, সুস্পষ্ট। ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্কেও অনুরূপ অবজ্ঞা-সূচক উক্তি যথেষ্ট দেখা যায়। ভারতীয় শিষ্টাচারমতে এসব উক্তি আপত্তিকর মনে হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে একে ঠিক শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলা চলে না। সমাজ এবং সাহিত্য হাত ধরাধরি করে চলে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে একটু তফাত আছে। সামাজিক মানুষকে বহু মানুষের মন জুগিয়ে চলতে হয়, এজন্য তার ব্যবহার সব সময়েই একটু আড়ষ্ট। সাহিত্যিক মানুষ কারো মন জুগিয়ে চলেন না; তিনি একমাত্র রসের দাবিকে মেনে চলেন। সমাজের দাবির চাইতে রসের দাবি অধিকতর বিস্তীর্ণ। কাজেই সাহিত্যিককে একটু স্বাধীনতা দিতেই হয়।

পৃথিবীর সাত সমুদ্রের জল যেমন একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত, প্রধান প্রধান সাহিত্যের স্রোতও তেমনি একে অন্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। উপরে যে কথার উল্লেখ করেছি তার খানিকটা অবশ্যই বিদেশের আমদানি। সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্কগুলি নিয়ে তির্যক উক্তি বিদেশী সাহিত্যে যত্রতত্র দেখা যায়—শুধু গল্প-উপন্যাসে নয়, অন্যবিধ গ্রন্থেও। এ যুগের সব চাইতে নামজাদা লেখক জাঁ পল সাত্র্ তাঁর আত্মচরিত লিখেছেন। তাতে বলেছেন—

"For want of more precise information, nobody, beginning with me, knew why the hell I had been born."

পূর্বোল্লিখিত অনসূয়া দেবীর পুত্রের উক্তিতে আর সাত্রে´র উক্তিতে কিছুমাত্র তফাত নেই। উক্ত গ্রন্থ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি, তাতে সাত্র´-পরিবারের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যাবে। ঠাকুরদা-ঠাকুরমা থেকে শুরু করে বাপ-খুড়ো, মা-পিসী সকলেরই উল্লেখ এখানে আছে ঃ

"............a country doctor married the daughter of a rich landowner from Perigord and settled down with her on the dreary mainstreet of Thiviers. The day after the wedding, it was discovered that the father-in-law did not have a penny. Dr. Sartre, outraged, did not speak a word to his wife for forty years. At the table he expressed himself by signs ; she ended by referring to him as 'my boarder.' Yet he shared her bed and, from time to time, made her pregnant. She gave him two sons and a daughter ; these children of silence were named Jean-Baptiste, Joseph and Helene. Helene married a cavalry officer who went mad. Joseph did his military service in the Zouaves and retired at an early age. He had no occupation. Caught between the stubborn silence of one parent and the shouting of the other, he developed a stammer and spent his life fighting words. Jean-Baptiste wanted to prepare for the Naval Academy, to see the ocean. In 1904 the young naval officer, who was already wasting away with the fevers of Cochin-China, made the acquaintance of Anne Marie Schweitzer, took possession of

the big, forlorn girl, married her, begot a child in quick time, me, and sought refuge in death." এই বর্ণনা পাঠ করে অনেকেরই মনে হতে পারে যে, এর মধ্যে বাপ-ঠাকুরদা এবং অন্যান্য গুরুজনদের মর্যাদা রক্ষা করে কথা বলা হয় নি। অথচ সাহিত্যের অমর্যাদা হয়েছে, এমন কথা বলা কঠিন। একে খাঁটি সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো রসিক পাঠকই বোধ করি আপত্তি করবেন না। এমন কথাও বলেছেন যে, আমার যদি একটি বোন থাকত, then I would be her lover. বলেছেন, I liked incest if it remained platonic. বাস্তবিকপক্ষে, তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থে তিনি ভ্রাতা-ভগিনীর প্রেমকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন (The Flies ; The paths of Freedom ; Altona প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। কোনো কোনো পাঠকের কাছে এসব আপত্তিকর মনে হতে পারে ; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজের চাইতে সাহিত্য অধিকতর উদার। সামাজিক ব্যবহার অনেক সময় আর্টের দাবিকে উপেক্ষা করে, সাহিত্য তা করতে পারে না। সমাজের চোখে যা নিন্দনীয়, আর্টিস্টের হাতে তা-ও আর্টে পরিণত হতে পারে। আধুনিক সাহিত্য ব্ল্যাসফেমিকে নিঃসন্দেহে আর্টের পর্যায়ে এনে দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে শ্লীলতা-অশ্লীলতা কিংবা নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে না। তবে সমাজের সঙ্গে সাহিত্যে যতটা সাযুজ্য রক্ষা করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পশ্চিমী সমাজে যে আচার-ব্যবহার চালু হয়েছে, আমাদের সমাজে তা এসে পৌঁছতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। কাজেই কোনো পশ্চিম দেশীয়ের মুখে যে কথা অসঙ্গত ঠেকে না, আমাদের মুখে তা অসঙ্গত শোনাতে পারে। কচি ছেলের মুখে পাকা বুড়োটে কথা যেমন অশোভন, এ-ও তেমনি। সাহিত্যে পাকামির স্থান নেই।

ব্ল্যাসফেমি কথাটাকে সাধারণত নিন্দাসূচক অর্থেই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু জিনিসটা মূলত নিন্দনীয় নয়। ব্যাপারটার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। ব্ল্যাসফেমি এ যুগের সৃষ্টি নয়, প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে। সাধারণ অর্থে, কোনো সর্বজনমান্য, সর্বজনগ্রাহ্য

বিষয় সম্পর্কে উপেক্ষা প্রদর্শন কিংবা সে বিষয়ে মর্যাদাহানিকর উক্তিকেই ব্ল্যাসফেমি বলা চলে। অবশ্য আদি যুগে প্রধানত প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতাকেই ব্ল্যাসফেমি আখ্যা দেওয়া হত। সমাজের চোখে এটি গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য ছিল এবং সে-জন্যে কঠোর দণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। ইহুদীদের আদি গুরু মোজেস-এর নির্দেশমতে এদের শাস্তি ছিল death by stoning। রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানও (৪৮৩—৫৬৫) এদের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে রেস্টোরেশন যুগ অবধি এদের বিচার হত ধর্মীয় আদালতে (Ecclesiastical Court); পরে এসব অপরাধ সাধারণ আদালতের এলাকায় আসে। এককালে বহু লোককে এই অপরাধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। পরবর্তী কালে দণ্ড হ্রাস করে এদেরকে সদর রাস্তায় সর্বসমক্ষে 'পিলোরি'তে (Pillory) আটক রাখা হত। মধ্য যুগে এবং তার পরেও যাঁরা খ্রীষ্টীয় মতবিরোধী নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরও বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণও গিয়েছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার খুব বেশি দিনের কথা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও শেলীকে স্বাধীন মতামতের জন্য অক্সফোর্ড থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। বলতে গেলে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ধর্মজীবনে এবং সামাজিক জীবনে মানুষ স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার লাভ করেছে। উপযুক্ত ইতিহাস থেকেই প্রমাণিত হবে যে, প্রাচীন সমাজের বহু অন্ধ সংস্কার এবং বিশ্বাস ব্ল্যাসফেমির আঘাতেই দূরীভূত হয়েছে। সেকালের যাঁরা মনীষী, তাঁদের স্বাধীন চিন্তা প্রধানত ব্ল্যাসফেমিরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। আদিম সমাজকে এঁরাই সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করেছেন এবং তা করতে গিয়ে প্রাণও দিয়েছেন। আজকের সমাজে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার বহুল পরিমাণে বেড়েছে। তথাপি এখনও সে অল্পবিস্তর গঞ্জনা সইতে না হয় এমন নয়। এদিক থেকে এ যুগের ব্ল্যাসফেমাররাও যৎকিঞ্চিৎ বীরত্বের অধিকারী।

আজকের দিনে ধর্ম এমনিতেই ওষ্ঠাগতপ্রাণ। যাঁরা বীরপুরুষ তাঁরা

অযথা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারতে চান না। এখন ধর্ম যে পরিমাণে নির্জীব, সমাজ সে পরিমাণে সজীব। আঘাত যদি করতে হয় তো সমাজকেই করা উচিত। আজকে যাঁরা দেশে দেশে স্বাধীন চিন্তার অধিনায়ক, তাঁরা ধর্ম ছেড়ে অর্থনীতি এবং রাজনীতির মাধ্যমে নিজ নিজ সমাজ পুনর্গঠনে নিযুক্ত। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এককালে সমাজপতিরা নানা অলিখিত আইনের দ্বারা সমাজকে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন। এখন সেই বাঁধন ছেঁড়ার সাধন চলছে। আগেই বলেছি, সামাজিক সম্পর্কগুলোকে ঢিলে করে দিয়ে সেই বাঁধনকে আল্‌গা করা হচ্ছে। তা-ও সেখানেই ক্ষান্ত নয়, এখন ব্ল্যাসফেমি এমন সর্বব্যাপী যে, সংসারে কোনো জিনিসই আর Sacrosanct নয়, অর্থাৎ পার্থিব কোনো জিনিসেরই অপার্থিব কোনো মহিমা নেই; অতএব সমীহ করবারও প্রয়োজন নেই। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, প্রচলিত মতের বিরোধিতা করলেই ব্ল্যাসফেমি হয় না। বিরোধিতা যখন আর্টে পরিণত হয়, তখনই তাকে ব্ল্যাসফেমি বলা চলে। রাজনৈতিক জীবনে—রাজশক্তি কিংবা শাসকগোষ্ঠীর যাঁরা বিরোধিতা করেন, তাঁরা অবশ্যই বীরপুরুষ, কিন্তু তাঁরা ব্ল্যাসফেমার নন; কারণ, এঁরা সম্মুখসমরে অবতীর্ণ। এঁরা বীর-চূড়ামণি বীরবাহু হতে পারেন, কিন্তু মেঘনাদের মতো (ইন্দ্রজিতের মতোও বলতে পারেন) এঁরা আর্টিস্ট নন। মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে থেকে লড়াই করতেন। আর্টের মধ্যে খানিকটা অন্তরাল থাকতে বাধ্য। পলিটিক্সের বিরোধিতা অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ইঙ্গিতের অভাবে জিনিসটা স্থূল। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অনেকেই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আর্টের পরিচয় দেন নি। পলিটিক্সে ব্ল্যাসফেমির স্থান সঙ্কীর্ণ; গলাবাজি যতখানি কলাকুশলতা ততখানি নয়। এলিজাবেথের যুগে যাঁরা রাজশক্তির বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা বীরত্ব দেখিয়েছেন, এমন কি, প্রাণও দিয়েছেন। কিন্তু শেক্সপীয়ার যে বলেছিলেন—There's such divinity doth hedge a King—এটি সে যুগের একটি অত্যুৎকৃষ্ট ব্ল্যাসফেমির দৃষ্টান্ত। শেক্সপীয়ার রাজশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু রাজাকে দৈবী মহিমা দিতে প্রস্তুত

ছিলেন না। সেটি প্রচ্ছন্ন পরিহাসের সুরে অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, যার মুখে ঐ বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে, সে খাঁটি রাজা নয়, জবরদখল করে সিংহাসনে বসেছে। তার মুখে কথাটা আরো বেশি হাস্যকর শোনাচ্ছে।

সব দেশেরই অলঙ্কারশাস্ত্রে Sarcasm এবং Irony একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। Sarcasm একটু উগ্র আকার ধারণ করলেই blasphemy-তে পরিণত হয়। sarcasm লোকে উপভোগ করে, কিন্তু blasphemy এমনি পিলে-চমকানো ব্যাপার যে, সে জিনিস লোকে উপভোগ করবার অবকাশ পায় না, শোনবামাত্রই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে ব্ল্যাসফেমিই প্রধান অলঙ্কার। এই কারণেই আধুনিক সাহিত্য এত (controversial) পাঠকসমাজ এখনও এতে ঠিক অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। কোনো কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে যে অত্যন্ত বিরূপ আলোড়ন দেখা দেয়, তার মূলে লেখকের blasphemous বাক্যভঙ্গি। বলা বাহুল্য, বাক্যভঙ্গি মনোভঙ্গিরই বাহ্যিক প্রকাশ। ব্ল্যাসফেমি অর্থাৎ প্রকারান্তরে সবকিছুকে উড়িয়ে দেওয়া এ যুগের ধর্ম। এটিকে মেনে নিতে হবে। আমাদের দেশে পাঠক সমাজের পিলে এখনও অত্যন্ত দুর্বল। অভ্যাসে এর পরিবর্তন হবে। দেখে দেখে, শুনে শুনে, পড়ে পড়ে পিলে যখন সবল হবে, তখন এরও রস তাঁরা উপভোগ করবেন। তখন আর আপত্তি শোনা যাবে না। সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি। তাতে কার মান গেল কিংবা প্রাণ গেল, সেটা বড় কথা নয়। রস হচ্ছে সেই জিনিস, যার জন্যে মানী সঁপিয়াছে মান, ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ। সর্বাগ্রে রস, সব শেষেও রস। এর জন্যে ধন প্রাণ মান সমস্তই বলি দেওয়া যেতে পারে।

সিনিক

আমার লেখা ব্ল্যাসফেমি নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পরে একাধিক ব্যক্তি রাস্তায় দেখা হতেই আমাকে বলেছেন, আপনার ব্ল্যাসফেমি পড়লুম। বুঝতেই পারছেন, শুনে আমার খুব হাসি পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, কথাটা তাঁরা সরল চিত্তেই বলেছেন ; কিন্তু এর যে তাৎপর্য অন্য রকম হতে পারে সে কথা তাঁরা খেয়াল করেন নি। ব্ল্যাসফেমি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা এক আর লেখায়, কাজে ব্ল্যাসফেমি প্রকাশ করা সম্পূর্ণ আর। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমার লেখা ঘেঁটে দেখলে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে blasphemous উক্তি পাওয়া যাবে। আর এ কথাও সত্য যে, আমি তার জন্য লজ্জিত বা অনুতপ্ত নই। কারণ আমার প্রবন্ধ থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্ল্যাসফেমিকে আমি নিন্দনীয় বলে মনে করি না। বরং যে জিনিস রস সৃষ্টির অনকূল আমি তারই গুণকীর্তন করে থাকি।

ইতিমধ্যে একজন রসজ্ঞ পাঠক আমাকে একটি ফরমাশ করে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আপনি ব্ল্যাসফেমি তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে ব্ল্যাসফেমার চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু এর যে একটি মাসতুত ভাই আজকের সমাজে আরো বেশি জঁাকিয়ে বসেছেন তার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। এই জীবটির নাম হচ্ছে সিনিক (cynic)। উনি ঠিক কথাই বলেছেন ; আজকের সমাজে 'সিনিক' ব্যক্তিটি প্রধানতম চরিত্র না হলেও অন্যতম প্রধান চরিত্র, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। তবে ঐ মাসতুত ভাই কথাটাতে আমার যা একটু আপত্তি। সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে মাসতুত ভাই ব্যাপারটা কিছু খারাপ নয়, কিন্তু বাঙলা ইডিয়াম মতে এর অর্থটা আপনারাও স্বীকার করবেন, তেমন সম্ভ্রমাত্মক নয়। ব্ল্যাসফেমার এবং সিনিক দুজনেই সর্বক্ষণ সর্ব বিষয়ে মানহানিকর উক্তি করে থাকেন, কিন্তু তাই বলে ফিরে এদের দুজনের মানহানি করতে হবে এমন কথা আমি মানি

না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্ল্যাসফেমার এবং সিনিক—উভয়েরই গুণগ্রাহী ; কারণ, এঁরা দুজনেই সমাজে এবং সাহিত্যে রসসৃষ্টির সহায়তা করেছেন। দু'-এর মধ্যে কুটুম্বিতা যদি কিছু থেকেই থাকে তবে মাসতুত ভাই না বলে বরং জ্যাঠতুত ভাই বলা যেতে পারে। কারণ সিনিকের ভাবে ভঙ্গিতে স্বভাবে কিঞ্চিৎ জ্যেঠামোর ভাব অবশ্যই আছে ; বিজ্ঞজনোচিত একটি বক্র হাসি তার ঠোঁটে প্রায় লেগেই থাকে। কার কতখানি মুরোদ, কার দৌড় কদ্দূর, কোন্ কাজের কী দর সব যেন তার জানা আছে। সিনিক মনোভঙ্গি প্রধানত প্রবীণের ধর্ম কিন্তু মজার কথা, এরা বেশির ভাগ বয়সে নবীন। সংসারের ঘাত প্রতিঘাত খেয়ে জীবনকে জেনে শুনে বুঝে যদি জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা জন্মে তাহলে তাকে বরং মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু যৌবনে প্রবেশ করতে না করতেই যদি কেউ জীবন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়ে ওঠে তাহলে সেটা খানিকটা পাকামো বলেই মনে হয়।

আজকের দিনে ছেলে বুড়ো অধিকাংশ মানুষই সিনিক ভাবাপন্ন। আধুনিক জীবনের frustration থেকে এর উৎপত্তি। এর খানিকটা আভাস আমি পূর্ব প্রবন্ধেও দিয়েছি। তথাপি বলব, কঠোর বাস্তবের কাছে পরাজয় স্বীকার করা যৌবনের ধর্ম নয়। এ যুগের যুবকরা কি তবে যৌবন হারিয়েছেন ? না, আমি তা মনে করি না। যুবকরা যুবকই রয়েছেন। সিনিক মনোভাব এ যুগের একটা pose বা মানসিক ভঙ্গি, ফ্যাশানও বলা যেতে পারে। গভীরতর কোনো জীবনবোধ থেকে এর উৎপত্তি নয়। এটা এক জাতীয় নাস্তিকতা, জীবনের সব কিছুতে অনাস্থা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, পুরোমাত্রায় ধর্মজ্ঞান যাঁর আছে তাঁকেই নাস্তিক হলেও মানায় ; তেমনি যিনি সত্যিকারের জীবন রসজ্ঞ সিনিক হবার অধিকার তাঁরই। জীবনের স্বাদ গন্ধই যিনি পান নি, তিনি সিনিক সাজলে কি হবে, আমি তাঁকে সিনিক বলে মানতে রাজি নই। সিনিক হওয়া চাট্টিখানি কথা নয় ; কঠিনতম অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে সেই গৌরব অর্জন করতে হয়।

আজ পৃথিবীময় যে সিনিকের সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ এটা খাঁটি সিনিসিজম্ নয়, সিনিসিজম্ এর এক অতি সুলভ সংস্করণ।

এর আদি এবং অকৃত্রিম রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। সিনিক দর্শনের আদি কথা যাঁদের জানা আছে তাঁরাই বলবেন যে, আজ যাঁরা সিনিক বলে পরিচিত তাঁদের সঙ্গে পুরাকালের সিনিকদের আদৌ কোনো মিল নেই। পূর্বতনরা বিশেষ এক জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন, এঁরা সর্ব বিষয়ে অবিশ্বাসী। ওঁদের ফিলজফি পজিটিভ, এঁদের নেগেটিভ। সিনিক দর্শনের গোড়াকার ইতিহাসটা একটু ঝালিয়ে নিলে কথাটা আরেকটু স্পষ্ট হবে। গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস্ (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) cynicism এর জন্মদাতা বলে পরিচিত। কিন্তু কারো কারো মতে তারও প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে অপর একজন গ্রীক দার্শনিক অনুরূপ মতবাদ প্রচার করেছিলেন। প্রচলিত রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করাই এঁদের প্রধান কাজ ছিল; সমাজের সকল প্রকার অনাচারকে এঁরা অতি কঠোর ভাষায় নিন্দা করতেন। স্পষ্টবাদিতা এঁদের অন্যতম চরিত্র বৈশিষ্ট্য, কাউকেই ছেড়ে কথা কইতেন না। মার্কাস অরেলিয়াস এঁদের আখ্যা দিয়েছিলেন 'mocker of mankind!' অবশ্য এঁদের জীবনদর্শন কেবলমাত্র মানববিদ্বেষ কিংবা সমাজ নিন্দাতেই পর্যবসিত ছিল না। তাহলে এটিও একটি negative philosophy-তেই পরিণত হত। এঁরা জীবনের সর্বপ্রকার কৃত্রিমতার বিরোধী ছিলেন, জীবনকে যতখানি সরল এবং সহজ করা যায় তারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের জীবনের সর্বপ্রধান কাম্যবস্তু ছিল স্বনির্ভরতা—'to have all one needs within oneself.' সর্বং আত্মবশং সুখম্ এই ছিল তাঁদের জীবনাদর্শ। কোনো ব্যাপারেই পরমুখাপেক্ষী হওয়া তাঁরা অপরাধ বলে মনে করতেন। এই কারণে কৃচ্ছ্রসাধন তাঁদের অন্যতম ব্রত ছিল। ডায়োজিনিস্ নিজে কী কঠোর জীবন যাপন করতেন আজকের দিনে তা বিশ্বাস করা কঠিন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে সর্বপ্রকারে খর্ব করে ন্যূনতম উপকরণের সাহায্যে জীবন ধারণ করেছেন। এদিক থেকে এঁরা ঘোরতর আদর্শবাদী। পরে গ্রীস দেশে যে stoic ফিলজফির উদ্ভব হয় সেটি সিনিক দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

জীবনকে সকল প্রকার জটিলতা থেকে মুক্ত করে মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে যতখানি তাকে সংলগ্ন করা যায় তাই এঁদের লক্ষ্য ছিল। এইজন্যে সমাজের বাঁধাবাঁধি কিছুই তাঁরা মানতেন না, রীতিনীতি প্রথাকে উড়িয়ে দিতেন। এমন কি বিবাহ প্রথায়ও এঁদের বিশ্বাস ছিল না। এঁদের মতে নরনারীর সম্পর্ক একমাত্র প্রকৃতির অনুশাসনেই নির্ধারিত হওয়া উচিত, সমাজের অনুশাসনে নয়। এদিক থেকে এঁরা State of Nature-এর পক্ষপাতী ছিলেন।

বাধা নিষেধ, আইন কানুন, রীতি প্রথা, আচার ব্যবহার সকল কিছুর ত্রুটি ধরতেন বলেই এঁরা বিশ্বনিন্দুক আখ্যা লাভ করেছিলেন। কৌতুকের কথা এই যে, এঁদের সম্প্রদায়গত Cynic নামটিও বিরুদ্ধবাদীদের দেওয়া। গ্রীক ভাষায় Cynic শব্দের মূলগত অর্থ 'কুকুর'। সব কিছুতেই খেঁকিয়ে ওঠা কুকুরের স্বভাব। তাছাড়া কুকুরের আরেক স্বভাব হল—ও কোনো কিছুর মানসম্ভ্রম রাখে না, যেখানে সেখানে মূত্র ত্যাগ করে—ল্যাম্প পোস্ট আর তুলসী মূলে কোনো তফাত রাখে না। ঐ সব কারণেই নিন্দুকেরা এঁদের সিনিক আখ্যা দিয়েছিল। তাঁরা সেই অপবাদ শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। বলেছেন, বেশ, ঐ নামই গ্রাহ্য। আমরা কোনো কিছুকেই অভ্রান্ত মনে করি না, সম্ভ্রান্ত বলেও মানি না। সমাজকে দুরস্ত করতে হলে সব জিনিসের মুখোশ খুলে দিতে হয়, তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ব্যাপারেও সম্ভ্রমহানি করতে হয়; সর্বব্যাপারে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তির্যক আর বাক্যভঙ্গি তীক্ষ্ণ।

এ যুগের সিনিকরা আদি যুগের সিনিক মতবাদের আদর্শটুকু ভুলে গিয়ে তাঁদের ভঙ্গিমাটুকু শুধু গ্রহণ করেছেন। শ্লেষবাক্য প্রয়োগে এঁরাও সিদ্ধহস্ত। প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত করা সহজ, কিন্তু তার পরিবর্তে নতুন বিশ্বাসের ভিত্তিতে নতুন জীবনাদর্শ গড়ে তোলা সুকঠিন। এঁরা সেটি করতে পারেন নি। এই জন্যেই বলেছিলাম, এঁদের জীবনদর্শন নেতিবাচক। প্রকৃত সিনিসিজম্ জীবন বিদ্বেষী নয়, জীবনের কৃত্রিমতার বিরোধী। আদি যুগের সিনিকরা চেয়েছিলেন জীবনের সরলীকরণ, আধুনিকরা চান লঘুকরণ।

একথা স্বীকার্য যে, আদি এবং অকৃত্রিম্ সিনিসিজম বহুকাল পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। রেনেসাঁসের যুগে গ্রীক রোমান সভ্যতাকে পশ্চিম ইয়ুরোপ যখন নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নিলে তখন সিনিসিজম্-এরও রূপান্তর ঘটল। এর সঙ্গে যে asceticism-এর ভাবটুকু যুক্ত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হল। সিনিসিজম্-এর সংজ্ঞা গেল বদলে। গত কয়েক শতাব্দী ধরেই সিনিসিজম্ বলতে আমরা বুঝে আসছি জীবনের সর্ব ব্যাপারে অনাস্থা। একে বলা যেতে পারে neo-cynicism, সংসারের কঠোরতম অভিজ্ঞতার ফলে যখন ঐ অনাস্থা জন্মায় তখন সেটাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না; সেই অভিজ্ঞতাকে যেমন মূল্য দিতে হয়, অভিজ্ঞতাজাত অনাস্থাকেও তেমনি মেনে নিতে হয়। কিন্তু আজকের সিনিক মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ যে সিনিসিজম্ এককালে সকল প্রকার কৃত্রিমতার বিরোধী ছিল এখন সেই সিনিসিজম্ নিজেই কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। এটা যুগের ধারা। সব কিছুতে ভেজাল, সিনিক দর্শনেও ভেজাল দেখা দেবে তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, কৃত্রিমতারও একটা রস আছে। আর একথাও নিশ্চিত যে, সরল প্রাণ, বিশ্বাস প্রবণ মানুষের চাইতে অবিশ্বাসী, দোষান্বেষী মানুষ ঢের বেশি ইন্‌টাররেসটিং। গুণগ্রাহী সহজেই হওয়া যায়, দোষগ্রাহী হতে হলে মনকে অনেক বেশি সতর্ক এবং সজাগ রাখতে হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, দোষান্বেষী ব্যক্তিরা সমাজে সাহিত্যে যথেষ্ট রসের সঞ্চার করেছে। সাহিত্য রসিক হিসেবে আমি যেমন ব্ল্যাসফেমারের ভক্ত তেমনি সিনিকের। আর সিনিক যদি খাঁটি জাতের হয় তবে তো কথাই নেই। আধুনিক সংজ্ঞা মতেই বলছি—মানুষ আজীবন যেসব ধ্যান ধারণা মনে প্রাণে লালন করে এসেছে, অকস্মাৎ কোনো নিষ্ঠুর আঘাতে যখন বিশ্বাসের নিরাপদ আশ্বাস বিনষ্ট হয়ে যায় তখন যে অবিশ্বাসীর জন্ম হয় তারই নাম সিনিক। সেই সিনিকের অপূর্ব চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে হ্যামলেট চরিত্রে। নাটকের প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত হ্যামলেট ঘোরতর সিনিক, কিন্তু বরাবর তিনি যে তা ছিলেন না তারও আভাস গ্রন্থের মধ্যেই আছে। নাটকের ঘটনাবলী ঘটবার আগে

ডেনমার্কের রাজপুত্রকে আমরা দেখিও নি, চিনিও নি; শুধু ক্ষণেকের জন্যে তাঁর উজ্জ্বল মূর্তিটি আমাদের চোখে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে ওফিলিয়ার মুখে একটি খেদোক্তিতে—

O, what a noble mind is here o'erthrown !
The courtier's, soldier's, scholar's eye, tongue, sword ;
The expectancy and rose of the fair state,
The glass of fashion and the mould of form,
The observed of all observers, quite down !

আদর্শ চরিত্র। বিদ্যায় বুদ্ধিতে, শৌর্যে বীর্যে, গুণে গরিমায় এমনটি দেখা যায় না, সকলের চোখের মণি। এই হচ্ছে হ্যামলেট যা ছিলেন, আর নাটকের হ্যামলেট হল সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতে হ্যামলেট যা হয়েছেন। ডেনমার্কের রাজকুমারের মুখে—Denmark's a prison—শুনতে বড় অদ্ভুত লাগে। বলছেন, সমস্ত পৃথিবীটাই এক বিরাট কারাগার। কী বিষম তিক্ততা ! Frailty, thy name is woman—সিনিকের বিষোদ্গার। সিনিসিজম্ যে কি ভয়ঙ্কর নিষ্করুণ হতে পারে তার চরম দৃষ্টান্ত ওফিলিয়াকে উদ্দেশ করে—Get thee to a nunnery : why wouldst thou be a breeder of sinners ? ইত্যাদি। হ্যামলেটের কাহিনী যতই হৃদয় বিদারক হোক, হ্যামলেটের মানববিদ্বেষ, জীবন বিতৃষ্ণা অপূর্ব রসের সঞ্চার করেছে। এমন সিনিক স্বয়ং বিধাতাও সৃষ্টি করতে পারেন না, একমাত্র শেক্সপীয়ারই পারেন। শেক্সপীয়ার-সাহিত্যে আরো দু চারটি সিনিক আছেন। টাইমন অফ এথেন্স তো বটেই। ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডার অন্যতম চরিত্র থ্যরসিটিস্ (Thersites) বলতে গেলে একেবারে মডার্ন সিনিক। এ যুগের সাহিত্যেও অনেক সিনিক চূড়ামণির সৃষ্টি হয়েছে, এঁরাও আমাদের রসের ভাণ্ডারে যথেষ্ট যোগান দিয়েছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, সাধারণ মানুষরা চেষ্টা করলেও সিনিক হতে পারে না। সাহিত্যে যেমন, বাস্তব জীবনেও দেখা যায় এঁরা তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহানুভব প্রকৃতির মানুষ। দুনিয়ার হালচাল দেখে,

বিশেষ করে মানুষের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে পেয়ে এখন মানুষেরও মন তিক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর, এমন মানব প্রেমিক সংসারে কজন জন্মেছে? সেই দয়ার সাগরও শেষ জীবনে সিনিক হয়ে উঠেছিলেন। বন্ধুব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে জানালেন, অমুক আপনার বড় নিন্দা করছিল। বিদ্যাসাগর অবাক হয়ে বললেন, সে আবার মিছামিছি আমার নিন্দা করে কেন? তার তো কোনো উপকার আমি করি নি। এ হল সিনিকের উক্তি এবং অসাধারণ উক্তি। সাধারণ মানুষের মুখে এমন কথা সহজে যোগাবে না। বলা বাহুল্য, এ সিনিসিজম্ অনেক উঁচুদরের জিনিস। সংসারের মানুষকে যিনি মনে প্রাণে ভালবাসেন, অথচ মূর্খ এবং অকৃতজ্ঞ মানুষরা যখন সেই ভালবাসায় উদ্দেশ্য আরোপ করে তখন মনে যে বেদনার সঞ্চার হয়, সেই বেদনা থেকে এই সিনিসিজম্-এর জন্ম। এর সৌন্দর্য অতুলনীয়। এই দরের সিনিকও সংসারে বিরল।

সাধারণ ক্ষেত্রে সিনিক মাত্রই চতুরানন অর্থাৎ কিনা এঁদের মুখের কথায় চাতুর্যটাই প্রধান। অমিট্ রায়ের মতো এঁরা শানিয়ে বলা কথা আগে থেকেই বানিয়ে রেখে দেন। এদিক থেকে এঁরা সমাজে বিদূষকের কাজ করেন। উভয়ার্থে বিদূষক—একদিকে এঁরা নিন্দুক, সকল কিছুর নিন্দা করে বেড়ান, অপরপক্ষে বাকচাতুর্যে সকলের মনোরঞ্জন করেন। এককালে বিদূষকের কাজকে সামাজিক শিল্প বলে গণ্য করা হত। আজকের সিনিক বৃত্তিও সেই দাবি করতে পারে। তাই বলে শুধু যে বিনোদন কার্যেই এর ব্যবহার এমন নয়, বুদ্ধিমান লোকেরা একে সাংসারিক ব্যাপারেও ব্যবহার করে থাকেন। কারণ ঠোঁট বাঁকিয়ে সব কিছুকে যদি উড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে জীবনের অনেক দায়িত্বকে দিব্যি এড়িয়ে চলা যায়। সমাজে এই জাতীয় সিনিকের সংখ্যাই বেশি। আমি নিজেও এই শ্রেণীর একজন সিনিক।

ব্ল্যাসফেমার এবং সিনিক—এই দু-এরই এক জায়গায় একটি মিল আছে। এঁরা দুজনেই ইংরেজীতে যাকে বলে iconoclast—এঁরা প্রতিমাভঙ্গকারী, মূল্য হননকারী। মূল্য বিবর্তনের দ্বারাই যুগ বিবর্তন সাধিত হয়। প্রচলিত মূল্যবোধকে এঁরাই প্রতি যুগে চ্যালেঞ্জ করে এসেছেন। 'দস্যুর মতো

ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা' কিংবা 'প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা'—একথা এঁদের প্রতিই প্রযোজ্য এবং এদিক থেকে এঁদেরকেই বলা যায় যুগপ্রবর্তক। সিনিকদের সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মনের মিল আছে এমন নয়, তথাপি আমি যে এঁদের তারিফ করে থাকি তার কারণ ওঁদের ঐ চ্যালেঞ্জের ভাবটা আমার ভাল লাগে। বেশ লাগে যখন দেখি কত কত গণ্যমান্যদের এঁরা নগণ্য করে দেন। কোনো পুরুষই মহাপুরুষ নয়, কোনো রমণীই দেবী কিংবা অপ্সরী নয়, কোনো স্থানই পীঠস্থান নয়, কোনো যুগই সত্যযুগ নয়। স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে এঁরা একেবারে নির্বিকার। বলা বাহুল্য এরূপ নির্বিকার মন যথার্থ জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ।



স্যাটায়ার

লাতিন কবি জুভেনালকে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ রসাত্মক রচনার আদি গুরু বললে খুব ভুল হয় না। অবশ্য তাঁর আগেও গ্রীক এবং লাতিন সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক রচনা লেখা হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন স্যাটায়ারিস্টদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা। জুভেনাল সর্বসমেত ষোলটি স্যাটায়ার লিখেছিলেন। প্রথম স্যাটায়ারটি তৎকালীন কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে রচিত। প্রথম বাক্যেই বলছেন, আমি কি চিরকাল শ্রোতা হয়েই থাকব? অপরের রচনা—কবিতা, নাটক শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়েছে। আর কিছু না হোক এর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই আমাকে লেখনী ধারণ করতে হবে। আমার কানের ওপর যারা অতখানি অত্যাচার করেছে তাদের আমি অত সহজে ছাড়ছি নে। তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন অপাঠ্য জিনিস পাঠ করে যখন অতিষ্ঠ বোধ করেছেন তখনই তাঁর লেখার তাগিদ এসেছে। বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি নে, আমি যে যৎকিঞ্চিৎ লিখে থাকি তারও মূল কারণটা ঐখানে। আমি জাত লিখিয়ে নই, নিজেকে বিধি-দত্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করি না, লেখার জন্যে কেউ আমাকে মাথার দিব্যও দেয় নি। তবু যে লিখি তার কারণ খুব আজে বাজে জিনিস পড়ে পড়ে যখন আমার মন মেজাজ খিঁচড়ে যায় তখনই আমার লেখার জিদ চেপে বসে। লোকে বলে লিখতে হলে প্রসন্ন মনে লিখতে হয়, আনন্দ থেকেই রসের জন্ম। কিন্তু রস যে সব সময়েই মধুর রস হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আমার লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা বলেন, আমার লেখায় তিক্ত রসটাই বেশি অর্থাৎ ওঁদের মতে আমিও একজন খুদে স্যাটায়ারিস্ট। অবশ্য আজকের দিনে অধিকাংশ লেখকই পুরোপুরি না হলেও অংশতঃ স্যাটায়ারিস্ট—গল্প উপন্যাস, কবিতা নাটক সব কিছুতেই একটু টক তেতো না হয় তো ঝাল লঙ্কার ঝাঁঝ মেশানো।

কিছুকাল আগে আমি মানব সমাজের বিশেষ দুটি চরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি—এদের একজন সিনিক আরেকজন ব্ল্যাসফেমার। এখন যে ব্যক্তি স্যাটায়ারিস্ট নামে পরিচিত সে এদেরই জ্ঞাতি ভ্রাতা। আজকের সমাজে এর পশার প্রতিপত্তি পূর্বোক্তদের চাইতে ঢের বেশি। তিনটি চরিত্রের মধ্যে চারিত্রিক মিল অতি সুস্পষ্ট। তিনজনই নিন্দুক; নিন্দুক বললে কম বলা হয়। এরা বিদ্রোহী—ধর্মদ্রোহী, রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী। তিনের মধ্যে যেমন মিল তেমনি অমিলও কিছু কিছু আছে। ব্ল্যাসফেমার নিন্দুক হয়েও নিজে বহুনিন্দিত ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে ধারণা তিনি শ্রদ্ধেয়কে অশ্রদ্ধেয় করবার চেষ্টা করেন। অবশ্য এ অভিযোগ সব সময়ে সত্য নয়। অতীতে দেখা গিয়েছে, যে-সব উক্তির জন্যে তিনি সমাজে নিন্দিত এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়েছেন তার সবই অন্যায় উক্তি এমন নয়। বরং কালক্রমে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর বেশির ভাগ কথাই যুক্তিসঙ্গত। ইদানীং কালের ব্ল্যাসফেমাররা অবশ্য নিতান্ত বাহাদুরি দেখাবার জন্যে অনেক সময় প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য, সেটা সব সময়ে সমর্থনযোগ্য নয়।

আদি যুগের সিনিক ফিলজফি ছিল গভীরতর। তাঁরা সমাজ জীবনের আপাতমনোহর বহু জিনিসের মুখোস খুলে দিয়েছিলেন, কোনো প্রকার কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দেন নি, সকল প্রকার তামসিকতার নিন্দা করেছেন। এ যুগে সব জিনিসই সস্তা হয়ে গিয়েছে, সিনিসিজম্‌ও। নাক সিঁটকিয়ে ঠোঁট উল্টিয়ে কথা বললেই এখন সিনিক সাজা যায়। সিনিসিজম্ এ যুগের মুদ্রা দোষ।

এটা ঠিক যে, ব্ল্যাসফেমি, সিনিসিজম্, স্যাটায়ার—এই তিনটিই বয়ঃপ্রাপ্ত সমাজের সৃষ্টি। আদিম সমাজে সরলচিত্ত মানুষ সব কিছুকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করত। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে মানুষের মনে নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। সভ্য মানুষের মন প্রশ্নসঙ্কুল মন। যেখানে ছিল দ্বিধাহীন বিশ্বাস সেখানে এসেছে যুক্তিসন্ধানী জিজ্ঞাসু মন। গোড়ার দিকে ব্ল্যাসফেমি বা সিনিসিজম্ যতখানি সোরগোলের সৃষ্টি

করত এখন আর ততখানি করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের মন এখন সবরকম পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। আজকের দিনে ব্লাসফেমির জন্যে কাউকে প্রাণ দিতে হয় না, বড় জোর এক আধটু গালাগাল খেতে হয়। গুরুতর রকমের মূল্য দিতে হয় না বলে ব্লাসফেমিরও মূল্য কমে গিয়েছে। আদি যুগের সিনিক মতবাদও আজ লুপ্ত। এ যুগের সিনিকরা সব জিনিসকে বাজার দরে যাচাই করে, ফলে কোনো কিছুকেই তারা যথার্থ মূল্য দিতে জানে না।

কৌতুকের বিষয় যে, এককালে মূল্যবান জিনিসের মূল্য হ্রাসের বিরুদ্ধেই এঁরা প্রতিবাদ জানাতেন, কিন্তু এখন এঁদের একমাত্র কাজ হয়েছে সব জিনিসের মূল্য হ্রাস করে দেওয়া। সিনিক এবং ব্লাসফেমার দুজনেই নিজ নিজ সম্মানের আসন অনেকখানি খুইয়ে বসে আছেন। এককালে এঁদের উভয়ের ইচ্ছা ছিল সমাজকে সংস্কার করা, এখন এঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সমাজকে চমকে দেওয়া। স্বীকার করতেই হবে, এটা খুব একটা কিছু মহৎ উদ্দেশ্য নয়। এ যুগের ব্লাসফেমি এবং সিনিসিজম্ এর মধ্যে প্রশংসনীয় খুব বেশি কিছু নেই তথাপি সাহিত্যরসিক হিসেবে আমি এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ কারণ সাহিত্যে এঁরা যথেষ্ট রসের সঞ্চার করেছেন।

সমাজে যে সম্মানের আসন সিনিক এবং ব্লাসফেমার নিজ দোষে হাত-ছাড়া করেছে সে আসন আজ গ্রহণ করেছে স্যাটায়ারিস্ট। ব্লাসফেমি এবং সিনিসিজম্—এ দু'-এর গুণ সন্নিপাতে স্যাটায়ারের জন্ম। ব্লাসফেমির মধ্যে আছে চ্যালেঞ্জের ভাব, সিনিসিজম্-এর মধ্যে অবজ্ঞার। এই দু'-এর মিশ্রণে মানুষের মনে যে সুতীব্র indignation-এর সৃষ্টি হয় তাই থেকে স্যাটায়ারের জন্ম হয়েছে। ব্লাসফেমি এবং সিনিসিজম্ বাস্তব জীবনে যে আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং শিল্পে সাহিত্যে যখন তা প্রতিফলিত হয়, তখন তাই স্যাটায়ারের রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ স্যাটায়ার হল গিয়ে ব্লাসফেমি এবং সিনিসিজম্-এর রসায়িত রূপ।

আজকের দিনের যে সুসভ্য সমাজ তা এই তিনের ত্র্যহস্পর্শের ফল। সৃষ্টির মধ্যে একদা যা ছিল অজ্ঞাত এবং অর্ধপরিস্ফুট বিজ্ঞান এসে তার

ঢাকনা খুলে দিয়েছে। দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ যেমন ব্লাসফেমি, বিজ্ঞান কর্তৃক বিশ্বরহস্যের বস্ত্রহরণ তেমনি ব্লাসফেমি। অসভ্য সমাজে যেমন থাকে অজ্ঞানতার আবরণ, সভ্য সমাজের গায়ে তেমনি দেখা দেয় আরেক জাতীয় আবরণ—সেটা ভান ভণ্ডামি কৃত্রিমতার আবরণ। যাঁরা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তাঁরা সেই আবরণ উন্মোচন করেন। প্রাচীন সমাজে এই কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন ব্লাসফেমার এবং সিনিক। আজকের সমাজে এ দু'-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন স্যাটায়ারিস্ট। স্যাটায়ারিস্ট একাধারে সিনিক এবং ব্লাসফেমারও বটে। এরা তিনজনই প্রটেস্‌টেণ্ট অর্থাৎ এদের মনোভঙ্গি প্রতিবাদমূলক। ব্লাসফেমি অপেক্ষাকৃত বিনয়ী; সে বলে, তুমি এতকাল যা ভেবে এসেছ সে তোমার ভ্রান্ত ধারণা— অতএব আমার কথা শোন। সিনিসিজম্ দুর্বিনীত; সে বলে, তোমাকে বলে কিছু লাভ নেই, উপদেশো হি মূর্খাণাং ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সমাজ এদের কখনো সুনজরে দেখে নি। হাটের মাঝখানে কারো বিদ্যে বুদ্ধি চরিত্র ফাঁস করে দিলে কেউ খুশি হয় না। স্যাটায়ারও ঐ কাজই করেছে কিন্তু অপেক্ষাকৃত চাতুর্যের সঙ্গে করেছে। সে হাসি মুখে কঠিন কথা বলেছে। অর্থাৎ বিদূষণ ক্রিয়ার সঙ্গে বিদূষকের আর্ট মিশিয়ে নিয়েছে। যাকে হাস্যকর করেছে তাকেও হাসিয়েছে। সমাজের একটা সমষ্টিগত রসবোধ আছে। সামাজিক রসচর্চার অন্য নাম পরচর্চা। পরনিন্দা পরচর্চাকে অনেকে নিন্দনীয় মনে করেন, আমি করি না। পরচর্চাকে আমি মস্ত বড় আর্ট বলে মনে করি; সমাজকে সে জীবন্ত রেখেছে, ও জিনিস না থাকলে সামাজিক জীবন শুষ্ক, নীরস হয়ে যেত। স্যাটায়ার আর কিছু নয়, খুব উঁচুদরের পরচর্চা। নিন্দাও যে অনিন্দনীয় হতে পারে, বিদ্রূপ যে সব সময়ে বিরূপতার সৃষ্টি করে না স্যাটায়ার তা প্রমাণিত করেছে। অরসিক মানুষরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে জানে না, তারা গালাগালি করতে জানে। সুদর্শন চক্রও অস্ত্র, ভীমের গদাও অস্ত্র। বেশির ভাগ মানুষ ভীমের গদাই ব্যবহার করে, বরুণাস্ত্র বায়বাস্ত্রের ব্যবহার জানে না। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যে কী ধারালো অস্ত্র সে কথা অনেকেরই জানা নেই। কোনো মানুষকে যদি

সর্বসমক্ষে হাস্যকর করে দেওয়া যায় তবে সে যতখানি অপ্রস্তুত হয় গালাগাল দিলে ততখানি হয় না। খোঁচা দিয়ে কথা বলার মধ্যে রস আছে, ধার আছে। মাথায় বাড়ি দিয়ে কথা বলার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য নেই। সাত কোটি সন্তানেরে·····রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি।—কথার মধ্যে নিঃসন্দেহে আঘাত আছে; কিন্তু ধার নেই কিংবা রস নেই এমন কথা কেউ বলবে না। অপর পক্ষে কোনো ব্যক্তি যখন বলেন, বাঙালীর মত এমন হাড়ে বজ্জাত, হারামজাদা মানুষ পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই—এর মধ্যে ধারই বা কোথায় রসই বা কোথায়? একেই বলে ভীমের গদা, অস্ত্র হিসেবে অত্যন্ত স্থূল। ভীমের কোনো sense of humour ছিল না, সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল না। তাঁর গদাটি সেই স্থূলতার প্রতীক। হাস্যরসাত্মক আক্রমণকেই বলে satire, হাস্যরসবর্জিত আক্রমণকে বলে invective—একটি art, অপরটি dirt. স্যাটায়ার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, it pleases even when it hurts. সমষ্টিকে আঘাত করলে ব্যক্তি বিশেষের গায়ে বড় একটা লাগে না; কেউ নিজের গায়ে পেতে নেয় না, সকলেই উপভোগ করে। অবশ্য স্যাটায়ারে ব্যক্তিগত আক্রমণের দৃষ্টান্তও প্রচুর আছে—পোপ ড্রাইডেনের কাব্য, বিশেষ করে পোপ-এর কাব্য তার নিদর্শন। কিন্তু সত্যিকারের রসসৃষ্টি হয়েছিল বলে আজকের দিনেও তা উপভোগ্য। সে কালও নেই, সেই ব্যক্তি বিশেষরাও নেই কিন্তু রসটুকু থেকে গিয়েছে। রস যত সূক্ষ্ম হবে তত বেশি দীর্ঘস্থায়ী এবং দূরগামী হবে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে রচিত আরিস্টফেনিস্-এর স্যাটায়ার আজও সুখপাঠ্য। অনেকের ধারণা স্যাটায়ার খুব উঁচু দরের জিনিস নয়; তাঁদের মতে এটি সৎসাহিত্যের তালিকায় পড়ে না। তাঁরা মনে করেন, এ জিনিস অতি মাত্রায় সাময়িকতা দোষদুষ্ট এবং সেই হেতু স্বভাবতই স্বল্পায়ু। এ অতি ভুল ধারণা। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জুভেনাল, সারভেনটিস্, সুইফট স্যাটায়ার রচনা করেই পৃথিবীর সাহিত্যে ক্লাসিক আখ্যা লাভ করেছেন। এই সূত্রে একটা কথা মনে হচ্ছে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য অনস্বীকার্য কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে স্যাটায়ার নেই। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এখানে ওখানে খুচরোভাবে ছড়িয়ে

থাকতে পারে, কিন্তু নিছক ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্য বলে কোনো জিনিস আছে বলে মনে করি না। পণ্ডিতদের মুখে একটি গ্রন্থের নাম শুনেছি—বিশ্বগুণাদর্শ-চম্পু—দুই বন্ধু দেশ পর্যটনে বেরিয়েছেন। এক বন্ধু যে জিনিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অপরজন তারই নিন্দায় মুখর। মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিন্দা করলেই স্যাটায়ার হয় না, স্যাটায়ারের নিজস্ব একটি ভঙ্গি আছে। আমার মনে হয় উক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ স্যাটায়ার নয়, একদেশদর্শিতার দোষ প্রদর্শনই ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। আসল কথা আমাদের দেশে সেকালের মানুষ সমাজকে বড় বেশি সমীহ করে চলতে, সহজে তাকে ঘাটাতে চাইত না। এই কারণে সে যুগে স্যাটায়ার রচিত হয় নি। স্যাটায়ার এ দেশে এসেছে অপেক্ষাকৃত হাল আমলে। বাঙলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রসের প্রথম আভাস দেখা গিয়েছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে। অন্ততঃ তাঁর মনের গঠন স্যাটায়ারের উপযোগী ছিল। তবে পুরোপুরি স্যাটায়ার রচনা ইংরেজের আমলেই হয়েছে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে।

কারো কারো ধারণা স্যাটায়ার হাল্‌কা ধরনের রস রচনা। লেখার ভঙ্গিটা হাস্যরসাশ্রিত বলে অনেকে এই মারাত্মক ভুলটি করেন। বাস্তবিক পক্ষে স্যাটায়ার সব সময়েই গুরুতর বিষয় নিয়ে রচিত। তার কারণ ব্ল্যাসফেমি এবং সিনিসিজম-এর মতো স্যাটায়ারও সংস্কার প্রয়াসী। সমাজের বহু জঞ্জাল স্যাটায়ারের আঘাতে দূরীভূত হয়েছে। তবে এক শ্রেণীর স্যাটায়ারিস্ট আছেন তাঁরা শুধু ভাঙবার প্রয়াসী, গড়বার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এঁদের বলা যেতে পারে demolition squad. এমন যে বার্নার্ড শ' তিনিও এঁদের অন্যতম। একজন বলেছেন, Shaw's genius was for intellectual slum-clearance, not for town-planning.

তা হলেও শ' আমাদের প্রণম্য কারণ সাহিত্যকর্মে রসসৃষ্টিই মুখ্য, সাংসারিক উদ্দেশ্য গৌণ।

সাহিত্যে যত রকমের রস আছে তার মধ্যে এখন ব্যঙ্গরসের প্রয়োগ সব চাইতে বেশি বিস্তৃত। আগেই বলেছি গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক সব

কিছুর মধ্যে ব্যঙ্গ অনুপ্রবেশ করেছে। চিত্রশিল্পে কার্টুনের জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছে। এখন মানুষের স্বভাবই হয়েছে একে অন্যকে খোঁচা দিয়ে কথা বলা। কেউ কারো মান রেখে কথা বলে না। এই স্বভাবই বা হল কি করে ? এরও গভীরতর কারণ আছে। আগে মানুষ জীবনকে, সংসারকে অনেক বেশি সম্ভ্রমের চোখে দেখত। এখন জীবন এত কঠিন হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ মনে করে জীবন তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে। সেই কারণে সেও ফিরে জীবনকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে। তাতেই যা একটু সান্ত্বনা। মানুষের চোখে সংসারের রূপ যখন বদলে যায় তখনই কথায় বার্তায়, আচারে ব্যবহারে বিদ্রূপ প্রাধান্য লাভ করে। স্যাটায়ার এখন সর্বব্যাপী। পৃথিবীতে এই সত্যিকারের স্যাটায়ারের যুগ এসেছে। এককালে সমাজ ব্ল্যাসফেমারকে জীবন্ত দগ্ধ করেছে, এখন সেই ব্ল্যাসফেমি স্যাটায়ার নাম গ্রহণ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।



রমণী ও
রমণীয় রচনা

সম্প্রতি আমি দু' একটা গুরুগম্ভীর বিষয়ে এবং বোধ করি একটু গুরু-গম্ভীর ভাষাতেই কিছু আপ্তবাক্য প্রচার করেছিলাম। আমার কোনো কোনো পাঠক তাতে কিঞ্চিৎ বিচলিত বোধ করেছেন। তাঁরা ভেবেছেন, ইন্দ্রজিৎ লোকটার হঠাৎ মতিভ্রম হয়েছে, নইলে যে মানুষ কোনো কালে গম্ভীর কথা বলে না সে হঠাৎ আবার গম্ভীর কথা বলতে বসবে কেন? গম্ভীর কথা বলা আমার স্বভাবগত নয়, কিন্তু তাই বলে ভাববার কথাও কখনোই বলব না, এমন মাথার দিব্যিও কোনো কালে আমি দিই নি। ভাববার মত কথা বলতে গেলে ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ একটু গাম্ভীর্য অবলম্বন করতে হয়। অবশ্য আমার পাঠকরা জানেন যে, স্বভাবদোষে আমার গম্ভীর কথার মধ্যেও হঠাৎ কৌতুকের বাষ্প ফেনিয়ে ওঠে। তার কারণ আমার স্বভাবটা হয়েছে অমিট্ রায়ের মতো। অমিট্ বলেছিল, 'আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ও গ্রহটি মরবার আগেও একটু মুচকি না হেসে মরতে পারে না।' আমার ঠিক সেই দশা; ভয়ঙ্কর গম্ভীর কথা বলতে গিয়েও আমি হঠাৎ হেসে ফেলি।

অবশ্য এই অভিলাষ বরাবর ছিল যে, গভীর কথাও গভীর সুরে না বলে যথাসম্ভব হাল্‌কা সুরে বলব। বিষয়টা যদি ওজনে ভারিও হয় তাহলেও বলবার ভঙ্গিতে খানিকটা তার ভাব লাঘব করে দেওয়া যায়। ভাষাকে সেই ক্ষেত্রে খুব লঘু পদক্ষেপে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে হয়। ভাষার ব্যবহারে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে একটা কথা আছে; অবশ্য আমি বলি, গুরুচণ্ডালী গুণ। বাঙলা ভাষার যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা ঐ গুরুচণ্ডালী দোষের গুণেই হয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে জাতিভেদ উঠে গিয়েছে, সাধু এবং অসাধু শব্দ এখন এক পঙ্‌ক্তিতেই বসতে পারে। আমার মতে, ভাষার মতো বিষয়কেও গুরু-

চণ্ডালী গুণের আওতায় আনা বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ গুরুতর বিষয়েরও আলোচনা তরতরে ঝরঝরে হওয়া আবশ্যক। তাতে বিষয়ের গুরুত্ব নষ্ট হয় না। এককালে poetic diction বলে একটা কথা ছিল অর্থাৎ গদ্যের ভাষা থেকে পদ্যের ভাষা ছিল পৃথক। এখন সে পার্থক্য দূর হয়েছে। যে ভাষায় আমরা গদ্য রচনা করি, এমন কি যে ভাষায় আমরা কথা বলি সে ভাষাতেই কাব্য রচনা হতে পারে এবং হচ্ছেও। যে কারণে poetic diction উঠে গিয়েছে সেই কারণেই pedantic dictionও উঠে যাওয়ার প্রয়োজন। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্যে আলাদা কোনো ভাষার প্রয়োজন হয় না। যে ভাষায় আমরা কথা বলি সে ভাষাতেই যে-কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা চলতে পারে।

যে কথা থেকে এ আলোচনার সূত্রপাত হল সে কথায় আবার ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। আমি সম্প্রতি ব্ল্যাসফেমি, সিনিসিজম্ এবং স্যাটায়ার সম্বন্ধে যে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম তাতেই পূর্বোক্ত পাঠকবন্ধুরা কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, লেখাগুলোতে একটু নাকি পণ্ডিতি পণ্ডিতি গন্ধ আছে। সত্যি হলেই অবশ্যই দোষাবহ বলতে হবে। আমার লেখার মধ্যে সত্যি সত্যি যদি পণ্ডিতি প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের বিষয়। কারণ ও ব্যাধিটা বাস্তবিক কোনো কালে আমার ছিল না। এটা হয় বয়সের দোষে হয়েছে নয়তো বুদ্ধির দোষে। আমি বরাবর বলে এসেছি যে, পাণ্ডিত্য জিনিসটা কষ্টার্জিত কিন্তু তার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, কখনই চেষ্টাকৃত নয়। লেখকের অজ্ঞাতসারেই অত্যন্ত সহজভাবে লেখার মধ্যে সেটি ফুটে ওঠে। আর অনাবশ্যক ঘটা করে যাকে জাহির করা হয় তাকে পাণ্ডিত্য বলে না, তাকে বলে পণ্ডিতি। অর্থাৎ কিনা খাঁটি জিনিসের নাম পাণ্ডিত্য আর নকল জিনিসের নাম পণ্ডিতি। আমার লেখা যদি পণ্ডিতি দোষ-দুষ্ট হয়ে থাকে তবে বড়ই লজ্জার কথা বলতে হবে।

ইন্দ্রজিতের লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে, ও লোকটার মধ্যে আসল কিছুই নেই, সমস্তটাই নকল। এমন কি নামটা

পর্যন্ত নকল। ছদ্মনামা ব্যক্তি সর্বপ্রকারেই ছদ্মবেশী। ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, তার পাণ্ডিত্যও pseudo-পাণ্ডিত্য। পাণ্ডিত্য যদি বা এক আধটু থাকে তার মধ্যেও নানা রকমের ভেজাল মেশানো। লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যাঁরা খাঁটি পণ্ডিত অর্থাৎ পাণ্ডিত্যই যাঁদের একমাত্র বিষয়সম্পত্তি তাঁরা সব সময়েই বিশেষ কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে লিখে থাকেন। বিষয় নির্বিশেষে কখনো তাঁরা কিছু লিখতে পারেন না। তার কারণ, পাণ্ডিত্যের বোঝা কাঁধে এমন চেপে বসে যে, এঁরা আর এদিক ওদিক ঘাড় ফেরাতে পারেন না, সোজা এক দৃষ্টে চলতে থাকেন। আমার সে বালাই নেই। বোঝাটা এতই হাল্‌কা যে, দিব্যি এদিক ওদিক তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে হেলে-দুলে চলতে পারি। বিষয়সম্পত্তি যৎসামান্য বলেই আমার লেখা সব সময়েই বিষয়-নিরপেক্ষ। আমি বিষয়ের ধার ধারি নে। মনটাকে মেলে ধরি, সে আপন খুশি মতো বকে যায়, এক কথা বলতে গিয়ে আরেক কথায় হাজির হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনো এমন আবোল তাবোল বকেন না। তাঁরা যুক্তি তর্কের দড়িদড়া বেঁধে কোনো একটা বিষয়কে বেশ মজবুত করে খাড়া করবার চেষ্টা করেন। সেখানে অবান্তর কথার কোনো অবকাশই নেই। বক্তব্যটা অবাধ্য হয়ে এদিক ওদিক যেতে চাইল তৎক্ষণাৎ কান মুচড়ে তাকে সোজা পথে নিয়ে আসা হয়। বক্তব্যটাকে সন্দেহাতীত রূপে সর্বজনগ্রাহ্য করতে হলে কোথাও ফাঁক রাখা চলে না। এ জন্যে পণ্ডিত ব্যক্তিদের লেখা অতি মাত্রায় ঠাস-বোনা। ঐ জাতীয় জিনিস আমি কস্মিন কালে লিখতে পারব না। আমার লেখায় চালুনির ফাঁকের মত অসংখ্য ছিদ্র, লজিকের ফ্যালাসি পদে পদে। সেটা স্বাভাবিক, কারণ আমি তো কিছু প্রমাণ করতে বসি নি যে, অতি সাবধানে মাপ জোক করে নিক্তিতে ওজন করে কথা বলব। কোনো জিনিস প্রমাণ করবার যার দায় নেই, দায়িত্বহীন উক্তি করবার অধিকার অবশ্যই তার আছে। আমার কথা সকলের গ্রহণযোগ্য হবে এমন আশা আমি কখনো করি না, কথাগুলি শ্রবণযোগ্য হলেই আমি সন্তুষ্ট। গানের সুর শুনেই লোকে খুশি, কখনো জিজ্ঞেস করে না, গানটার বক্তব্য কি কিংবা এতে জ্ঞাতব্য জিনিস কিছু আছে কিনা। সংগীত এবং সাহিত্যের

স্বভাব এক। সাহিত্যের মধ্যেও অশ্রুত একটি সুর আছে, সেটি লেখার ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়, বিষয়বস্তুতে নয়। যা শুনতে ভালো লাগে তাই সংগীত। মুখের কথা যদি শ্রুতিমধুর হয় তো গানও তার কাছে লাগে না। হ্যাজ্‌লিট যেমন কোলরিজ সম্পর্কে বলেছিলেন, He talks far above singing. সংগীতের মতো সাহিত্যেরও একটি অপরিহার্য গুণ শ্রুতিমাধুর্য। বাজে কথাও সাহিত্য হতে পারে যদি তা শুনতে ভালো লাগে। প্রমথ চৌধুরী মশায়কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, গল্প কাকে বলে? তিনি বলেছিলেন, যা শুনতে ভালো লাগে তাই গল্প। খুব খাঁটি কথা। গল্প লোকে বরাবর শুনেই এসেছে, পড়তে শিখেছে তো এই সেদিন। কবিতাও চিরকাল গেয়েই শোনানো হয়েছে। কবিতা পাঠ নিতান্তই এ-কালের অভ্যাস। গল্প উপন্যাস (মহাকাব্যগুলিকেই সে-কালের উপন্যাস বলা যেতে পারে) কবিতা গান ইত্যাদির রস অর্থাৎ সাহিত্যের রস প্রধানত কানের ভিতর দিয়েই মানুষের মর্মে প্রবেশ করেছে। একমাত্র প্রবন্ধ জাতীয় জিনিসই লোকে পাঠ করে, কান পেতে শোনে না। যে জিনিস লোকে শুনতে চায় না, কিন্তু প্রয়োজন হলে পাঠ করে সে জিনিস সাধারণত পাঠ্য কেতাবে স্থান পায়। সকলেই জানেন যে, লোকে বাধ্য হয়ে যে জিনিস পাঠ করে সে জিনিস সাধারণত সুখপাঠ্য হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব। সে জিনিস কুলুঙ্গিতে তোলা থাকে, প্রতিদিনের কাজে লাগে না। নিতান্ত বিপাকে পড়লে কালে ভদ্রে কেউ চোখ বুলিয়ে দেখে। কিন্তু সাহিত্য তো তা নয়; সাহিত্য লোকে পড়ে ভেতরের তাগিদে, না পড়ে পারে না বলে। প্রবন্ধ জাতীয় জিনিসের প্রতি এই যে বিরাগ তার কারণ এই যে, ও জিনিসটা ঠিক সাহিত্যপদবাচ্য নয়। সত্যি বলতে কি, যে প্রসাদগুণ থাকলে জিনিসটা শ্রুতিমধুর হয় এবং প্রবন্ধও সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে সে গুণ অধিকাংশ প্রবন্ধেই থাকে না। কোনো বিষয়কে যুক্তিগ্রাহ্য করতে গেলে সেটা প্রায়ই রসগ্রাহ্য হয় না। যুক্তি আর রস—এ দু-এর মিলন অসম্ভব, এমন কথা অবশ্যই বলব না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, এ দু-এর মিলন ঘটাতে হলে মনের যে flexibility-র প্রয়োজন খুব কম

লেখকেরই সেটি আছে। খাঁটি সাহিত্য হয়েছে এমন প্রবন্ধ বাঙলা দেশে ক'জন লেখক লিখেছেন?

যাক, কথায় কথায় আসল কথাটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে। বলেছিলাম আমার লেখা সাধারণত বিষয়-নিরপেক্ষ। কিন্তু সম্প্রতি আমি যে ব্ল্যাসফেমি, সিনিসিজম্ এবং স্যাটায়ার সম্বন্ধে লিখেছি তাকে ঠিক বিষয়-নিরপেক্ষ বলা চলে না। ওখানে আমি ঠিক নির্বিশেষভাবে কথা বলি নি; বিশেষ কিছু বলবার চেষ্টা করেছি এবং যে সব বস্তু লেখার মধ্যে কোনোকালে আমি ব্যবহার করি না এমন সব সামগ্রী—যুক্তি তর্ক তথ্য ইত্যাদি আমদানি করে ব্যাপারটাকে একটু ওজনে ভারি করে তুলেছি, অর্থাৎ কিনা লেখাগুলো came perilously near প্রবন্ধ। স্বীকার করতেই হবে যে, ইন্দ্রজিৎ তার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করেছে। সে স্বধর্মচ্যুত হয়েছে। স্বধর্ম ত্যাগ করা ঘোরতর অধর্মের কাজ।

অধর্ম কেন তা বলছি। প্রথম যখন লিখতে শুরু করেছিলাম তখন ভেবেছিলাম, গুরুতর বিষয় নিয়ে কখনো লিখব না, বিষয়ের কৌলীন্য মানব না। যে-কোনো বিষয় নিয়ে—সাহিত্যে যা অপাঙক্তেয় তাকে নিয়ে রসসৃষ্টির চেষ্টা করব। আমাদের দেশে বলেছে, নারীরত্ন দুষ্কুলাদপি গ্রহণযোগ্য। এর নিহিতার্থটি রম্য রচনার প্রতিও প্রযোজ্য। ওখানে বিষয়ের শুচিবাই নেই, যে কোনো বিষয় সমাদরে গৃহীত। তুচ্ছ জিনিসকেও সে তাচ্ছিল্য করে না, অকিঞ্চন বিষয় নিয়েও রসসৃষ্টি করে। ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্যে খুব নীচু দরের বিষয় নিয়েও উঁচু দরের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। জি কে. চেষ্টারটন্ এর নাম দিয়েছিলেন—tremendons trifles. বাজে কথাও যে কতখানি কাজের কথা হতে পারে, আমাদের দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার আভাস দিয়েছেন। বাজে কথার মধ্য দিয়েই মানুষের গুণপনা প্রকাশ পায়। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করছি—"যে লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোন কথাই বলিতে পারে না, হয় বেদবাক্য বলে নয় চুপ করিয়া থাকে, হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য, তাহার প্রতিবেশ, শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।" আমি আর কিছু

না হোক্‌, আমার লেখায় ঐ বেদবাক্য জিনিসটি যথাসাধ্য পরিহার করবার চেষ্টা করেছি। তবে লেখকমাত্রই স্বীকার করবেন যে, কাজটা বড় সহজসাধ্য নয়। কারণ বেদবাক্য যত সহজে বলা যায়, রসের বাক্য তত সহজে নয়।

প্রমথ চৌধুরী মশায় ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, আমাদের সাহিত্যে গুণপনাযুক্ত ছ্যাবলামির বড় অভাব। সুখের বিষয় তিনি নিজে সেই গুণপনাযুক্ত ছ্যাবলামির কিঞ্চিৎ চর্চা করে গিয়েছেন এবং আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে করেছেন। তাতে আমাদের ভাষা এবং সাহিত্য দু'-এরই যথেষ্ট মঙ্গল হয়েছে। তিনি যে অভাবের কথা বলেছিলেন ইতিমধ্যে সে অভাবও দূর হয়েছে বলা যেতে পারে। কারণ গত পনেরো কুড়ি বছরে আমাদের বহু লেখক ছ্যাবলামোতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এখন বরং মনে হচ্ছে ছ্যাবলামোটা একটু যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেজন্যেই ইদানীং আমি একটু গম্ভীর মুখ করে গুরুগম্ভীর কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম। এখন দেখছি তারও ফল তেমন ভালো হয় নি। একজন সমালোচক এমন কথাও বলেছেন যে, আমি নাকি ওসব লেখায় অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিয়েছি।

কোনো বিষয়ে সস্তা রকমের একটু রসিকতা করে লিখতে পারলেই আমরা তার নাম দিচ্ছি রম্য রচনা বা belles-lettres ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় লেখা উক্ত জিনিসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, ও জিনিসটা অত সস্তা নয়৭ বাস্তবিকপক্ষে সুসাহিত্য মাত্রই বেল্‌লেত্‌র্‌ সে পাঠকের মনোহরণ করে। সেটা সস্তা রসিকতা দিয়ে সম্ভব নয়। রম্য রচনা বা রমণীয় রচনা রমণীরত্নের মতোই দুর্লভ, তার জন্যে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়। সে মূল্য দেবার মতো সম্পদ সকলের মনে থাকে না। বহু স্মৃতি শ্রুতি জ্ঞানবুদ্ধি রসবোধ মিলিয়ে অতি সমৃদ্ধ একটি মন চাই। হ্যাঁ, পাণ্ডিত্য চাই বইকি; কিন্তু সে পাণ্ডিত্য চাঁচাছোলা পাণ্ডিত্য হলে চলবে না, তাকে রসে ডুবিয়ে ব্যবহার করতে হবে। আমি যাঁকে রম্য রচনার রাজা বলি সেই চার্লস্‌ ল্যাম্‌ এর অধ্যয়ন ছিল বহুবিস্তৃত, কাব্যবারিধি মন্থন করে তাঁর রচনাকে তিনি মণিরত্নহারে সাজিয়েছিলেন। পাণ্ডিত্য তাঁর লেখার মধ্যে রসের আকারে দেখা দিয়েছে। রস আর রসিকতা এক জিনিস নয়।

আমাদের ইদানীং কালের রম্য রচনায় রসের চাইতে রসিকতার দিকে ঝোঁক বেশি। ল্যাম পড়ে দেখুন—কোথাও অট্টহাসির অবকাশ নেই; কিন্তু একটি মৃদু হাস্যরস সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সে হাসি কোথাও আবার অকস্মাৎ বেদনায় বিগলিত হয়ে অশ্রুতে মিলিয়ে যাচ্ছে। হাসি কান্নার হীরা-পান্নার মিশ্রণে এক অপূর্ব সামগ্রীর সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে যে মানুষের ছবিটি স্পষ্টত ফুটে ওঠে তাঁর মুখে হাসি কিন্তু চোখে জল।

লম্ফঝম্প, হাত-পা ছোঁড়া, চেঁচামেচি, অট্টহাসি যেমন মেয়েদের মানায় না তেমনি রম্য রচনাতেও কোনো প্রকার আতিশয্যের স্থান নেই। রমণীর ন্যায় রমণীয় রচনাও অতিশয় ব্রীড়াময়ী। সে স্বভাবত মৃদুভাষিণী আকারে ইঙ্গিতে লাস্যময়ী, কিন্তু তাই বলে কেউ তাঁকে প্রগল্‌ভা বলবে না। পুরুষ-স্পর্শে সহজেই সে মুষড়ে পড়ে, একটুতেই শ্লীলতার হানি হয়। রমণীর মন পেতে হলে যেমন, রমণীয় রচনার মান রক্ষা করতে হলেও তেমনি কথায় আচরণে একটু রসমাধুর্য চাই। শুকনো পণ্ডিতি দেখাতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। 'পয়লা নম্বর' গল্পে পণ্ডিতম্মন্য স্বামীটির যে দশা হয়েছিল, লেখাটিরও সেই দশা হয়। ওখানে স্ত্রী ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল, এখানে রস ঘর ছেড়ে পালায়। শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে যেমন রমণীর মন পাওয়া যায় না, নিছক পাণ্ডিত্য দিয়ে তেমনি কাব্য সরস্বতীরও মন পাওয়া যায় না। প্রশ্ন উঠবে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি তা হলে প্রেমিক বা সাহিত্যিক হতে পারেন না? পারবেন না কেন? খুব পারেন। পাণ্ডিত্য যদি দ্রব হয়ে রস হয়ে দেখা দেয় তা হলে পণ্ডিত ব্যক্তিও রমণীর মনোহরণ করতে পারেন, সাহিত্য সরস্বতীরও কৃপা লাভ করতে সমর্থ হন। মনে রাখতে হবে যে, পর্বতশৃঙ্গে বরফ যখন জমাট বেঁধে থাকে তখন সে অচল। বিগলিত হয়ে যখন নিম্ন-মুখী হয় তখনই সে গতি লাভ করে, দুই কুল ফলে শস্যে পূর্ণ করে প্রবাহিত হয়। জমাট বাঁধা পাণ্ডিত্য কোনো কাজে লাগে না যদি না সে দ্রব হতে জানে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পণ্ডিতদের ঐ দ্রবীকরণের ক্ষমতাটা নেই। ফলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত হতাশ প্রেমিক এবং নীরস লেখকে পরিণত হন।

প্রেম ও প্রেমালাপ

প্রেমের কথা আর প্রেম বিষয়ক কথা এক নয়। একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, অপরটি পুঁথিগত—ইংরেজীতে যাকে বলে অ্যাকাডেমিক। একটিকে বলে প্রেমালাপ, অপরটিকে বলা যায় প্রেমের আলোচনা। প্রথমটির আকর্ষণ গোপনীয়তায়, দ্বিতীয়টির মজলিসিয়ানায়। একজন মানুষ যখন একান্তে আরেকজনের সঙ্গে মন-দেওয়া-নেওয়ার কথা বলে তখন তাকে বলে প্রেমালাপ। সেই একের মুখের কথা যদি দশের কানে যায় তবে আর প্রেমালাপের মান থাকে না। প্রেমালাপ দুজনের, প্রেমের আলোচনা দশ-জনের। দশের আসর না হলে সে আলোচনা জমে না—প্লেটোর প্রেম বিষয়ক Symposium যেমন জমেছিল। তবে একথা নিশ্চিত যে, বিষয় যতই রসালো হোক, অ্যাকাডেমিক আলোচনা শুনবার আগ্রহ বেশি লোকের থাকে না ; কিন্তু সুযোগ পেলে প্রেমালাপ লোকে আড়ি পেতেও শুনতে চায়। অবশ্য এরা জানে না যে, সত্যিকারের প্রেমালাপ আড়ি পেতেও শোনা যায় না ; কারণ, প্রেমের ভাষা সরব নয়, নীরব। প্রেমের কথা বলতে ভাষার প্রয়োজনই হয় না ; নীরব চোখের চাহনি এবং দুই করতল স্পর্শেই মনের সকল কথা স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের আঁকা এই ছবিটি একবার ভেবে দেখুন—

তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ মৌনমাধুরী ধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা
তব করতল মোর করতলে হারা।

একে কি আপনারা প্রেমালাপ বলবেন না? আর এই যে প্রেমালাপ, এ কি আড়ি পেতে শোনা যায়? মদনের পুষ্পবাণ আর যাই হোক, শব্দভেদী

বাণ নয়। প্রেমালাপের এই মজা—সে আলাপ চোখে বরং দেখা যায় কিন্তু কানে শোনা যায়না।

পশ্চিম দেশীয় পুরাণে প্রেমের দেবতাকে বলা হয়েছে অন্ধ, কিন্তু সে দেবতা যে তার ওপরে আবার বোবা এবং কালা সে কথা কেউ বলে নি। এটা আমার মনগড়া কথা নয়; বোবা কেন বলছি, শুনুন। মন যেখানে কানায় কানায় পূর্ণ, মুখের ভাষা সেখানে স্তব্ধ। শূন্য হৃদয় আর শূন্য কলসী সব সময়েই কলকণ্ঠ। প্রেমিক হৃদয় পূর্ণকুম্ভ, সেই কারণেই সে বোবা, তার মুখে কথা ফোটে না। যে প্রেম মানুষ মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে পারে, ধরেই নিতে পারেন সে প্রেম অত্যন্ত অগভীর। আবার প্রেমের দেবতাকে কালা বলেছি এই কারণে যে, প্রেমিক প্রেমিকা একে অন্যের মুখের কথায় সহজে ভোলে না। প্রেমিকা না শোনে ধর্মের কাহিনী। মুখের কথা যতই মিষ্টি হোক, কার্যত প্রমাণ না পেলে প্রেমিকা তা কানেই তোলে না। বলে, থাক, থাক, কাজ নেই সোহাগে, অমন ঢের দেখেছি, ঢের শুনেছি। কাজেই এদের বোবা এবং কালা বললে খুব একটা অন্যায় বলা হয় না।

আমাদের পুরাণে প্রেমের কোনো দেবতা নেই, কামের দেবতা আছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য পার্বতীকে দাম্পত্য প্রেমের দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়, বিবাহের পূর্বে গৌরীপূজার রীতি আছে। তাহলেও আমাদের দেশে সাধারণ মতে মদন বা কামদেবীই প্রেমের স্থলাভিসিক্ত। আমাদের শাস্ত্রে এই দেবতা অন্ধ নন, তাঁকে বলা হয়েছে অবিবেচক। বলেছে, বামঃ কামো নিকাম নিরঙ্কুশঃ অর্থাৎ কামদেবের কাজকর্ম সবই উল্টাপাল্টা এবং তিনি নিরতিশয় বেপরোয়া। বলা বাহুল্য, এসব নিঃসন্দেহে বিবেচনাহীনের লক্ষণ। প্রেমের দেবতা যে বিবেচনাশক্তি রহিত, একথা পশ্চিম দেশীয়রাও স্বীকার করেছেন। ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন কবি বলেছেন, He that louyth is voyde of all reason অর্থাৎ প্রেমে পড়লে মানুষের বিবেচনাশক্তি থাকে না। আসলে অন্ধ এবং অবিবেচক—এই দুটি কথা সমার্থক। বিবেচনাহীন ব্যক্তিকে কার্যত দৃষ্টিহীন বলেই মনে হয়। কারণ, সকলে যা স্পষ্টত দেখতে পায়, প্রেমিক প্রেমিকারা তা দেখেও দেখে না। প্রেমিকের চোখে রূপ-

হীনাকে রূপবতী মনে হয়, বুদ্ধিহীনাকে বুদ্ধিমতী। তেমনি প্রেমিকার চোখে গুণহীন ব্যক্তিকেও গুণধর মনে হয়। প্রেমিকের চোখ সব সময়েই একক আর দেখে। শেক্সপীয়ার যে প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—Sees Helen's beauty in a brow of Egypt—তাতে ঐ অন্ধতারই ইঙ্গিত আছে। মোহকেই বলে অন্ধতা। প্রেমিক প্রেমিকারা যদি চক্ষুষ্মান হত তবে কোনো ক্ষেত্রেই প্রেম তেরাত্তিরও টিকত না। একের চোখে অন্যের স্বরূপ অনায়াসেই ধরা পড়ে যেত। মানুষের রূপ আর স্বরূপ যে এক নয়, সে কথা তারা বোঝে না।

এরা দুজন যে কেবল একে অন্যের সম্পর্কে অন্ধ এমন নয়, সমস্ত চতুষ্পার্শ্ব প্রতিবেশী পরিজন সম্পর্কে অন্ধ। তার প্রমাণ, প্রেমে পড়লে মানুষ এমন বোকার মত ব্যবহার করে এবং হাবার মত কথা বলে যে, অপরে তাই নিয়ে হাসে, কিন্তু তাদের নিজেদের কাছে তা হাস্যকর মনে হয় না। অপরের কাছে নিজেদের যে হাস্যকর করে তুলছে তাও লক্ষ্য করে না। একজন আরেকজনকে নিয়ে মগ্ন, মুগ্ধ—আর কারো কথা ভাববার তাদের সময় নেই। সাধারণ সামাজিক ব্যবহারের একটা ব্যাকরণ আছে, এরা সেই ব্যাকরণ মেনে চলে না। ভালোবাসার ব্যাকরণের নাম মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ। মুগ্ধতা এবং মূঢ়তায় ব্যবধান যৎসামান্য, দুটোই অন্ধতার লক্ষণ। আর প্রেম যে শুধু অন্ধ নয়, বধিরও বটে তার প্রমাণ – প্রেমিক প্রেমিকার অদ্ভুত আচরণ দেখে কত লোক কত কথা বলে, কিন্তু এরা নিজেদের নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত যে, লোকের কথা তাদের কানে কখনো প্রবেশ করে না।

অবশ্য লোকে কি বলবে, পরিণামে কি ঘটবে অত সব ভাবতে গেলে আর প্রেমে পড়া যায় না। প্রেমিক মানুষকে একটু বেপরোয়া বেহিসেবী হতেই হয়। ডি. এল. রায় বলেছেন—তারেই বলে প্রেম, যখন থাকে নাকো ফিউচারের চিন্তা, থাকে নাকো শেম্‌। কথাটা ফেলনা নয়। ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ, লজ্জা শরম ইত্যাদির কথা ভাবতে গেলে এ পথে অর্থাৎ প্রেমের কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। অনেকে প্রেমকে বলেছেন ভীরু স্বভাব। আমি একথা বিশ্বাস করি না। ভীরু প্রেম মাঠে মারা

যায় অর্থাৎ গন্তব্য স্থলে গিয়ে পেঁছায় না। ও ব্যাপারে ইতস্তত করেছেন কি মরেছেন। প্রেমিকা তৎক্ষণাৎ বুঝে নেবে প্রেমিক প্রবরের মুরোদ কতখানি। এইজন্যেই বলেছিলাম, প্রেমিক মানুষকে একটু বেপরোয়া হতে হয়। বেপরোয়া হওয়ার আরো কারণ আছে—প্রেমাস্পদের পছন্দ অপছন্দ, মেজাজ ইত্যাদি এবং তার পিতামাতার মেজাজ, পছন্দ অপছন্দ এক নাও হতে পারে, সে ক্ষেত্রে গোলযোগের আশঙ্কা থাকবেই। আর যদি পরকীয়া ব্যাপার হয় তা হলে তো অবস্থা আরোই বিপজ্জনক হওয়ার কথা। কাজেই রণাঙ্গনের মতো প্রেমাঙ্গনেও বর্ম কুণ্ডল ইত্যাদি ধারণ করে অবতীর্ণ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ অর্থাৎ পিঠে কুলো বেঁধে এবং কানে তুলো গুঁজে নেওয়াই নিরাপদ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যে দেবতার পূজো করতে গিয়ে মানুষ চক্ষু থেকেও অন্ধ হয়, কর্ণ থেকেও বধির হয় এবং বিদ্যাবুদ্ধি থেকেও বিবেচনাশক্তি রহিত হয়, সে দেবতাকে আমরা দেবতা বলব না অপদেবতা বলব। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে এবং অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে তখন তার ওপরে কি কোনো অপদেবতা ভর করে ?

আপনারা ভাবছেন আমি প্রেমের অবমাননা করছি। আমার এক দোষ, গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা করতে গেলেও পরিহাসের সুর এসে যায়। ওটা এখন মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে। গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখতে পারি নে। অমিট্ রায়ের মতো ইন্দ্রজিতের "জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি একটুখানি মুচকি না হেসে মরতেও জানে না।" স্বভাবের দোষ সহজে ছাড়ানো যায় না ; নইলে সত্যি বলতে কি, আমি দেবতা অপদেবতা সকলকেই অত্যন্ত সমীহ করে চলি। স্বভাবদোষে বেফাঁস কথা যদি কিছু বলেও থাকি তাহলেও প্রেমের অবমাননা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্য এবং প্রেম—এই দু'-এর মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। আমার মতে লেখক মাত্রই প্রেমিক এবং প্রেমিক মাত্রই লেখক। আমি আগে বলেছি যে, প্রেমিক মানুষ স্বভাবত মূক কিন্তু একথাও বলা প্রয়োজন যে, প্রেমিকের লেখনী অতিশয় মুখর। সকলেই জানেন যে, যে মানুষের মুখে কথা ফোটে না সে মানুষও দশ পাতার কমে প্রেমপত্র লেখে না। আমি প্রেমের

দেবতাকে শুধু যে ভক্তি করি এমন নয়, ভয়ও করি। কারণ জানি যে, তিনি রুষ্ট হলে আমার লেখনীও আড়ষ্ট হবে। ইংরেজ কবি চসার তাঁর Legende of Goode Women নামক কাব্যের মুখবন্ধে বলেছেন, তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থে তিনি এক নিষ্ঠাহীনার (বলা বাহুল্য প্রেমের ব্যাপারে) কাহিনী লিপিবদ্ধ করে প্রেমের অবমাননা করেছিলেন, এজন্যে দেবতা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে তিরস্কার করেন। চসার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রেমের গুণকীর্তন করে পুণ্যব্রতা পতিব্রতা Goode Women-দের কাহিনী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন। ব্ল্যাসফেমির অপরাধে পাছে দেবতা রোষাবিষ্ট হয়ে আমাকেও অভিশাপ দেন, এই ভয়ে আমি স্থির করেছি, স্বপ্নাদেশের অপেক্ষা না রেখে অবিলম্বে ভক্তিভরে প্রেমের কিঞ্চিৎ মহিমা কীর্তন করব। কিন্তু তার আগে আরেকটা সত্য কথা কবুল করে নেওয়া প্রয়োজন। আমি লেখক মানুষ, আমার কাছে সব চাইতে বড় দেবতা পাঠক। সর্বাগ্রে তাঁদের মন রক্ষা করে চলতে হয়। দেবতা সম্বন্ধে আমার এই বিশ্বাস আছে যে, তিনি কেবলমাত্র মুখের বাক্য শ্রবণ করে আমার বিচার করবেন না। আমার নিভৃত মনের প্রকৃত খবর তাঁর জানা আছে। দেবতা ভুল বুঝবেন না কিন্তু পাঠক অনায়াসেই ভুল বুঝতে পারেন। কারণ written wordকে তাঁরা অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেন। আমার মুখের বাক্য এবং লেখার মন্তব্য যে আমার কথা নাও হতে পারে এ কথা তাঁরা ভাবেন না। আমি মনের কথা লিখি না, মনের মতো কথা লিখি। এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। মনের কথা হল সত্য কথা আর মনের মতো কথা হল রসের কথা। পাঠকের সঙ্গে আমার রসালাপের সম্পর্ক। রসালাপ হচ্ছে প্রেমালাপের nearest approach আপনারা গল্পে উপন্যাসে যে প্রেমের কথা পড়েন তাকে বলে প্রেমের সংলাপ। আমি সংলাপ রচনা করি না, আমি রসের আলাপ করি—সংগীতের ওস্তাদ যেমন সুরের আলাপ করেন। ওস্তাদ আর সমজদারের মধ্যে যে সম্পর্ক, আমার আর পাঠকের মধ্যে সেই সম্পর্ক। এটা প্রেমের সম্পর্ক, কাজেই এ আলাপকে প্রেমালাপও বলা যেতে পারে। তা ছাড়া আমার নিশ্চিত ধারণা আমার ন্যায় আমার

সব পাঠকরাও প্রেমিক স্বভাবের মানুষ। প্রেমিক না হলে লেখক রসস্রষ্টা হয় না, আবার রসগ্রাহী হতে হলে পাঠককেও প্রেমিক হতে হয়। কাজেই প্রেম সম্পর্কে কোনোপ্রকার অবমাননাকর উক্তি করলে পাঠকরা নিঃসন্দেহে আমার ওপরে রুষ্ট হবেন। এজন্যে বলে নেওয়া ভালো যে, ইতিপূর্বে প্রেমিক প্রেমিকা সম্পর্কে আমি যে সব কটূক্তি উচ্চারণ করেছি তা সমস্তই আপাতদৃষ্টিপ্রসূত। কথাটা একটু বিশ্লেষণ করে বললেই রসজ্ঞ পাঠকের কাছে আমার দোষ স্খালন হয়ে যাবে। আপাতদৃষ্টিতে সদ্য-প্রেমে-পড়া মানুষকে বুদ্ধিহীন, বিবেচনাহীন, লজ্জাশরম বিরহিত বলে মনে হয় বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা তা নয়। এরা একান্তভাবে স্বভাবের নিয়মাধীন। সংসারী মানুষ অপরে কি বলবে, কি ভাববে—তাই ভেবে আপন স্বভাবকে অবদমিত করে, তার আচরণ দশের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত হয়। সেই কারণে তার ব্যবহার অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিম। অথচ সংসারী মানুষরা তাদের নিজ আচরণবিধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে প্রেমিকদের আচরণকে বলে অস্বাভাবিক। বাস্তবিকপক্ষে প্রেমিকদের ব্যবহার যতখানি স্বাভাবিক এমন আর কারো নয়। এরা শিশুর মত সরল; শিশু যেমন একান্তভাবে স্বভাবের অনুশাসন মেনে চলে এরাও তেমনি। শিশুকে কেউ নির্বোধ বলে না; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ যখন স্বভাবের প্রেরণায় সহজ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার করে তখন তাকে আমরা বলি নির্বোধ। সভ্যতার আদর্শ মতে স্বভাবকে যে পরিমাণে দমন করা যায় বুদ্ধির উৎকর্ষ সেই পরিমাণে প্রকাশ পায়। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ না রাখলে প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়। মনে রাখতে হবে যে, প্রেমিক যুগল যে জগতে বাস করে সে জগৎ আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাসজীর্ণ জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সে জগতে সাময়িকভাবে দুজন মাত্র অধিবাসী—সেখানে সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এই জীবনের কলরব। অনেক কাল আগে দেখা 'কুইন ক্রিস্টিনা' নামক সুপ্রসিদ্ধ ছায়াছবির কথা মনে পড়ছে। রানী ক্রিস্টিনা জনৈক বিদেশী রাজদূতের প্রেমে পড়েছিলেন। উক্ত রাজদূত স্বদেশে প্রত্যাগমন করলে বন্ধুরা কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওদেশের

জনসংখ্যা কত ? ভদ্রলোক তখন প্রেমিকার চিন্তায় মশগুল। অন্যমনস্ক-ভাবে জবাব দিলেন, দুজন। আপাতশ্রবণে জবাবটা হাস্যকর মনে হলেও আমি বলব, ভদ্রলোক খুবই সত্য কথা বলেছিলেন। কারণ তাঁর জগতে অন্য কোনো জনপ্রাণীর স্থান ছিল না। আরেকটি কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। প্রেমিকদের ব্যবহারে আমাদের চোখে যা কটু ঠেকে, আমরা যাকে বলি নির্বুদ্ধিতা বা নির্লজ্জতা, তাঁদের নিজেদের চোখে তার চাইতে মনোরম এবং মনোহর আর কিছু নেই। প্রেমিকের পক্ষে নির্লজ্জতা লজ্জার ব্যাপার নয়। আমাদের প্রেমিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে 'নিলাজ', বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন —'নিলাজ কানু'। কিন্তু তাই বলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রী এতটুকু নষ্ট হয় নি।

আমি গোড়ার দিকে প্লেটোর Symposium-এর উল্লেখ করেছিলাম। প্লেটো সেখানে প্রেম সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তাতে বলেছেন, প্রেমের দেবতা ঠিক দেবতাও নয়, মানুষও নয়—এ দু-এর মাঝখানে তাঁর স্থান। তিনি তাঁকে বলেছেন স্পিরিট, অতিশয় সূক্ষ্মধর্মী এক স্পিরিট। দেবতা এবং মানুষের মধ্যবর্তী বলে তাঁর মধ্যে উভয়ের গুণ সন্নিপাত ঘটেছে। বলা যেতে পারে—অর্ধেক মানব তুমি, অর্ধেক দেবতা, সংক্ষেপে নরদেবতা। স্বর্গ-মর্ত্যের সন্ধি-স্থলে তার বাস। প্রেমের অস্তিত্ব না থাকলে দেবতার স্বর্গ এবং মানুষের মর্ত্য সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যেত। প্রেম এই দু-এর মিলনসেতু রচনা করেছে। কথাগুলো খানিকটা তত্ত্বকথার মতো শোনাচ্ছে। বলা বাহুল্য তত্ত্বের মধ্যেও সত্য থাকে, তথ্যই একমাত্র সত্য নয়। প্লেটো লিখিত সুসমাচারে আমার আস্থা আছে ; তাঁর দেওয়া প্রেমের ব্যাখ্যা আমি মেনে নিয়েছি। তা ছাড়া আমার নিজের ধারণা যে মানুষ প্রেমিক সে নিজেও মর্ত্যবাসী স্পিরিট। সে অতিশয় সূক্ষ্মধর্মী মানুষ অতিশয় সূক্ষ্মমনা বলেই তার চলন বলন আচরণ অন্যদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। তার শ্রেয় এবং প্রেয় সংসারের শ্রেয় এবং প্রেয়র সঙ্গে মেলে না। এইজন্যেই সংসারী মানুষরা প্রেমিকদের কখনো বলে বোকা, কখনো বলে পাগল। প্রেমিককে প্রেমিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয় ; সংসারী, হিসেবী দৃষ্টি দিয়ে দেখি বলেই তার ব্যবহার আমাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে।

প্রেমের বিচিত্র গতি, এজন্যে সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে তার গতির ছন্দ মেলে না। আমরা তাকে বলি অদ্ভুত, বেচারীকে প্রচুর ঠাট্টা বিদ্রূপ সইতে হয়। অমুকে প্রেমে পড়েছে কথাটা এমনভাবে বলি যেন মস্ত বড় একটা কৌতুকের ব্যাপার। তা ছাড়া, এমনি একটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে যে, বাছাধন এবার মজাটি বুঝবেন। আমাদের আধুনিক কবি বলেছেন, প্রেমে পতন ছাড়া আর কিছু নেই। সিনিক্যাল উক্তি যাঁদের পছন্দ, তাঁদের কাছে কথাটা ভাল লাগবে। তবে আমার মনে এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই যে, যে মানুষ একবার প্রেমে পড়তে পেরেছে, সে সকল পতন থেকে রক্ষা পেয়েছে। কারণ, সে পরম প্রেয় এবং শ্রেয়কে লাভ করেছে। এজন্যে প্রেমিক মানুষকে আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। কোনো মানুষ যদি দুদিনের জন্যেও কাউকে ভালোবেসে থাকে তো আমি বলব ঐ স্বল্পকালের জন্য he is a better man than he has ever been.

কারণ, প্রেমের মতো শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা আর কিছু নেই। প্রেমিক মানুষের মন যেমন স্নিগ্ধ, যেমন নম্র, যেমন মার্জিত, এমন আর কারো নয়। এ ছাড়া আমার মতে, কাউকে ভালোবাসতে পারা এবং কারো ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন হয়, বেশির ভাগ মানুষেরই সে প্রতিভা থাকে না। এ জন্য প্রেমিক মানুষ মাত্রকেই আমি প্রতিভাবান মানুষ বলে মনে করি।

মহাকাব্যের কবি মধুসূদন

মহাকবি হতে গেলে মহাকাব্য রচনা করতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। মধুসূদন যদি মেঘনাদবধ রচনা না করে শুধু সনেট ক'টি লিখে যেতেন তাহলেও তিনি আমাদের প্রথম শ্রেণীর কবি বলে গণ্য হতেন। মহাকাব্যের চল এ যুগে উঠে গিয়েছে। এ যুগের কোনো মহাকবিই মহাকাব্য রচনা করেন নি—শেক্সপীয়ার না, গ্যয়টে না, রবীন্দ্রনাথ না। মধুসূদনের কৃতিত্ব এই যে, তিনি মহাকাব্য রচনা করেও মহাকবি বলে পরিচিত হতে পেরেছেন। কাজেই মধুসূদনকে জানতে হলে, বুঝতে হলে মহাকাব্যের রচয়িতা হিসেবেই তাঁকে জানতে হবে।

অভিধান মতে কোনো পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত সুবৃহৎ কাব্যকেই বলে মহাকাব্য। সাধারণতঃ মহাকাব্য বলতেই আমরা মনে করি সেটি একটি মহাকায় কাব্য। আসলে কিন্তু কায়া দিয়ে এর বিচার নয়। মহাকাব্য কেবলমাত্র বৃহৎ কাব্য নয়, মহৎ কাব্য। আবার সে কাব্যই মহৎ যার জগৎটা বৃহৎ। অবশ্য কালে কালে সব জিনিসেরই আকৃতি প্রকৃতি বদলে যায়। মহাকাব্য সম্বন্ধেও প্রচলিত ধারণা ক্রমে বদলে যাচ্ছে। প্রাচীন কালের সব অতিকায় জীব যেমন ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে—সাহিত্যসংসার থেকেও বৃহদাকার মহাকাব্য তেমনি অন্তর্ধান করছে। তাছাড়া সব সময়েই যে পুরাণবর্ণিত কিংবা ইতিহাস ঘটিত কোনো কাহিনীকে আশ্রয় করেই মহাকাব্য রচনা করতে হবে এমনও নয়। এই ধরুন, টি. এস. এলিয়ট যে Waste Land নামক কাব্য রচনা করেছেন সেটি অতিশয় সংক্ষিপ্ত—সব মিলিয়ে পাঁচশো লাইনও নয়—তাহলেও তাকে এ যুগের মহাকাব্য বলা যেতে পারে। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক বহু ঘটনার ইঙ্গিত থাকলেও কোনো বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে এ কাব্য রচিত নয়। তথাপি একে মহাকাব্য বলছি এই কারণে যে, এর মধ্যে মহাকাব্যের ব্যাপকতা আছে, এ যুগের সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কাব্য

রচিত। মহাকাব্যের অন্যান্য গুণ—ভাবগাম্ভীর্য, ভাববিন্যাসের সৌকর্য এবং অনন্যসাধারণ কলাকৌশল—এ সমস্ত গুণই তাতে বিদ্যমান। সর্বোপরি একটি সুবিন্যস্ত জীবনদর্শনেরও ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথও আভিধানিক অর্থে মহাকাব্য রচনা করেন নি। কিন্তু তিনি যে অসংখ্য গীতধর্মী কবিতা রচনা করেছেন তাদের সম্মিলিত মূর্তি ব্যাপকতায় গভীরতায় ব্যঞ্জনায় সুষমায় যে কোনো মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। মধুসূদনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পরবর্তী বাঙালী কবিরা অনেকেই মহাকাব্যে হাত মক্‌স করেছিলেন। কবি-জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের মনেও বোধকরি মহাকাব্য রচনার একটা অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত ছিল। ঐ যে পরিহাসের সুরে বলেছিলেন—"আমি নামব মহাকাব্য সংরচনে ছিল মনে"—সেটা একেবারে উড়িয়ে দেবার কথা নয়। বিশেষ করে শেষটায় যে কথাটি বলেছেন তাতে আমার পূর্বোক্ত বক্তব্যটির সমর্থন আছে। গীতিকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁকে এমনভাবে সম্মোহিত করেছিলেন যে, মহাকাব্যের কল্পনাটি "গেল ফাটি হাজার গীতে।" বলেছেন, "মহাকাব্য সে অভাব্য দুর্ঘটনায় পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।" অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন যে, সেই কণাগুলোকে একত্রে মিলিয়ে দেখতে পারলে তার মধ্যেই তাঁর কল্পিত মহাকাব্যটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ জীবনের একটি সমগ্র চিত্র এর মধ্যে ধরা পড়েছে। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আধুনিক পাঠকের কাছে মহাকাব্য তার পূর্বতন সংজ্ঞা এবং অঙ্গসজ্জা ঘুচিয়ে দিয়ে ক্রমে ভিন্ন মূর্তি ধারণ করছে।

মধুসূদন অবশ্য পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে প্রচলিত রীতি অনুসরণ করেই তাঁর মহাকাব্য রচনা করেছেন। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিলটন তাঁর গুরু। তাঁদের প্রদর্শিত পথেই তিনি চলেছেন। কিন্তু প্রকৃত কবি এবং শিল্পীর এই বিশেষত্ব যে, তাঁরা প্রচলিত রীতি অনুসরণ করলেও কখনোও গতানুগতিক পথে চলেন না। তাঁদের সৃষ্টি আপন বৈশিষ্ট্যের গুণে বিশিষ্ট, আপন প্রতিভার ছাপ তাতে পড়বেই। মধুসূদন তাঁর কাহিনীটি কবিগুরু বাল্মীকির কাছ থেকেই ধার করেছেন। কিন্তু সে জিনিসকে তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করলেন তাতে শুধু যে তার রূপান্তর ঘটেছে এমন নয়,

গোত্রান্তর ঘটেছে বলতে হবে; কারণ সে কাহিনীর মূল আবেদনটিকেই তিনি বদলে দিয়েছিলেন। প্রতিভার স্পর্শে পুরাতনও নতুন হয়ে যায়। শেক্সপীয়ারের বেলায়ও এই জিনিসটি দেখা গিয়েছে। তাঁর নাটকের মাল মসলা তিনি সেকালের বহুল প্রচলিত কতকগুলো কাহিনী থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতে পড়ে সে সব ভূতপূর্ব কাহিনী এমন অভূতপূর্ব রূপ ধারণ করল যে, তাদের আর চেনাই যায় না। মধুসূদনও তাই করেছেন। পুরাতন কাহিনীটিকে ঘষে মেজে শুধু যে তার রূপ পরিবর্তন করেছেন এমন নয়, আগেই বলেছি, তিনি তার স্বরূপও বদলে দিয়েছিলেন। বাল্মীকির রাম-রাবণ আর মধুসূদনের রাম-রাবণ এক নয়। রঘু-পতি-রাঘব-রাজা-রাম মধুসূদনের চোখে ভিখারী রাঘব। রাবণই তাঁর কাছে 'হিরো'র আসন লাভ করেছেন। বাল্মীকি রচনা করেছেন রামায়ণ, মধুসূদন রচনা করেছেন রাবণায়ন।

ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী বলে সে যুগে কিছু বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, এখন লোকে তা ভুলেই গিয়েছে। কারণ কাব্যবিচারে লৌকিক ভক্তি-বিশ্বাসের ঐতিহ্যটাই বড় কথা নয়, কাব্যের নিজস্ব একটা ঐতিহ্য আছে, সেটা শিল্পরসবোধের ঐতিহ্য। কবি যে আবেদনের সৃষ্টি করেন পাঠকের মনকে যদি তা স্পর্শ করে তাহলেই তাঁর সৃষ্টি সার্থক। রঘুকুল-পতির চাইতে তিনি যে রক্ষকুলপতির প্রতিই অধিকতর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, সে অনুভূতি পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে থাকলে বোঝা যাবে যে, শিল্পের আবেদন ঐতিহ্যের আবেদনের চাইতে বড়। মিলটনও তাঁর Satan-কে যথেষ্ট তেজবীর্যের অধিকারী হিসেবে দেখিয়েছেন, নানা গুণে গুণান্বিত করে দেখিয়েছেন। তাই যদি না হত তাহলে সর্বশক্তিমান বিধাতা-পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হতেন। সেদিক থেকে বাইবেল-এর Satan আর মিলটন-এর Satan এক নয়। কবি-মানুষরা নীতিবাগীশ নন, তাঁদের কাছে নীতির চাইতে শিল্পের দাবি বড়।

প্রতিভা জিনিসটা কখনই নিয়মতান্ত্রিক নয়। সে নিয়মমতে চলে না, সমান পথেও চলে না। বেড়া ভেঙে, আল ভেঙে, দুর্গম পথে আপন খুশি-মতো এগিয়ে চলে। মধুসূদনের প্রতিভা সেই বাঁধভাঙা বাঁধন-ছেঁড়া দুঃসাধ্য

সাধনের প্রতিভা। বিষয়বস্তুর বেলায় যেমন পুরাতনকে নতুন আকার দিয়েছেন, প্রকাশভঙ্গিতেও তেমনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এ যাবৎ বাঙলা পদ্যের গতি ছিল আড়ষ্ট, পয়ারের ছন্দে চলি-চলি পা-পা করে চলত; প্রতি দু পা এগিয়ে একবার দম নিতে হত। পাখী যদি তার পাখার ব্যবহার না করে শুধু দু পায়ের সাহায্যে চলে তখন তার গতি যেমনটা হয় তেমনি। সেটা তার স্বাভাবিক গতি নয়। প্রতি পদে যদি বিরতি ঘটে তাহলে গতির ধর্ম ব্যাহত হতে বাধ্য। মধুসূদন বাঙলাকাব্যের পায়ের বাঁধন অর্থাৎ পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে অবিরাম গতির স্বাচ্ছন্দ্য দিলেন। আমাদের ভাষায় ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে বলে পদ। এজন্যে কবিতাকে আমরা সাধারণ কথায় বলেছি পদ্য, আর যিনি সে পদ-রচনা করেন তাঁকে বলেছি পদকর্তা। ফলে কবি এবং কাব্য উভয়কেই আমরা একটু ছোট করে দেখেছি। মিল দেওয়া পদ্য হলেই কাব্য হয় না, আর পদ্যরচয়িতা হলেই কবি হয় না। কারণ কবি শুধু অক্ষরের মিল খোঁজেন না। ভাষার একটা নিজস্ব melody আছে, তিনি সেই melody-কে আবিষ্কার করেন। প্রতি দুই পঙ্‌ক্তিতে মিল না রেখে ভাষার সুর তাল বা মেলডি রক্ষা করে যথাযোগ্য স্থানে যতির ব্যবহার করেন। আমাদের কাব্যে মধুসূদনই সর্বপ্রথম এই কাজ করলেন। তিনি যাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলেছেন, সেটি প্রকৃতপক্ষে অক্ষরের মিত্রতা বা মিল বর্জন করে ভাষার মিত্রতা অর্জন। ভাষার অন্তর্নিহিত সুর এবং ছন্দকে জাগ্রত করে দিয়ে তিনি বাঙলা ভাষার যথার্থ কাব্যিক চরিত্রটিকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

> "সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
> বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে,"

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন মেঘনাদবধ-এর সেই হঠাৎ থম্‌কে যাওয়া লাইনটা। শুধু লাইনটাই তো থম্‌কে যাওয়া নয়, সমস্ত বাঙলা দেশই বিস্ময়ে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল এই ভেবে যে, আমাদের এতকালের পরিচিত ভাষার মধ্যে এমন সুর তান মাত্রা লুক্কায়িত ছিল! এছাড়া সাধারণতঃ দেখা যায়

মহাকাব্যের বিষয়বস্তুটি একটু গুরুগম্ভীর রকমের। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাষার মধ্যেও সেই গাম্ভীর্যটি আনতে হয়। ভাবলে খুব অবাক লাগে যে, আমাদের ভাষার অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থায়ও মধুসূদন ঐ সামঞ্জস্যটি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। আমি যাকে সাধারণ কথায় ভাষার গাম্ভীর্য বলছি কাব্যালোচনায় একে বলা উচিত ভাষার সমারোহ, ইংরেজীতে যাকে বলে grandeur। এতখানি grandeur যে আমাদের ভাষার সাধ্যায়ত্ত ছিল মধুসূদনই সর্বপ্রথম সে বিষয়ে আমাদিগকে অবহিত করলেন।

সাধারণ পাঠকের কাছে মধুসূদন মহাকাব্য রচয়িতা হিসেবে পরিচিত, যদিচ খাঁটি মহাকাব্য বলতে তিনি একখানাই রচনা করেছেন – সেটি মেঘনাদবধ কাব্য। তাঁর প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভব-কে তিনি নিজে মহাকাব্য আখ্যা দেন নি, বলেছেন, 'মহাকাব্য জাতীয় কাব্য'। এর কারণ কাব্যশাস্ত্র মতে মহাকাব্যে কমপক্ষে আটটি সর্গ থাকা প্রয়োজন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যটি চার সর্গে সমাপ্ত অর্থাৎ আকারে-প্রকারে এটিকে পুরোপুরি মহাকাব্য বলা চলে না। এটি সুন্দ-উপসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ঐ দুই অসুর ভ্রাতার বলে-বীর্যে দেবতারা ভীত, সন্ত্রস্ত। অনন্যোপায় হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলেন। ব্রহ্মা বিশ্বের সর্ববিধ সৌন্দর্য তিল তিল করে তুলে নিয়ে তিলোত্তমা নামে এক অপরূপা অপ্সরার সৃষ্টি করে অসুরদের রাজ্যে প্রেরণ করলেন। তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে সুন্দ-উপসুন্দ উভয়ে তাঁকে পাবার জন্যে লালায়িত হল। ফলে দুই ভ্রাতায় বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ। দ্বন্দ্বযুদ্ধে উভয়ের মৃত্যু। দেবতারা বিপদমুক্ত হলেন, তিলোত্তমা নক্ষত্রের রূপ ধারণ করে নভোমণ্ডলে স্থান গ্রহণ করলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু সকলেরই জানা আছে। নয় সর্গে সমাপ্ত এই কাব্য আকারে প্রকারে সৌষ্ঠবে বিষয়গৌরবে মহাকাব্যের সকল দাবিই পূরণ করেছে। বর্ণনে চিত্রণে বাচনভঙ্গিতে বহু স্থানে হোমার ভার্জিলের অনুকরণ সুস্পষ্ট; কিন্তু প্রতিভাগুণে সমস্তই নিজস্ব করে নিয়েছেন। কোথাও অসঙ্গতি নেই।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। রেনেসাঁসের প্রবল উদ্দীপনা ইংল্যাণ্ডের জীবনে যে নাটকীয় সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিল তার

থেকেই এলিজাবেথীয় নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল। মধুসূদনের যুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্ঘাতেও বাঙলাদেশেও এক নবজীবনের জোয়ার এসেছিল। তাকেও আমরা রেনেসাঁস আখ্যা দিয়েছি। নানাদিক থেকে বাঙালী-জীবনেও এক নাটকীয় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সেদিনের সেই উদ্দীপনায় নতুন এক নাট্যসাহিত্য সৃষ্টিই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে শতাধিক বর্ষ পূর্ব থেকেই নাটকের একটি tradition ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। আমাদের সে tradition ছিল না। মাতৃকোষে বিবিধ রতনের মধ্যে নাটক ছিল না। তথাপি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মাতৃভাষার সেবায় মধুসূদন সর্বপ্রথম নাটকেই হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমাদের সদ্যোজাত নাটকের ক্ষেত্রে কোনো মহৎ কীর্তি রেখে যাওয়া খুব সহজসাধ্য হবে না। কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা কতকটা পথ তবু এগিয়ে ছিলাম। সেখানে শক্তি পরীক্ষার এবং নতুন পথে নতুনতর অভিযানের অবকাশ বেশি। প্রতিভাবানের প্রতিভাই তাঁকে বাঞ্ছিত পথে নিয়ে যায়। অরেকটি কথা মহাকাব্য যিনি রচনা করবেন তাঁর জীবনের মধ্যেই মহা-কাব্যের উপকরণ সঞ্চিত থাকে। দান্তে মিলটনের জীবনে যেমন, মধুসূদনের বেলায়ও তেমনি মহাকাব্যের উপকরণ তাঁর জীবনের মধ্যেই নিহিত ছিল। মানুষের জীবনে যা কাম্য—কুলশীল, ধনমান, বিত্তাবুদ্ধি, প্রতিভা কোনো কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। তথাপি জীবনের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকেছে—দুঃখ-দৈন্য নিরাশায় জীবন বিধ্বস্ত হয়েছে। রক্ষকুলপতির স্বর্ণলঙ্কা যেমন ধ্বংস হয়েছে এও তেমনি। প্রতিভার উন্মাদনায়, ঐশ্বর্যের স্বপ্নে লঙ্কাধিপতির মতোই তিনিও গর্বিত উদ্ধত দৃপ্তস্বভাব। দুই-এর মননে বচনে স্বভাবে আশ্চর্য মিল। পরিণতিও এক। কাব্যের উপসংহারে রাবণের বিলাপ—'কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?' আর জীবনের অন্তপর্বে মধুসূদনের নিজ বিলাপ—'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!' একই ভগ্নহৃদয়ের হতাশ্বাস। এইজন্যেই বলতে চেয়েছি যে, মহাকবির জীবনই একটি মহাকাব্য। Samson Agonistes যেমন মিলটনের জীবননাট্য, মেঘনাদবধ তেমনি মধুসূদনের জীবনকাব্য।

নাটকের নাটকীয়তা ও দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গে

কাব্যসৃষ্টির প্রথম যুগে কাব্য গান করে শোনানো হত, অর্থাৎ কাব্যসুধা শ্রোতার কর্ণে বর্ষিত হত। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে কাব্য যখন কেবলমাত্র শ্রবণের জিনিস না হয়ে পঠনের জিনিস হল তখন খুব স্বাভাবিক কারণেই কাব্যের স্বভাব গেল বদলে। নাটকের বেলায়ও তাই ঘটেছে। নাটকের আদি যুগে তাকে সর্বাগ্রে লোকসমক্ষে হাজির করতে হত। লোকে তাকে চোখে দেখত, কানে শুনত। কাব্যের মতো নাটকও পরবর্তী কালে কেবলমাত্র শ্রবণ এবং দর্শনের বস্তু না হয়ে পঠনের সামগ্রী হয়েছে। ফলে তারও স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এটি হতে বাধ্য, কারণ শিল্পবস্তু যেভাবে মানুষের গোচরীভূত হবে তার উপরে তার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করবে। শিল্প ছেড়ে দিয়ে প্রথমে খুব সহজ একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আগে চিকিৎসকরা স্টেথেস্‌কোপের সাহায্যে কানে শুনে রোগনির্ণয় করতেন, এখন এক্স-রে প্লেটের সাহায্যে চোখে দেখে রোগনির্ণয় করেন। ফলে চিকিৎসা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পবস্তুর রসগ্রহণে যখন যে ইন্দ্রিয়—দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি—প্রাধান্য লাভ করছে সেই অনুযায়ী শিল্পের ফর্ম এবং টেকনিকের পরিবর্তন হচ্ছে। ইদানিং বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি প্রখরতর হয়েছে। মানুষ দূরের জিনিসকে নিকটতর করে দেখছে, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের শব্দ ঘরে বসে শুনছে। নাটক যা এককালে রঙ্গমঞ্চের জন্যই রচিত হত—এখন অনেকে তা আদৌ চোখে দেখছে না, রেডিয়োতে শুনছে কিংবা গ্রামোফোন রেকর্ডে। এসমস্তের প্রভাব পরোক্ষভাবে শিল্পসাহিত্যের উপরে এসে পড়বেই। অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, সাম্প্রতিক কালের বেশির ভাগ নাটক অভিনয়-নিরপেক্ষ-ভাবে লেখা। ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত না করে ঘরে বসে

পড়েও এর রসগ্রহণ করা যাবে। নিশ্চয় যাবে; কিন্তু যার যেখানে স্থান সেখানে সে এক, অন্যত্র আর। গ্রীনরুমের জিনিসকে ড্রয়িংরুমে আনার ফলে ওর স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। দর্শক নেই বলে সাজসজ্জার জলুস নেই, চেহারা হয়েছে আটপৌরে। শ্রোতা নেই বলে এখন আর চেঁচিয়ে কথা বলে না। বসনে এবং ভাষণে অত্যন্ত সংযত। এককথায় আধুনিক নাটক নিরাভরণ এবং মৃদুভাষী। অর্থাৎ কিনা আধুনিক নাটক যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় নয়।

এসব কথা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে এইজন্য বলছি যে, তিনি তাঁর নাটক মুখ্যতঃ রঙ্গমঞ্চের জন্যেই লিখেছিলেন। দর্শক এবং শ্রোতার জন্যে লিখেছেন, পাঠকের জন্যে নয়। এ কথা যে সত্য তার অন্যতম প্রমাণ— তাঁর যে দু-একটি নাটক তাঁর জীবদ্দশায় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নি, দেখা যাচ্ছে, সে নাটক তাঁর জীবিতকালে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় নি। একান্তভাবে রঙ্গমঞ্চের জন্য অভিপ্রেত বলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নাটকীয় ভঙ্গি অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকট। এই কারণে কোনো কোনো সমালোচক তাঁর নাটক সম্পর্কে অতি-নাটকীয়তার অভিযোগ এনেছেন। নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যে নাটকের অবিচ্ছেদ সম্পর্ক সে কথা ভুলে গেলে নাটক এবং নাট্যকার উভয়ের প্রতি অবিচার হবার আশঙ্কা থাকে। এলিজাবেথীয় যুগের সব নাট্যকার সম্পর্কেই আতিশয্যের অভিযোগ আনা সহজ, কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সে যুগে নাটক দেখারই রীতি ছিল, পড়ার রীতি ছিল না।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, নাটককে সর্বাগ্রে নাটকীয় হতে হবে। এর কারণ অতি সুস্পষ্ট—যেখানে চোখে দেখে এবং কানে শুনে কোনো জিনিসকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় সেখানে খানিকটা অঙ্গভঙ্গি দৃষ্টিগোচর এবং বাক্যভঙ্গি কর্ণগোচর হওয়া প্রয়োজন। নাটকের ভাষাকে সে অনুযায়ী খানিকটা অভিনয়-অনুসারী হতে হয়। এই ভাবা এবং ভঙ্গিকেই আজকাল আমরা নাটকীয় বা theatrical বলে অপবাদ দিচ্ছি।

'নাটকীয়' কথাটিকে আজকাল এমন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেন যা-কিছু অসম্ভব অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত তাই নাটকীয়। নাটককে

সর্বদা স্বভাব-সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ তাকে দেয় নি। প্রথমেই ধরুন, নাটকের জন্মকাল থেকে বেশ কয়েক শতাব্দী একাদিক্রমে কাব্য ছিল নাটকের বাহন। অথচ এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, মানুষ কথাবার্তা কোনো কালেই কবিতায় বলে নি, আজও বলে না। অথচ নাটকে ছন্দোবদ্ধ কথাবার্তা কখনোই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় নি। শেক্সপীয়ার-নাটকের কাব্যগুণ তাঁর নাট্যগুণের প্রধান সহায়ক। এটা খুব যদি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হত তা হলে এই বিংশ শতাব্দীতে verse-drama পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা হত না। আমার বক্তব্য হল, নাটকের পাঠক—বিশেষ করে দর্শক—যদি তাঁর সম্ভাব্যতার ধারণাটিকে একটু ঢিলে না করে নেন তা হলে নাটকের রস পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কোলরিজ তাঁর কাব্যবিচারে যে suspension of disbelief এর কথা বলেছেন নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও সেটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গ্রীক বীর সেলুকস, মোগল সম্রাট শাজাহান কিংবা কোনো রাজপুত রমণী যখন বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় কথা বলতে থাকেন তখনই বলতে হবে যে, নাট্যকার সম্ভাব্যতার সীমাকে লঙ্ঘন করে গিয়েছেন। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? শেক্সপীয়ারের রোম্যান হিরোরা সকলেই এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজী ভাষায় কথা বলেছেন। তাতে সে নাটকের রসসম্ভোগে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয়েছে বলে কেউ বলবে না। ভাষার কথা ছেড়ে দিয়ে প্লট বা কাহিনীবন্ধনের ব্যাপারেও কখনো কখনো সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া খুব বিচিত্র নয়। বাস্তবে এবং সম্ভাব্যে খানিকটা ব্যবধান অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবধানকেই অতি-নাটকীয়তা আখ্যা দিয়ে আমরা জাতে ঠেলবার উপক্রম করেছি।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে সাময়িক ভ্রান্তি উৎপাদনই নাট্যকারের লক্ষ্য। দক্ষ অভিনেতাও নাট্যকারের এই উদ্দেশ্যটিকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেন। ভাষাবিজ্ঞানীরা জানেন, ইংরেজীতে আমরা যাকে বলি hypocrite গ্রীক ভাষায় তাকে বলে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অর্থাৎ hypocrisy হল অভিনেতার (অংশতঃ নাট্যকারেরও) প্রধান গুণ। আধুনিক নাট্য-সমালোচনায় ঐ hypocrisy কথাটিকেই একটু মোলায়েম করে বলা

হয়েছে illusion-এর সৃষ্টি। অবশ্য এই illusion সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। একদল মনে করেন অভিনয়-দর্শনকালে দর্শকরা সাময়িকভাবে বেমালুম ভুলে যাবেন যে, সমস্ত ব্যাপারটাই কাল্পনিক। অলীককে তাঁরা বাস্তবের সত্য বলে গ্রহণ করবেন। অপর পক্ষে ডক্টর জন্সন্ তাঁর শেক্সপীয়ার-ভাষ্যের মুখবন্ধে বলেছেন, দর্শকরা নিছক আনন্দ উপভোগের জন্যেই থিয়েটারে আসেন, তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও ভোলেন না যে, সমস্ত ব্যাপারটাই কল্পনার সৃষ্টি, বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক শিথিল। নাটকের গুণাগুণ বিবেচিত হবে 'according to its adherence to logical probability and general human nature'। কোলরিজ এই দুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতে দর্শক পুরোপুরি মোহগ্রস্ত নয় আবার পুরোপুরি মোহমুক্তও নয় (neither deceived nor wholly undeceived)। তিনি দর্শকের এই মনের অবস্থাকেই dramatic illusion আখ্যা দিয়েছেন। পূর্বোল্লিখিত suspension of disbelief এবং অভিনেতার দক্ষতা—এই দুইয়ে মিলে dramatic illusion-এর সৃষ্টি হয়। এই ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্যে নাট্যকার এবং অভিনেতাকে যেসব চাতুর্যের (hypocrisyও বলতে পারা যায়) সাহায্য নিতে হবে তারই উপরে নির্ভর করবে নাটকের নাটকীয়তা।

অন্যান্য সব শিল্পের ন্যায় নাটকও বাস্তব বা রিয়ালিটির অনুকরণ, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, অনুকৃতি (imitation) এবং প্রতিকৃতি (copy) এক জিনিস নয়। অনুকরণ কথাটির মধ্যেই এই ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে, বাস্তব এবং তার অনুকৃতির মধ্যে খানিকটা ব্যবধান থাকতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, এই ব্যবধানটুকুই এর বৈশিষ্ট্য এবং রসসৃষ্টির প্রধান সহায়ক। বলতে গেলে এটি শিল্পের অঙ্গ। খ্যাতনামা ইংরেজ সমালোচকের মতে—'A certain quantum of difference is essential to imitation, and an indispensable condition and cause of the pleasure we derive from it'। শিল্প মাত্রই বাস্তবকে অনুসরণ করে, কিন্তু অনুসরণ করতে গিয়ে তাকে অতিক্রমও করে।

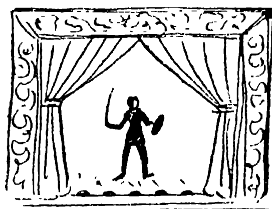
বাস্তবকে ছাড়িয়ে যেটুকু, তার মধ্যেই রস। নাটকের মধ্যে ঐ অত্যাবশ্যক ব্যবধানটুকুর নামই নাটকীয়তা। অবশ্য আমাদের অতি বাস্তব প্রাত্যহিক জীবন নাটকীয়তা-বর্জিত এমন কথা কখনোই বলব না। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম দ্বন্দ্ব, সন্তানবাৎসল্য, পিতা পুত্রের কলহ, ভ্রাতৃবিরোধ, আত্মীয় পরিজনের স্নেহ প্রেম ঈর্ষা বিদ্বেষ—এ সমস্তই নাটকীয় কিন্তু অতি-পরিচয়ে ম্লান। রঙ্গমঞ্চে এর পুনরাবৃত্তি দেখে আমরা তৃপ্তি পাই না যদি না এর মধ্যে আকস্মিকের বা অপ্রত্যাশিতের রোমাঞ্চ খানিকটা মিশ্রিত থাকে। যেটুকু আমাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার এবং সদাপরিচিত অভিজ্ঞতার বাইরে সেটুকুই যথার্থ নাটকীয়।

হাল আমলের নাটক (বিশেষ করে পশ্চিম দেশীয়) অতিমাত্রায় স্বাভাবিক হতে গিয়ে নিজের স্বভাবকেই বিসর্জন দিয়েছে। এসব নাটক চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের এমন হুবহু প্রতিচ্ছবি যে, তাকে নাটক বলে চেনাই দুষ্কর। নাট্যকাররা গর্ব করে বলে থাকেন যে, এর প্রত্যেকটি একটি slice of real life, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের একটি জলজ্যান্ত টুকরো যেন নাট্যমঞ্চে ধরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলব পরিপূর্ণ রসাস্বাদনের জন্য কেবলমাত্র slice of life-ই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে একটু spice of life-এর মিশ্রণ প্রয়োজন। একটু মসলা না মেশালে আস্বাদটা ঠিক আসে না। ঐ মসলাটুকুই হল আসল শিল্পরস, নাটকের বেলায় একেই বলব নাটকত্ব। আগেই বলেছি, নাটকীয়তাই নাটকের সর্বপ্রধান গুণ। নাটক যদি যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় না হয় তবে সেই নাটক স্বধর্মচ্যুত। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি আছে; বাক্যবিন্যাসে, ঘটনা-বিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে নানা স্থানে দুর্বলতা আছে, কিন্তু নাটকীয়তার অভাব নেই। সমস্তটা মিলিয়ে নাটকের যে প্রাণীন পদার্থ রোমাঞ্চ, সেটি অধিকাংশ নাটকেই তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। নাটকের মূল ধর্ম তিনি বজায় রেখেছেন। তবে এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। যিনি যথার্থ ধার্মিক তাঁর যেমন বাহ্যিক ভড়ং-এর প্রয়োজন হয় না, ফোঁটা তিলক না হলেও চলে, খাঁটি নাট্যকারের স্বধর্মও ঠিক সে ভাবেই পালন করতে হবে

অর্থাৎ নাটকের নাটকীয়তা প্লটের গতি এবং পরিণতির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে হবে। ভাষার কারসাজি দিয়ে প্রকাশ করলে চলবে না। ঘটনার অমোঘ বিধানে যে অবস্থার উদ্ভব হবে ভাষা তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে। দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষণে ক্ষণে ওজস্বিনী ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন যদিচ ঘটনার সংস্থানে তার প্রশ্রয় নেই। একটা ঝঞ্ঝা, একটা জলোচ্ছ্বাস, একটা ভূমিকম্প!—ইত্যাকার গুরুগম্ভীর শব্দপ্রয়োগে, বক্তব্যের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়। নাটকীয়তা এবং নাটুকেপনা এক জিনিস নয়। বাক্‌চাতুর্য ভালো, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটা হয় ছ্যাবলামো। নাটকীয়তা খুবই স্বাভাবিক জিনিস, নাটুকেপনা তার ছ্যাবলা সংস্করণ।

স্থানে স্থানে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় আতিশয্য আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। তবে এরও সপক্ষে একটি কথা বলবার আছে। ঘরে বসে পড়তে গেলে এ ভাষা যতখানি বিসদৃশ মনে হয়, রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার মুখে ততখানি মনে হবে না। আতিশয্য-দোষ শেক্সপীয়ারের নাটকেও লক্ষ্যণীয়। কাব্যামৃত স্থানে-অস্থানে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। বেন্ জনসন্ এই ত্রুটির কথা সে যুগেই উল্লেখ করেছিলেন। নিজে এ বিষয়ে উন্নততর টেকনিকের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে—তথা সাহিত্যিকের পক্ষে—টেকনিক একমাত্র রক্ষাকবচ নয়। পুডিং-এর ভালো-মন্দ খেয়ে তবে বিচার। আমরা শেক্সপীয়ার পড়ে যতখানি আরাম পাই বেন্ জনসন্ পড়ে কি ততখানি পাচ্ছি? রঙ্গমঞ্চে বেন্ জনসনের নাটক আজ বিরলদর্শন। শেক্সপীয়ার যে পাঠক এবং দর্শক উভয়ের কাছে আজ পর্যন্ত সমাদৃত সে তাঁর কবিত্বের ঐশ্বর্যে, বলা যেতে পারে তাঁর আতিশয্যের ঐশ্বর্যে। একজন আধুনিক নাট্য-সমালোচকের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি—'What is it we notice if we pick up a modern play after reading Shakespeare or the Greeks? Nine times out of ten it is the *dryness*—I do not mean the *dullness*, but the modesty of the language, the sheer lack of winged words, even of eloquence'।

সব জিনিসকে কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে ন্যাড়া করবার একটা চেষ্টা আধুনিক টেকনিক বলে সমাদৃত হচ্ছে। কবিতা থেকে কবিত্ব বর্জন করতে হবে, নাটক থেকে নাটকীয়তা। If the salt have lost his savour wherewith shall it be salted? নুনের যদি নুনত্ব না থাকে তবে নুনের স্বাদ কোথায় পাব? কবিত্বহীন কবিতা, নাটকীয়তা হীন নাটক আমাদের কোন্ কাজে লাগবে?



প্রমথ চৌধুরী
স্মরণে

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব যেমন বিলম্বিত, খ্যাতিলাভ তেমনি দ্রুত-ত্রস্ত। বলতে গেলে লেখনী ধারণ মাত্রই তাঁর বিজয়বার্তা চতুর্দিকে ঘোষিত হয়েছে। বিলম্বিত আবির্ভাব এই কারণে বলেছি যে, সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠা এবং প্রমথবাবুর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির কথা ভাবাই যায় না। সেই সবুজপত্রের জন্ম বাঙলা ১৩২১—ইংরেজী ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। তখন প্রমথবাবুর বয়স ছেচল্লিশ। নিঃসন্দেহে পরিণত বয়স। এদিক থেকে প্রমথ চৌধুরী এবং রাজশেখর বসু সমগোত্রীয়। তাঁরা রয়ে সয়ে প্রচুর পুঁজিপাটা নিয়ে রীতিমত তৈরি হয়ে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেছিলেন। এসে আর হাত মক্‌স করতে হয় নি, ধরেই পাকা হাতের পরিচয় দিয়েছেন। দুজনের বেলাতেই দিগ্বিজয়ী রোম্যান বীরের মতো সমরাঙ্গনে প্রবেশ এবং জয়লাভ মুহূর্তে সঙ্ঘটিত হয়েছে।

সবুজপত্রের পাতাতেই প্রমথবাবুর লেখকজীবনের শুরু, এ কথা পুরোপুরি সত্য না হলেও অনেকাংশে সত্য। এর আগে তাঁর দুটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। একটি প্রবন্ধ-পুস্তক, নাম 'তেল-নুন-লক্‌ড়ি' (অনুমান ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। পৃষ্ঠাসংখ্যা পঞ্চাশের অনধিক। অপরটি 'সনেট পঞ্চাশৎ' নামে তাঁর কবিতা সংগ্রহ (১৯১৩), এটিও পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এদের গ্রন্থ না বলে পুস্তিকা বলাই ভালো। দেখা যাচ্ছে এ যাবৎ তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কৃতি অনধিক এক শত পাতায় নিবদ্ধ। অবশ্য এ ছাড়াও কিছু লেখা ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। বোধ করি নিজেরই মনঃপূত হয় নি বলে সে সব জিনিস্ গ্রন্থসন্নিবিষ্ট হয় নি।

জীবনের চল্লিশ বৎসরকাল তিনি একান্ত মনে বিদ্যাচর্চাতেই কাটিয়েছেন।

সাহিত্য এবং দর্শনের কৃতী ছাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে সুগভীর তাঁর অধ্যয়ন, প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য দর্শনে নিত্যঅনুসন্ধানী তাঁর মন, দেশ-বিদেশের সাহিত্যে অবাধ সঞ্চরণ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধিৎসা কত বিস্তৃত ছিল তার আক্ষরিক প্রমাণ তাঁর রচনার বৈদগ্ধ্যে, চাক্ষুষ প্রমাণ তাঁর সুনির্বাচিত গ্রন্থসংগ্রহে। তার কতক অংশ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে, কতক বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দান করে গিয়েছেন।

বহু স্মৃতি, বহু শ্রুতি, বহু অধ্যয়নে সমৃদ্ধ তাঁর মন। এতখানি প্রস্তুতি নিয়ে খুব কম লেখকই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। শিল্পে সাহিত্যে অশিক্ষিত পটুত্বের অবকাশ আছে অর্থাৎ অধ্যয়নের অভাব বহু দর্শনে, বহু শ্রবণে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে পূরণ করা যেতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বিদ্যার অভাব বুদ্ধির দ্বারা পূরণ হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে দিব্যদৃষ্টির যোগ হলে চাই কি শেক্সপীয়ারেরও সৃষ্টি হতে পারে। শেক্সপীয়ার ছাড়াও দেশে বিদেশে অনেক সাহিত্যিক দেখা গিয়েছে যাঁরা পণ্ডিত নন কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি। সে জ্ঞান তাঁদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ। বাস্তবিকপক্ষে এ কথা বারম্বার প্রমাণিত হয়েছে যে, পুঁথি-পড়া বিদ্যা ছাড়াও উঁচু দরের সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। সেই সঙ্গে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সে সাহিত্যের আবেদন বহুবিস্তৃত। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ বেশির ভাগ পাঠকও অশিক্ষিত পটুত্বের অধিকারী। তাঁদের বিদ্যে নেই, বুদ্ধি আছে। তাঁদের জ্ঞানগম্যি অল্প কিন্তু রসবোধ প্রচুর। সাহিত্যসৃষ্টি এবং সাহিত্যপাঠ—উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যার চাইতে বুদ্ধির অর্থাৎ রসবোধের প্রয়োজন বেশি। অপর পক্ষে রসবোধের সঙ্গে বহু অধ্যয়ন যুক্ত হলে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় সে অন্যবিধ গুণের অধিকারী। তার নিজস্ব একটি আভিজাত্য আছে, সেটি তার বৈদগ্ধ্য-জাত। তার রীত-চরিত্রও আলাদা। সে বাক্যে এবং ব্যবহারে সংযত। মুখরতার চাইতে প্রখরতা বেশি, উচ্ছলতার চাইতে উজ্জ্বলতা। এ সাহিত্যের আবেদন অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য, কারণ এর জন্যে খানিকটা মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। লেখক যেখানে নানা বিদ্যাচর্চার অলিগলি ঘুরে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন পাঠককেও সেখানে

বিষ্ঠাবুদ্ধিতে একটু শান দিয়ে নিতে হয়, নতুবা এর পুরো রসটুকু গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

সাহিত্যিককে পণ্ডিত না হলেও চলে কিন্তু তাঁর পণ্ডিত হতে কোনোই বাধা নেই। বরং পাণ্ডিত্যকে যদি তিনি কাজে লাগাতে পারেন তাতে তাঁর সাহিত্যকর্মের জলুস বাড়বারই কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যের কাজে পাণ্ডিত্যকে ব্যবহার করায় অনেকখানি কৌশলের প্রয়োজন। পাণ্ডিত্য জিনিসটা আকরিক লোহার ন্যায়, ব্যবহার করতে গেলে তাকে শোধন করে নিতে হয়। সেটা একরকমের রাসায়নিক প্রক্রিয়া। বলা যেতে পারে এ প্রক্রিয়া কবি সাহিত্যিক বা শিল্পী মনের alchemy—যার গুণে বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য রসে পরিণত হয়। ঐ শোধন-প্রক্রিয়াটা জানা না থাকলে পাণ্ডিত্য—তা যতই গভীর হোক সাহিত্যের ভোগে লাগে না। সুখের বিষয়, প্রমথবাবু পাণ্ডিত্যের ছোবড়াটুকু ফেলে দিয়ে শাঁসটুকু ব্যবহার করতে জানতেন। পাণ্ডিত্যকে রসান্বিত করবার কৌশলটি তাঁর বিশেষ-ভাবে জানা ছিল। প্রচুর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও এমন আলগোছে তাকে ব্যবহার করেছেন যে, পাঠককে কখনো আঁতকে দেন নি, বরং তাঁর ঔৎসুক্যকে উস্‌কে দিয়েছেন। 'বই পড়া' (বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ' দ্রষ্টব্য) নামক প্রবন্ধটি যখন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে প্রমথবাবুকে লিখেছিলেন, 'তোমার প্রবন্ধের মধ্যে অনেক মালমসলা আছে কিন্তু তারা এমনি ভান করছে যেন তাদের কোন গৌরব নেই, যেন তারা ভারাকর্ষণের কোন ধার ধারে না।' এই কথা তাঁর সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই বলা চলে। তার কারণ প্রমথবাবু সেই অতি বিরল-সংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্যতম যাঁরা বিদ্বান হয়েও বিদ্যা জাহির করবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হন না। বিদ্যা জিনিসটা এমনি তাঁদের আজ্ঞাবহ যে, তাকে তাঁরা যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। আমরা যারা সামান্য বিদ্যার কারবারী, আমাদের সে পেয়ে বসে। আমাদের যৎসামান্য চিন্তার পুঁজিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পুঁথি-পড়া বিদ্যে এসে সবটুকু জায়গা জুড়ে বসে। নিজের কথা ফেলে তখন পরের মুখের বুলি আওড়াতে

হয়। আমরা ভুলে যাই যে, এর ফলে আমাদের চিন্তার দারিদ্র্যই শুধু প্রমাণিত হয়।

বিদ্বান ব্যক্তির অভাব দেশে তখনও ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু সেই বিদ্যার ব্যবহারে যে কৌশল বা আর্টের প্রয়োজন সেটি তখনও বেশি লোকের জানা ছিল না, এখনও নেই। সে কৌশল তাঁদেরই আয়ত্ত যাঁদের মন সজীব এবং সক্রিয়, যাঁরা নিজের মতো করে ভাবতে জানেন। আবার এঁরাই পরের ভাবনাকেও সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিতে পারেন। আর সব চেয়ে বড় কথা, যে মানুষ নিজে ভাবতে জানেন তিনি অপরকে ভাবাতেও জানেন। প্রমথবাবুর এই গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি নিজের মতো করে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে সব কিছু দেখেছেন, ভেবেছেন, বলেছেন এবং সেই সঙ্গে বাঙলা দেশের শিক্ষিত সমাজকে নতুন করে ভাবাতে শিখিয়েছেন। তিনি সারাক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করতেন, সব জিনিস যুক্তি দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। এদিক থেকে বলা যেতে পারে প্রথমবাবু আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যে নতুন এক ডায়েলেকটিকের জন্মদাতা। আবার যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী ভাষা। ফলে নতুন এক ভাষার সৃষ্টি হল। সে ভাষা যেমন সতর্ক তেমনি সপ্রতিভ।

আমাদের ভাষার এক প্রান্তে বিদ্যাসাগরী ভাষা, অপর প্রান্তে বীরবলী। বাঙলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণ করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের হাতে সে ভাষাই রূপে লাবণ্যে মোহিনী রূপ ধারণ করেছিল। প্রমথবাবু কোনো কিছুরই মোহিনী রূপে ভুলতেন না। যা স্বাভাবিক নয়, পোশাকী, তাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। আমাদের সাধু ভাষাকে তিনি পোশাকী ভাষা বলে বর্জনীয় মনে করেছেন। মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে মুখের কথায়, সে কথা যখন কলমের মুখে প্রকাশ পাবে তখন তার রূপ কেন বদলে যাবে, তার সঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পান নি। এজন্যে লেখার ভাষাকে তিনি যতটা সম্ভব মুখের ভাষার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। শিক্ষিত সমাজে মৌখিক বাক্য এবং লিখিত বাক্যের ব্যবধান ঘুচে যাবে এটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত। এই অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজটি করতে গিয়ে প্রচুর বাধা এবং

বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ব্যতিরেকে কতখানি সম্ভব হত বলা যায় না, তথাপি বাঙলা সাহিত্যে চলতি ভাষা প্রচলনের কৃতিত্ব বহুলাংশে প্রমথবাবুর প্রাপ্য, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। ভাষার কথ্য রূপই তাঁর ভাষার একমাত্র গৌরব নয়। আগেই বলেছি ভাষায় আশ্চর্য মুনশিয়ানা। তিনি নিঃসন্দেহে বাঙলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী। বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, রবীন্দ্র-গুণগ্রাহীদের অগ্রণী হয়েও প্রমথবাবু সজ্ঞানে কোনো বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি প্রেরণা গ্রহণ করেছেন, আর কিছু নয়। লেখার মালমসলা, ঠাটঠমক সমস্তই তাঁর নিজস্ব।

প্রমথবাবু স্বনামে বেনামে দু'ভাবে লিখেছেন। গল্প, কবিতা এবং সাহিত্য সমাজ রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখেছেন স্বনামে। অন্যত্র তিনি ছল করে ছদ্মনামের ব্যবহার করেছেন। প্রমথবাবু স্বভাবত মজলিসী মানুষ ছিলেন। মজলিসী মানুষরা সারাক্ষণ কাজের কথা বা জরুরী কথা নিয়ে থাকতে পারেন না। তাঁদের সব কথাই কথার কথা অর্থাৎ কিনা বাজে কথা। কিন্তু সেই বাজে কথাতে একটু যদি রস লাগানো যায় তাহলে সেই জিনিসই সাহিত্য হয়ে ওঠে। সুবিখ্যাত ইংরেজী উপন্যাস Tristram Shandyর রচয়িতা বলেছিলেন, 'Writing, when properly managed, is but a different name for conversation.' আমাদের সাহিত্যে এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছেন বলতে গেলে একমাত্র প্রমথ চৌধুরী। গুরুগম্ভীর বিষয়েও এমনভাবে লিখেছেন, মনে হবে ঠিক যেন কথা বলে যাচ্ছেন।

সেদিনের বিদ্বজ্জনসভায় প্রমথবাবু প্রধান সভাসদ হয়ে বসেছিলেন। কথার জলুসে একদিকে যেমন লোককে আনন্দ দিয়েছেন, অন্য দিকে তেমনি আবার তাঁদের ভাবিয়েছেনও। আকবর বাদশার বিদূষক বীরবল নামটি ছদ্মনাম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আগের দিনের বিদূষকরা ভাঁড়ামি বা রসিকতা করে লোকের মনস্তুষ্টি করতেন। একালের বিদূষককে শুধু রসিকতা করলে চলে না, তাঁকে রসসৃষ্টি করতে হয়। বীরবল তাই করেছেন। তিনি

আমাদের হাস্যরসকে বেশ একটু উঁচু পর্দায় তুলে দিয়েছেন। বীরবলের হালখাতায় বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা, কিন্তু তাই বলে মূল বক্তব্যটা হাল্‌কা নয়। সেখানেও পাঠককে তিনি ভাবিয়ে ছেড়েছেন। সব লেখাতেই চিন্তার কিছু খোরাক থাকত। সহজ সুরে গভীর কথা বলা একটা আর্ট। বীরবল সে আর্টে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাঙলা ভাষায় খাঁটি belles letters তাঁর কলমেই সর্বপ্রথম বেরিয়েছে।

প্রমথবাবু দুঃখ করে বলেছিলেন যে, আমাদের সাহিত্যে গুণপনাযুক্ত ছ্যাবলামোর অভাব। ছ্যাবলামো আমাদের চরিত্রে যথেষ্টই আছে, কিন্তু আমরা তার সাহিত্যিক বা আর্টিস্টিক ব্যবহার জানি না। ছ্যাবলামো যখন গুণান্বিত হয় তখন আর সে ছ্যাবলামো থাকে না, তখন তার নাম হয় রসান্বিত বাক্য। বলা বাহুল্য তারই নাম সাহিত্য, কারণ বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। খুব অসাধারণ শক্তি না থাকলে ছ্যাবলামোকে গুণপনাযুক্ত করা যায় না। ফলস্টাফ-এর মুখ দিয়ে এত যে আজেবাজে কথা বলানো হয়েছে তার জন্যে শেক্সপীয়ারের মতো অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের সাহিত্যেও এর জন্যে প্রয়োজন হয়েছে বঙ্কিমের প্রতিভার। তিনি তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরে এর জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের চাইতে কমলাকান্তের 'উইল' আমাদের হাতে ঢের বড় সম্পত্তি অর্পণ করেছে। প্রচুর পাণ্ডিত্য এবং মনীষার অধিকারী-হয়েও মনকে কি করে ভারমুক্ত করতে হয় কমলাকান্তের ছদ্মনামে বঙ্কিম তারই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। এর জন্যে চাই অত্যন্ত supple মন এবং সে অনুযায়ী supple ভাষা অর্থাৎ ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে লেখকের আজ্ঞাবহ হতে হবে। প্রমথবাবু তাঁর বীরবলের হালখাতায় এ দু'-এর আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরীর সব চাইতে বড় কৃতিত্ব তিনি বাঙলা সাহিত্যে ক্লাসিকেল রীতির প্রবর্তক। বাঙলা ভাষার স্বভাবধর্মবশত আমাদের ভাষায় সুললিত ভঙ্গির চর্চাটাই অত্যধিক হয়েছে। প্রত্যেক ভাবাতেই লালিত্যের যেমন প্রয়োজন তেমনি ঋজু কঠিন দার্ঢ্যেরও প্রয়োজন আছে। বাঙলা ভাষায় সেটার যথেষ্ট অভাব ছিল। সে অভাব প্রমথবাবু অনেকাংশে পূরণ করেছেন।

বাঙালী মন স্বভাবধর্মে আলস্যপরায়ণ জড়ত্বপ্রাপ্ত মন। নির্বিচারে সব কিছুকেই গ্রহণ করা তার স্বভাব। সেই স্বভাবকে তিনি খানিকটা চৌকস এবং সচকিত করে তুলেছিলেন। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথও যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের লেখনীর মোহিনী মায়া যতখানি আমাদের মুগ্ধ করেছে, তাঁদের দিক্‌সন্ধানী সত্যান্বেষী মন ততখানি আমাদের স্পর্শ করে নি। বোধ করি এই অর্থেই কেউ কেউ বলেছেন যে, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সোনার কলম দিয়ে আর প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন ইস্পাতের কলম দিয়ে। সে ইস্পাত আবার ইংরেজীতে যাকে বলে of the finest temper. সে ভাষার যেমন ধার তেমনি ঝকঝকে তার মূর্তি। এমন খরধার মেদলেশহীন সুগঠিত ভাষা বাঙলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। প্রমথবাবুর গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"ঠিক তোমার সনেটের মত—পালিশ-করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে, মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত সুমিষ্টতা দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা। তোমার লেখনী সে পাড়া মাড়াতে চায় না।" এ কথা তাঁর গল্প সম্বন্ধে যতখানি প্রযোজ্য, প্রবন্ধ সম্বন্ধে ততখানি তো বটেই, বোধ করি ততোধিক। এমন শানিত ভাষায় লেখা প্রবন্ধ, ইতিপূর্বে বাঙলা সাহিত্যে দেখা যায় নি। রঙ্গে ব্যঙ্গে, হাস্যে শ্লেষে, বিদ্যার ঔজ্জ্বল্যে, বুদ্ধির ঝলকে প্রবন্ধ সাহিত্যকে তিনি এক নতুন মূর্তিতে উপস্থাপিত করেছিলেন।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ – সব একই গুণে গুণান্বিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'পালিশ-করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ।' কবিতা খুব বেশি লেখেন নি। দু'খানা মাত্র গ্রন্থ—সনেট পঞ্চাশৎ এবং পদচারণ (শেষোক্ত নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া)। দু'টিই শীর্ণকায়, কিন্তু ঝিলমের শীর্ণ স্রোতের ন্যায় 'খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।' আবেগের বাষ্পমাত্র নেই, তাই বলে শুষ্ক নয়। ধারালো ঝাঁঝালো অথচ রসালো। 'পদচারণ' নামক কবিতা-গ্রন্থটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গপত্রে নিজেই বলেছেন, এ পদ্যগুলো গদ্যের কলমে লেখা। এ কবিতা যে

ক্লাসিকেল রীতিতে রচিত ঐ কথার মধ্যেই তার আভাস আছে। আরো বলেছেন, "এগুলোর ভিতর আর কিছু না থাক, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason." এখানেও সেই ক্লাসিকেল রীতিরই ইঙ্গিত। যাঁরা কাব্য-রচনাকে নিতান্ত প্রেরণাজাত ব্যাপার বলে মনে করেন তাঁরা অকারণ পুলকে অর্থাৎ without rhyme or reason লিখে থাকেন। প্রমথ চৌধুরী গদ্য পদ্য কোনো জিনিসই rhyme or reason ব্যতিরেকে কদাপি লেখেন নি। সাহিত্য সৃষ্টিতে যে যত্নকৃত craftsmanship-এর প্রয়োজন আছে তাঁর কালে একমাত্র তিনিই তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁর কবিতা সেদিনে না হয়ে এ দিনে লেখা হলে অধিকতর সমাদর লাভ করত। তিনি যে কবিতা লিখেছেন তার বারো আনাই সনেট। সনেটের সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে 'রসনার লোলুপতা'র অবকাশ কম। সেজন্যে form হিসেবে তিনি এটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। নিজেই বলেছেন—

সনেটের গোনা গাঁথা ছত্র চতুর্দশ—
এ পাত্রে যায় না ঢালা একগঙ্গা রস।

অবশ্য সনেট ছাড়া অন্যবিধ কবিতা যে ক'টি লিখেছেন তাতেও যে তিনি পাত্র উজাড় করে রস ঢেলেছেন এমন নয়। কবিতাকে আমরা অলঙ্কৃতা বনিতা রূপে দেখে অভ্যস্ত। তিনি তাকে সেভাবে দেখেন নি। কবিতাকে তিনি কখনো অনাবশ্যক অলঙ্কারে সাজান নি। বলেছেন—
পরীর শরীরে কখনো সাজে না জরির থান।

ঐ একটি পঙ্‌ক্তিতেই কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব স্পষ্টত প্রকাশ পেয়েছে, আবার তিনি যে কবি সে কথাও ঐ লাইনটির দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের দেশে এ যুগের সব লেখকই বলতে গেলে ইংরেজী পাঠশালার ছাত্র। প্রমথবাবু পাঠ নিয়েছেন ফরাসী পাঠশালায়। দর্শনে বের্গসঁ তাঁর গুরু, সাহিত্যে ভলটেয়ার। ভলটেয়ারের ভাষা সম্পর্কে প্রমথবাবু বলেছিলেন—'লঘু, তীক্ষ্ণ, চোস্ত, সাফ'—কোথাও ঢিলেঢালা কিছু নেই,

যেমন আঁটসাট দেহের বাঁধুনি, তেমনি ঝলমলে উজ্জ্বল মুখশ্রী। অনেক কাল আগে যখন প্রমথবাবু সবে লেখায় হাত দিয়েছেন তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিখনভঙ্গি সম্বন্ধে একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছিলেন যে, কোথাও ফাঁক নেই, শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। সেই চিঠিতে এ কথাও বলেছিলেন যে, এ গুণটি প্রাচ্য নয়। ঠিকই বলেছেন, প্রমথবাবুর মনটা পশ্চিমমুখী। পদ্য লিখেছেন ইতালীয় ছাঁদে, গদ্য ফরাসী চালে। তাঁর রচিত প্রথম সনেটটিতেই বলে নিয়েছিলেন—

> ইতালির ছাঁচে ঢেলে বাঙালীর ছন্দ,
> গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
> কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ—
> সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট!

ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ গন্ধ রস সম্পর্কে তিনি নিজেই সবিস্তারে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর নিজের লেখা গদ্যে ফরাসী স্বাদ-গন্ধ বিলক্ষণ মিশিয়ে দিয়েছেন। যাঁর যেমন মনোধর্ম সে অনুযায়ী তাঁর সাহিত্যকর্ম। সমস্তটা মিলিয়ে সংক্ষেপে বলতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, প্রমথবাবুর সাহিত্য বাঙালী রুচির পক্ষে একটু অতিমাত্রায় sophisticated. সেই কারণে তাঁর সাহিত্য কোনোকালেই খুব বেশি জনপ্রিয় হবে বলে আশা করা যায় না।

প্রমথ চৌধুরীর নামের সঙ্গে সবুজপত্রের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, এ কথা পূর্বেই বলেছি। সবুজপত্র নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের বৃহত্তম কীর্তি। তার কারণ সবুজপত্র কেবলমাত্র একটি সাহিত্যপত্র নয়, এটি বাঙলা দেশের একটি literary movement, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি বিশেষ একটি অধ্যায়। খুব একটি শুভ-লগ্নে—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এর জন্ম। এক বৎসরও পূর্ণ হয় নি, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বাঙলা সাহিত্যের গৌরব নিঃসন্দেহে বেড়েছে, সাহিত্যসেবীদের মনে নতুন উদ্দীপনা এসেছে, বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের মনে। ঠিক সেই মুহূর্তে নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সাহিত্যপত্রের পরিকল্পনা খুব স্বাভাবিক কারণেই মনে

এসেছে। দেশের যৌবনকে, নবীন সম্প্রদায়কে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করা এবং নতুন পথে পরিচালিত করাই এ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের জরাগ্রস্ত, জড়ত্বপ্রাপ্ত দেশে সবুজপত্র জীবনের এবং যৌবনের বার্তা প্রচার করবে, এই ছিল স্পষ্টত তার ঘোষণা। এইজন্যেই একে একটি আন্দোলন বলেছি। রবীন্দ্রনাথ সে আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক, প্রমথবাবু প্রধান কর্মকর্তা। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে যে সবুজপত্রের যাত্রা শুরু তার প্রমাণ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখে (১৩২১)। শুধু তাই নয়, আমার মতে ঠিক ঐ সময়ে সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠাকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির public celebration হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আবার সবুজপত্র যে যৌবনের অভিযান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল তারও প্রমাণ প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'সবুজের অভিযান' নামক কবিতা। 'আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'—এটাই ছিল সবুজ-পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ সংখ্যাতেই বীরবলের প্রবন্ধ 'সবুজপত্র'— তাতে তিনি পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে সবুজের তথা যৌবনের গুণকীর্তন করেছেন। এ ছাড়াও প্রথম সংখ্যায় ছিল সত্যেন দত্তের কবিতা 'সবুজ পাতার গান।' তাতে তিনি যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন।[১] রবীন্দ্রনাথ আমাদের জরাগ্রস্ত দেশের নাম দিয়েছিলেন জরাসন্ধের দুর্গ। প্রমথবাবুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমাদের জরাসন্ধের দুর্গের মধ্যে দেশের ক্ষত্রিয়েরাই বন্দী রয়েছে, যারা ক্ষত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরান্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাবে। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ব্রত নিয়েছ তোমরা।" যদ্দূর মনে পড়ছে সম্পূর্ণ চিঠিটি পরে সবুজপত্রে ছাপা হয়েছিল। এটিকে সবুজপত্রের manifesto বলা যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরী একদা অগ্রণী হয়ে জরাসন্ধের লৌহকপাটে আঘাত হেনেছিলেন, সে কৃতিত্ব তাঁকে দিতে হবে। তাঁর শক্তির উপরে রবীন্দ্রনাথের

---

১ এই সূত্রে প্রমথ চৌধুরীর 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পূর্ণ আস্থা ছিল বলেই তাঁকে ঐ কাজে এমন অকুণ্ঠভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

সবুজপত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একটি নতুন লেখকগোষ্ঠীর উদ্ভব হল। অতুল গুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কান্তি ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা বলতে গেলে প্রমথবাবুর আবিষ্কার। বাঙলা সাহিত্যে পরোক্ষভাবে এটাও তাঁর একটা contribution. কিন্তু সবুজপত্রের তথা প্রমথবাবুর অপর একটি contribution সম্বন্ধে আমরা পুরোপুরি সজ্ঞান নই। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। দেশ বিদেশে গীতাঞ্জলির অভাবনীয় সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে যদি আধ্যাত্মিকতা এবং মিস্টিসিজ্‌ম-এর জালে জড়িয়ে ফেলত তা হলে অবাক হবার কিছুই ছিল না। তাঁর পরবর্তী কাব্যরচনা যদি গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির পুনরাবৃত্তি হত তা হলে কিছুই অস্বাভাবিক ঠেকত না। রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ পরিণতির পথে গীতাঞ্জলির সাফল্যই এক প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত। দেখা যাচ্ছে ইংরেজী গীতাঞ্জলির পরে তাঁর যে কাব্যাংশ তিনি ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশ করেছিলেন তার বেশির ভাগই মিস্টিকগন্ধী। তাতে পশ্চিম মহাদেশে তাঁর ক্ষতিই হয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রসাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আধ্যাত্মিকতার সুর ছেড়ে দিয়ে যৌবনের জয়গান তাঁর মুখে উচ্চারিত হল। এ কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সবুজপত্রের পাতাতেই বলাকা কাব্যের জন্ম হয়েছে। ফাল্গুনী নাটক যাকে অন্য নামে যৌবনের জয়যাত্রা বলা যেতে পারে তারও প্রকাশ সবুজপত্রে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত যৌবনের কবি, তা হলেও এই সময়টাতে বিশেষ করে গদ্যে পদ্যে তিনি অনবরত দেশের যৌবনশক্তির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আমার আসল বক্তব্য এই যে, সবুজপত্রের তাগিদে রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক রংটা বেশ খানিকটা ক্ষয়ে গিয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথেরও মঙ্গল হয়েছে, বাঙলা সাহিত্যেরও। এর কৃতিত্ব অংশত প্রমথ চৌধুরীর প্রাপ্য।

প্রমথবাবু যখন লেখক হিসেবে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি তখনই

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—'আমার তো দেখে শুনে মনে হচ্ছে বাঙলা সাহিত্যে তোমার একটা দিন আসছে এবং তোমার একটা কাজ আছে। এইবার সাহিত্যসিংহাসনে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনভার নেবে এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' রাজদণ্ড অবশ্য রবীন্দ্রনাথের হাতেই ছিল, কিন্তু ঐ ভবিষ্যদ্বাণীই পরে সবুজপত্রে চরিতার্থতা লাভ করেছে। বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ করে আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যে প্রমথবাবু যে নতুন কিছু দিয়েছেন সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। আমাদের সাহিত্যে হৃদয়বৃত্তির চর্চা যতখানি হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির ততখানি নয়। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এমন লেখক বিরল যাঁরা বুদ্ধিমান পাঠককে stimulate করতে পারেন। প্রমথবাবু সে অভাব বেশ খানিকটা পূরণ করেছিলেন। নতুন কথা নতুন ভঙ্গিতে বলবেন এই উদ্দেশ্য নিয়েই আসরে নেমেছিলেন। নতুনত্বটা আর কিছু নয়—সংক্ষেপে বলতে গেলে emotion-এর পথ ছেড়ে reason-এর পথ গ্রহণ।

কবিতা প্রবন্ধ গল্প—সাহিত্যের এই তিন বিভাগেই তিনি কৃতিত্বের অধিকারী। নাটকে হাত দেন নি। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো গল্প একটি যেন monologue, সেও এক ধরনের নাটক। তা ছাড়া অনেক গল্পই dialogue-প্রধান। Dialogue রচনায় এতখানি যাঁর নৈপুণ্য তিনি ইচ্ছে করলে নাটক রচনায় প্রয়াসী হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর মনের গড়নটা ঠিক নাটক রচনার অনুকূল ছিল না। তাঁর মন এবং বলার ধরন—দুটোই অতিমাত্রায় মজলিসী। নাটকের একটা সুনির্দিষ্ট সুবিন্যস্ত কাঠামো আছে, খানিকটা যেন straitjacket পরানো মূর্তি—সে ইচ্ছেমত হাত পা ছুঁড়তে পারে না। তাকে একটা নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। মজলিসী গল্প সে-রকম নয়, সে আপন খুশিমতো ডাইনে বাঁয়ে হেলে দুলে চলে, সদর রাস্তা ছেড়ে যখন তখন অলিতে গলিতে ঢুকে পড়ে। নাটক জিনিসটা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বস্তু, তাকে একটা inevitable পরিণতিতে গিয়ে পৌছতে হয়। মজলিসী গল্পের কোনো দায়দায়িত্ব নেই, সেখানে inevitable বলে কিছু নেই। অত্যন্ত গম্ভীর সুরে যার আরম্ভ,

grotesque-এ তার অবসান। পরমা রূপসী অকস্মাৎ প্রেতিনী প্রতিপন্ন হয়। যেখানে চার-ইয়ারী-কথা সেখানে ইয়ারবক্সীসুলভ খানিকটা irresponsible আবহাওয়া থাকবেই। প্রমথ চৌধুরীর সব গল্পই বলতে গেলে 'ফরমায়েশী গল্প'। সেটাকে তিনি ইচ্ছেমতো কান মুচড়ে মুচড়ে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

প্রমথবাবুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, গল্প কাকে বলে। তিনি বলেছিলেন, যা শুনতে ভালো লাগে তাই গল্প। এই কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। সেই আদি যুগ থেকে লোকে বলেছে, গল্প বল। গল্প বরাবর লোকে শুনেই এসেছে। গল্প বলা আর শোনা—এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। লেখা গল্প বসে বসে পড়তে গেলে গল্পের স্বাভাবিকতা খানিকটা নষ্ট হয়ে যায়। মুখে বলা গল্প এক, কলমে লেখা গল্প আর। কলমের কালিমা একটু তার গায়ে লাগবেই। মুখে বলা গল্পের মুখশ্রী আলাদা। প্রমথ-বাবু তাঁর বলার গুণে গল্পের সেই মুখশ্রীটি অবিকৃত রেখেছেন। অর্থাৎ গল্পটা পড়লেও মনে হয় যেন কারো মুখ থেকে শুনছি।

তাঁর স্বকীয়তা এবং অন্যান্য সমস্ত গুণের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও একটি কথা বলা আবশ্যক হৃদয়াবেগ নামক পদার্থকে তিনি অতিশয় সন্দেহের চোখে দেখেছেন এবং সর্বপ্রকারে তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন। ভাবে গদগদ হওয়া কোনো কাজের কথা নয়, কিন্তু তাই বলে কাব্যে সাহিত্যে emotion এবং sentiment জাতীয় জিনিস একেবারেই অচল এমন কথা কেউ বলবে না। দেহে অতিরিক্ত চর্বি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু খানিকটা চর্বি শরীরের পোষণ এবং রক্ষণের জন্যে অত্যাবশ্যক। প্রমথবাবুর গল্পে কবিতায় চর্বি নেই। শরীরে চর্বি না থাকলে যেমন শীর্ণকায় দেখতে হয় প্রমথবাবুর রচনায় তেমনি একটি শীর্ণ, ইংরেজীতে যাকে বলে emaci-ated ভাব আছে। কবিতায় সেই পরিপুষ্ট মুখশ্রী নেই, গল্পের অনেক চরিত্রই পূর্ণাবয়ব হয়ে ফুটে ওঠে নি। আগে বলেছি যে, পোশাকী জিনিসকে তিনি সাহিত্যে বর্জনীয় মনে করতেন; কিন্তু কৌতুকের বিষয় যে, হৃদয়ানুভূতিকে বাদ দেওয়ার দরুন তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোকে ঠিক রক্ত-

মাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। এরা পোশাকী মানুষ। যেখানে মানুষ নিয়ে কারবার সেখানে ভাবে ভাষায় একটু আর্দ্রতার প্রয়োজন আছে। ঐ আর্দ্রতার অভাবে তাঁর গল্প, যত দিন যাচ্ছে, তত যেন একটু brittle হয়ে পড়ছে। প্রমথবাবুর রাজ্যে প্রেমে পড়লেই বোকা বনতে হয়। 'চার-ইয়ারী-কথা'র চার বন্ধুই সমান তুখোড়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চারজনাই বোকা বনেছেন। wit-এর ঝলকে, কথার বাহাদুরিতে পাঠকের মনকে ধাঁধিয়ে দেবার মতো অর্থাৎ এর মধ্যে literary virtue যতখানি তার চাইতে ঢের বেশি এর virtuosity. লিপিচাতুর্যে অতুলনীয়, কিন্তু সাহিত্যের অন্তিম পরীক্ষায় ক্ষীণজীবী।



সাহিত্যশিল্পী
অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্র-শিষ্য খ্যাতনামা শিল্পীর ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। শিল্পীর একটি পোর্ট্রেট দেয়ালে ঝুলছে। ওদিকে তাকাতেই বললেন, হ্যাঁ দেখুন, গুরুজী নিজের হাতে আমার পোর্ট্রেট করে দিয়েছিলেন। কতখানি স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি—এ থেকেই বুঝতে পারেন। প্রাণ ভরে ভালোবেসেছেন, দু'হাত ভরে দিয়েছেন। কী দরাজ মন, উজাড় করে দিতে জানতেন, তবে কতটুকু আর আমরা নিতে পেরেছি·····বাদশা, মশায়, বাদশা। মোগল বাদশা তো চোখে দেখি নি কিন্তু সত্যিকারের বাদশা কাকে বলে সে আমি তাঁকে দেখে বুঝেছি।

রাজা বাদশা বললেই খুব একটা জাঁকজমকের ভাব মনে আসে। প্রিন্স দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য রাজা বাদশার ঐশ্বর্যের চাইতে কিছু কম ছিল না। মহর্ষির আমলে সে ঐশ্বর্যে একটু বৈরাগ্যের রং লেগেছিল। তাহলেও জোড়াসাঁকোর ছ' নম্বর বাড়ির তুলনায় পাঁচ নম্বর বাড়িতে জাঁকজমকটা বরাবরই একটু বেশি ছিল। কিন্তু সে জাঁকজমক নিতান্তই বহিরঙ্গে, অন্তরঙ্গ জীবনে ঔদার্যে মাধুর্যে সে ঐশ্বর্য একটি নিরতিশয় স্নিগ্ধ সংযত রূপ গ্রহণ করেছিল। মহর্ষি তাঁর জীবন সাধনায় একটি সাধনাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন, সেটি সৌন্দর্যের সাধনা। তিনি বলতেন, শাস্ত্রে পরব্রহ্মকে বলেছে প্রজ্ঞানঘন ; আমি অতশত বুঝি নে, আমি এইটুকু বুঝেছি যে, তিনি সৌন্দর্যঘন, কেননা চোখ মেললেই জগতের অফুরন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে আমি তাঁর নিত্যপ্রকাশকে প্রত্যক্ষ করি। বসনে ভূষণে বচনে আচরণে তিনি সৌন্দর্যচর্চাকে ধর্মচর্চার প্রধান অঙ্গ করে তুলেছিলেন। বলা যেতে পারে মনসা কর্মণা বাচা, তিনি সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যাকে religion of an artist বলেছেন তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মহর্ষির জীবনেই সর্বপ্রথম প্রতিফলিত দেখেছেন।

মহর্ষির সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যচর্চা তাঁর বৃহৎ পরিবারের মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল যে, সমগ্র পরিবারটিই একটি শিল্পী পরিবারে পরিণত হয়। সংগীতে সাহিত্যে চিত্রকলায়—রং-এ রসে সুরে প্রতিভার বিকাশ হতে লাগল অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়। বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাসে এ এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়।

আমাদের এ যুগের মহত্তম কবি এবং মহত্তম শিল্পী দুজনই একই পরিবারের দান। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা শুধু বংশগত নয়—সেটা মনোগত, রুচিগত, শিল্পগত। কবিমাত্রই অংশত চিত্রকর, চিত্রকর মাত্রই অংশত কবি। মনে ছবি না ফুটলে কবি হওয়া যায় না। আবার মনে কবি-কল্পনা না থাকলে ছবি আঁকা যায় না। কাব্যকলায় এবং চিত্রকলায় শুধু যে মণিকাঞ্চন যোগ এমন নয়, দু-এর মধ্যে একটি সেতুবন্ধন যোগও আছে। এপার থেকে ওপারে যাওয়া যায়, ওপার থেকেও এপারে আসা চলে। রবীন্দ্রনাথ যেমন গিয়েছেন সাহিত্য থেকে চিত্রে, অবনীন্দ্র তেমনি এসেছেন চিত্র থেকে সাহিত্যে।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্ম তাঁর শিল্পকর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্যেই তিনি সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। খুল্লতাতের কথায় প্রথমটায় খুব চমকে উঠেছিলেন, বলছ কি রবিকা, আমি আবার লিখব কি? কেমন করে লিখতে হয় আমি জানি নে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কেন, যেমন করে গল্প বলছ, ছবি আঁকছ, তেমনি করেই লিখবে। মোক্ষম কথাটি বলেছিলেন। গল্প বলায় তাঁর জুড়ি নেই, আর ছবির?—এতদিন তুলি দিয়ে ছবি আঁকছিলেন, এবার কলম দিয়ে ছবি লিখতে হবে। ওই যে 'বুড়ো আংলা'য় নিজের নামে ছড়া কেটে বলেছেন, কোন্ ঠাকুর—না ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে। এতকাল কথা বলেছেন রেখায় রং-এর ভাষায়। এবার ছবি আঁকবেন কথার সুরে ছন্দে। মনের ছবি আর কথার ছবি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে।

আমাদের দেশে সাহিত্যপত্রের নাম কালি কলম। যাঁরা সে নাম রেখেছেন তাঁরা অবশ্য খুব ভালো করেই জানেন যে, শুধু কালি কলমের যোগাযোগ

হলেই সাহিত্য হয় না। তাই যদি হত তাহলে আমরা সকলেই সাহিত্যিক হতাম। কলমের আখর যখন ছবি ফুটিয়ে তোলে আর কালো কালি যখন নানা রং-এর নানা রসের খেলা জমিয়ে তোলে তখনই কালি কলমের যোগে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সে ছবি আর রং আর রস লেখনীর মুখে থাকে না,' থাকে লেখকের মনে। মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে, কিন্তু যে জিনিস মৌচাকে এসে জমা হয় সে আর নিছক ফুলের মধু থাকে না; মৌমাছির দেহের মধ্যে আছে একটি রাসায়নিক ক্রিয়া—মধুর যে বিশেষ স্বাদ সেটি সেই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। কবি শিল্পী সাহিত্যিকের মনও মৌমাছির মতো সন্ধানী মন—কোথা থেকে কত কী যে সংগ্রহ করে। আর তাঁদেরও মনে আছে একটি রাসায়নিক ক্রিয়া যাতে করে শিল্পে সাহিত্যে সেই রসাস্বাদটি এনে দেয়। অবনীন্দ্রনাথ বলতেন—

'কালি কলম মন
লেখে তিনজন

ছবিটি আঁকি—তুলিটি জলে ডোবাই, রং-এ ডোবাই, মনে ডোবাই, তবে লিখি ছবিটি। সেই ছবিই হয় মাস্টারপিস, শুধু রং-এ তুলিতে ছবি হয় না।' গান বাজনার শখ ছিল, বলতেন, অন্তর বাজে তো যন্তর বাজে। ছবি আর বাজনার ব্যাপারে যা বলেছেন সাহিত্যের ব্যাপারেও তাই। সবই মনের কারসাজি। কালি কলম তো নিতান্তই বাইরের জিনিস, কাব্য সাহিত্যের যে প্রধান উপকরণ—বিষয়বস্তু—তাও কাজে লাগে না যদি না তাতে রস লাগানো যায়। কবি শিল্পী সাহিত্যিকের মন অনেকটা যেন ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর মনের মতো যিনি বলেছিলেন, উপকরণে আমার কি হবে যদি অমৃতের স্বাদ না পেলাম। মৈত্রেয়ীর কাছে যা অমৃত সাহিত্যিকের কাছে তাই রস।

মৌমাছির সঙ্গে তুলনাটি একাধিক অর্থে সঙ্গত। শিল্পী সাহিত্যিকের মন একটি যেন মৌচাক, তাতে একদিকে সৃষ্টি হয় মধু, অপর দিকে মোম। একটিতে দেয় মাধুর্য অপরটিতে আলো—ইংরেজ কবি-সমালোচক যাকে বলেছেন sweetness and light. বহু সম্ভারে পূর্ণ সে মন একটি যেন

ঐশ্বর্যের খনি। সে ঐশ্বর্য মাধুর্য (sweetness) হয়ে দেখা দেয়। আর সে ঐশ্বর্যের যে দ্যুতি সেটি তাঁদের সকল সৃষ্টি-কর্মের উপরে একটি আভা (light) বিস্তার করে। বলা বাহুল্য এখানে ঐশ্বর্য বলতে শুধু পাণ্ডিত্য নয়। এ হল গুণপনার কথা। কবি শিল্পীর মন বহু গুণে গুণান্বিত। পৃথিবীতে যেখানেই মহাকবি মহাশিল্পীর জন্ম হয়েছে, দেখা গিয়েছে তাঁর মনটি খুব বড় বহরে তৈরি, তাঁর জগৎটা বড়, তাঁর জীবন-চর্চার পরিধি বহু বিস্তৃত। মহাদেশ যেমন বহু দেশ বহু জাতি বহু ধর্ম বহুবিধ সংস্কৃতির মিলনভূমি, মহাসমুদ্র যেমন বহু দেশ বহু দ্বীপকে ঘিরে থাকে, অগণিত জীবজন্তু এমনকি অরণ্য পর্বত বক্ষে ধারণ করে, মহাকবি মহাশিল্পীরাও তেমনি বহুবিধ বিচিত্র গুণাবলীর অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ শুধু যদি ছন্দ মিলিয়ে পদ্য লিখতেন তাহলে তিনি কবি যদি বা হতেন মহাকবি হতে পারতেন না। আরো অনেক কিছু তাঁকে করতে হয়েছে। সংগীতচর্চা করেছেন, সুরসৃষ্টি করেছেন, অভিনয় করেছেন, ছবি এঁকেছেন। নানাবিধ শিল্পচর্চা করেই ক্ষান্ত হন নি—জমিদারি দেখেছেন, রাজনীতির চর্চা করেছেন, মাস্টারিও করেছেন। অবনীন্দ্রও শুধু ছবি এঁকেই শিল্পাচার্যের পদ লাভ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তিনিও জীবনশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন পরিপূর্ণ জীবন, ইংরেজীতে যাকে বলে দ্য কমপ্লিট ম্যান—এঁরা সেই জীবনের চর্চা করেছেন। তারই ফলে একজন হয়েছেন মহাকবি, অপরজন মহাশিল্পী। ছেলেবেলা থেকে গান-বাজনার শখ, এস্রাজ ম্যাণ্ডোলিনে হাত পাকিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকো বাড়িতে নাটকে অভিনয়ে সকলেরই সমান উৎসাহ ছিল, কিন্তু এঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে সব চাইতে কুশলী অভিনেতা। শিল্পীমানুষ বলে মঞ্চসজ্জার দায়িত্বও তাঁকেই অনেক সময় নিতে হয়েছে। এছাড়া ছিল সংগ্রহের বাতিক। দেশের প্রাচীন শিল্পনিদর্শন যেখানে যা পেয়েছেন তাই সংগ্রহ করেছেন। শুধু মহামূল্য জিনিসের প্রতিই নজর ছিল এমন নয়। সুন্দর হলে সামান্যকেও অসামান্য করে দেখতেন। একবার যখন খেয়াল হল, গ্রামে গ্রামে লোক পাঠিয়ে মেয়েদের দেওয়া আলপনার ডিজাইন সংগ্রহ করলেন। পরে এই থেকেই 'বাংলার ব্রত'

নামে বই লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো অবনীন্দ্রনাথও ইস্কুল পালানো ছেলে। তাই বলে বিত্তে লাভে কিছু কমতি হয় নি। ছবি আঁকার তাগিদে পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত কাব্য পাঠ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন পদাবলীর ছবি আঁকতে হবে; খুব যত্ন করে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করলেন। তবে তো কৃষ্ণলীলার চিত্রমালা তৈরি হল। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের শিল্প-কথা প্রচুর পড়তে হয়েছে। তবে পড়েছেন যত, ভেবেছেন তার চাইতে ঢের বেশি। কেননা চিন্তার প্রসার যতখানি, সৃষ্টির মাহাত্ম্য ততখানি।

রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ—উভয়ের শৈশবে এক জায়গায় একটা মিল আছে। বিরাট পরিবার, বাড়িতে লোকের অন্ত নেই কিন্তু শৈশব কেটেছে নিঃসঙ্গ নির্জনে। দাদারা ইস্কুলে চলে যেতেন; প্রকাণ্ড বাড়িতে দুপুর বেলায় একলা একলা ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গীবিহীন নির্জন প্রহরে রবীন্দ্রনাথের কচি মনটি যেমন গড়ে উঠেছে, অবনীন্দ্রের শিল্পীমনটিও তেমনি। নিজেই বলেছেন, "দেখতে শুনতে অনেক শেখা যায়। ঐ অমনি করে একলা থাকতে থাকতেই চোখ আমার দেখতে শিখল, কান শব্দ ধরতে শিখল।" খুব খাঁটি কথা। মানুষ তার নির্জন মুহূর্তকে কিভাবে ব্যবহার করে তাই দিয়ে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানুষের সৃজনধর্মী মন গড়ে ওঠে নীরবের সংযোগে, নির্জনের সাধনায়। জনতার সঙ্গে নাড়ির যোগ রেখেও শিল্প সাহিত্যের সাধনা প্রকৃতপক্ষে নির্জনের সাধনা। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ দুজনের বেলাতেই শৈশবেই এর পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

নতুনকে দেখবার জানবার শিখবার আগ্রহে কোনোদিন এতটুকু কমতি ঘটে নি। শিশুমনের সরলতা সরসতা সজীবতা বরাবর বজায় রেখেছেন। ছবি আঁকার ফাঁকে লেখায় যখন হাত দিলেন তখন শিশুদের নিয়েই শুরু করলেন। শিশুদের জন্যে শিশুদের মতো করে লিখলেন শকুন্তলার কাহিনী আর রূপকথার আদলে ক্ষীরের পুতুল। সঙ্গে নিজের হাতে আঁকা ছবি। যেমন প্রাণ-মাতানো ভাষা তেমনি চোখ-জুড়ানো ছবি। এমনটি এর আগে আর হয় নি। শিশুদের চোখের সুমুখে এক নতুন জগতের দোর খুলে গেল।

—"সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারারাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রং মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ' মাস যায়। রাজকন্যে একটি দিন সেই আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দিরে মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজো করেন। ঘরে এসে শাড়ি ছেড়ে দেন, দাসীরা যার কাছে সাত জাহাজ সোনা পায় তার কাছে শাড়ি বেচে। রাজা সাত জাহাজ সোনা দিয়ে আদরিনী সুওরানীর শখের শাড়ি কিনে নিলেন।" এমন রংচং-এ ঝলমলে বর্ণনা, ভাষার এমন নূপুর পায়ে নৃত্য আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনোকালে দেখেও নি শোনেও নি।

বৌদ্ধ উপাখ্যান অবলম্বনে লিখলেন নালক-এর কাহিনী। দেবল ঋষির সেবায় নিযুক্ত কিশোর বালক নালক। গঙ্গাতীরে আশ্রমের বটতলায় ধ্যানে বসে নালক দেখলেন, কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদে জন্ম নিলেন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। রাজপুত্রের শৈশব কৈশোর, তাঁর বিবাহ, গৃহত্যাগ, নিরঞ্জনাতীরে বোধিলাভ সমস্তই বালকের ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতিভাত হল। সে কাহিনী অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব ভাষায় চিত্রিত।

রবীন্দ্রনাথ যখন কথা ও কাহিনীতে রাজপুতনার শৌর্যগাথা রচনা করছেন অবনীন্দ্রনাথ তখন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে রাজকাহিনী গ্রন্থে রাজপুতনার রাণাদের কাহিনী বলতে শুরু করেছেন। কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সব চাইতে জমকালো রূপ তাঁর 'রাজকাহিনী'তে। ঐতিহাসিক নন, ইতিহাস লিখতে বসেন নি। তিনি নিতান্তই গল্প-বলিয়ে। আখ্যানের চাইতে উপাখ্যানের প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি ; লোকমুখে প্রচলিত যে সব কাহিনী তাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। সেকালের ভুলে-যাওয়া কাহিনী একালের ছেলেদের কাছে লুফেনেওয়ার মতো করে বলেছেন। চিতোরের দুর্গ, কৈলোরের কেল্লা, রাণা মহারাণাদের বাদ বিসম্বাদ, ভীল সর্দারদের কথা, রাজপুতনার পাহাড় জঙ্গল পথঘাট চোখের সুমুখে

জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল। আর্টিস্ট মানুষ যখন লিখতে বসেন তখন অনেক সময় মনে হয়, কলম ছেড়ে যেন তুলি দিয়ে লিখছেন। এই যেমন চিতোর দুর্গের বর্ণনা—"সূর্যের আলোয় সকাল বেলায় সোনার আকাশ-পটে রাজ-প্রাসাদের পাথরের দেওয়াল দেবমন্দিরের সোনার চূড়ো নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিতোরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠত—মনে হত ঠিক যেন একখানি জাহাজ আকাশ সমুদ্রে ভেসে রয়েছে।" ইংল্যাণ্ডের প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিরা ছিলেন একাধারে কবি এবং চিত্রকর, তার ফলে তাঁদের কাব্যে স্বভাবতই একটি চারিত্রবৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে ভাষার যে চিত্রলেখা রূপ তা প্রি-র‍্যাফেলাইটদের কবি-কৃতিকেও হার মানিয়েছে। আমাদের ভাষায় চিত্রলেখা কথার অর্থ অপ্সরা। রাজকাহিনীতে বাঙলা গদ্য সত্যই যেন মনোহারিনী অপ্সরা মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। আর গল্প বলার কী অপূর্ব ভঙ্গি। কোথাও শৌর্যবীর্যের কাহিনী উত্তেজনায় অধীর চঞ্চল, কোথাও ম্লানমুখী করুণ কাহিনী অশ্রুসজল। সমস্তটা মিলিয়ে একটা যেন নেশার মতো। ঐ যে রাণা মুকুলের দুই খুড়োর গল্প বলতে গিয়ে বলেছেন—'যারা গল্প বলছিল আর যে শুনছিল সবাই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো। জেগে রইলো কেবল একটি পিদিমের আলো—অন্ধকারের মাঝে যেন কষ্টিপাথর ঘসা একটুখানি সোনালী রং।' সমস্ত বইটি পড়ে ছেলে বুড়ো সকলেরই মনের অবস্থাটি হবে ঐ। একটি যেন স্বপ্নলোকের পরিবেশ। আসল কথাটি হল, তুলি আর কলম একত্র হলে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে রাজকাহিনী পড়লে তবেই তা মালুম হবে।

রসিয়ে গল্প বলায় সত্যি তাঁর জুড়ি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে যখন বিশ্বভারতীর আচার্য পদ নিয়ে সাময়িকভাবে শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে এলেন তখন তাঁর কার্যভার শুরু করেছিলেন এক সন্ধ্যার আসরে ছেলেমেয়েদের কাছে ভূতের গল্প বলে। বলা বাহুল্য শুধু ছেলে-মেয়েরাই নয়, আশ্রমবাসী স্ত্রী পুরুষ সকলে সে আসরে উপস্থিত ছিলেন। যেমন গা-ছমছম-করা গল্প তেমনি হুম্ হাম্ করে মজার ঢং-এ বলা। ছেলে বুড়ো সকলকে সমানভাবে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক কাল আগে রূপকথার

সঙ্গে আরব্য রজনীর উপকথা মিশিয়ে লিখেছিলেন 'ভূতপত্রীর দেশ'; সেই কথা সকলের মনে পড়ে গিয়েছিল। ভূতুড়ে গল্প বলায় তাঁর চিরকালের আনন্দ। এই সেদিন মাত্র বেরিয়েছে তাঁর বাদশাহী গল্প (পৌত্র বাদশাকে— সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা গল্প)—আশ্চর্য মজাদার সব কাহিনী। শুরুতেই ভূতুড়ে কাণ্ড।—বাদোশা বাবু বললেন—দাদামশা, ভূতপত্রীর দেশ দেখা শেষ করে কোথায় গেলে? শুরু হল ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ছারপোকার পিঠে চেপে যেতে যেতে—হাজির হয়েছেন গিয়ে ভুলেশ্বর পরগণার ভূতখানায়— ভূভারতের অধুনালুপ্ত কৃষ্টির রত্ন সমষ্টি। ভূতখানার কিউরেটার আর তার অশিস্টান্ত (বলা বাহুল্য অ্যাসেস্টাণ্ট) খোনা খোনা নাকি সুরে অভ্যর্থনা জানাল। খুব সমাদর করে আর্ট কালেকশান দেখাতে লাগল—

দেখেন অজণ্টা গুহার দোরের ছিটকিন
যেন আজকালের একটি চেপ্টিপিন।
পাহাড়পুরের কাঁচা ইট একখান
মহেঞ্জাদারোর বেঞ্জোর কান।
এটা বুঝি নারদমুনির পিয়ানোর তার?
—অদ্ভুত শিল্পসৃষ্টি আপনার।
বাইরে পড়ে ওটা কি?
মৈপাল রাজার সুখপাল পালকি।
—তাহলে আমি এটাতেই উঠি আর কি
—নমস্কার।

* * *

প্রণিপাত, দণ্ডবৎ—একটা দিয়ে যান
অটোগ্রাফ।

পকেট খুঁজতে গিয়ে দেখি পকেটও নেই, সোয়ান কলমও নেই, কামিজটাও লোপাট।

জেগে দেখি হয়ে গেছি ঠাকুর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ।

Fantasy বা উদ্ভট কল্পনা সৃষ্টিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'বুড়ো আংলা'

এর অপূর্ব নিদর্শন। রিদয় বলে ছেলেটার হৃদয় বলে কোনো পদার্থ নেই, দয়া মায়া একটুও ছিল না। গণেশ ঠাকুরের শাপে ছেলেটা বুড়ো আঙুলের মতো এইটুকু এক বক হয়ে গেল। তারপর একদিন বেরিয়ে পড়ল দেশ ভ্রমণে এক খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে বুনো হাঁসের দলে ভিড়ে। আকাশ থেকে সে দেখছে বাঙলা দেশের চিত্র—এমন বিচিত্র কাহিনী এক অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ লিখতে পারতেন না।

আপন কথা, খাতাঞ্চির খাতা, আলোর ফুলকি—এ সবই ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা—পূর্বে অপ্রকাশিত কিছু কিছু লেখা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে—রং বেরং, চাঁই বুড়োর পুঁথি, চটজলদি কবিতা ও বাদশাহী গল্প। জীবনভোর শিশুদের কথা ভেবেছেন, তাদের জন্যে লিখেছেন। অনেকদিন আগে একটি প্রবন্ধে বাঙলা দেশকে আমি শিশুতীর্থ আখ্যা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমাদের মহা মনীষী ব্যক্তিরা শিশুকে যতখানি সম্মান দিয়েছেন পৃথিবীর আর কোনো দেশের শিশুরা ততখানি পায় নি। বাঙালী শিশু-মাত্রেরই হাতেখড়ি হয়েছে স্বয়ং বিদ্যাসাগরের হাতে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমন মহামনস্বী ব্যক্তি শিশুর বিদ্যারম্ভের জন্যে বর্ণপরিচয় লিখে দেন নি। বাঙালীর বোধোদয় বলতে গেলে তাঁর দৌলতেই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্যে যে কবিতা লিখে দিয়েছেন পৃথিবীর সাহিত্যে তার তুলনা নেই। শেষ জীবনে তিনিও শিশুদের বিদ্যারম্ভের ভার নিয়েছিলেন। আর আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাঁর তুলি কলম দু-ই নিয়োজিত করেছেন শিশু পরিচর্যায়। বাঙালীর শিক্ষা দীক্ষা চরিত্রের যে একটা বুনিয়াদ তৈরি হয়েছিল তার মূলে এঁদের এবং উল্লেখযোগ্য আরো কিছু প্রতিভাবানের শিশু পরিচর্যার পরিকল্পনা। আজকে যে সে বুনিয়াদ ধসে পড়েছে তার কারণ শিশুদের খাদ্যে যতখানি ভেজাল, পাঠ্যে ততখানি।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিশুসাহিত্য কেবল যদি শিশুদেরই উপযোগী হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, এর মধ্যে কিছু একটু ঘাটতি আছে। প্রথম শ্রেণীর শিশুসাহিত্যের লক্ষণ এই যে, তা ছোট বড় সকলেরই মনোহরণ করে। আমি এমন কোনো বয়সের কথা ভাবতে পারি নে

যে বয়সে Alice in Wonderland পড়ে ভালো লাগবে না। শিশুদের জন্যে লেখা অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি বই সম্পর্কেও ঐ কথা বলা চলে। ক্ষীরের পুতুল-এর মতো এমন মধুক্ষরা কাহিনী কার না ভালো লাগে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিশু বিভাগ একাধিকবার ক্ষীরের পুতুল অভিনয় করেছে। ছেলে বুড়ো সকলের কাছে সে যে কী উপভোগ্য মনে হয়েছে সে বলবার নয়।

লেখা শুরু করে অবধি প্রধানত শিশুদের জন্যেই লিখেছেন। গোড়ার দিকে ভারতী পত্রিকায় শিল্প সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে সব লেখা বহুকাল ভারতীর পাতাতেই লুকিয়েছিল। পরে 'ভারত শিল্প' নামক গ্রন্থে সে প্রবন্ধ ক'টি সঙ্কলিত হয়েছে। বড়দের জন্যে লেখার কথা তেমন করে অনেকদিন পর্যন্ত ভাবেন নি। একবার অসুখে ভুগে উঠবার পরে ডাক্তারের নির্দেশ মতো ফেরি স্টীমারে করে নিত্য গঙ্গার হাওয়া খেতে যেতেন। এটা কয়েক মাস ধরে চলেছিল। তখন গঙ্গার যে সব দৃশ্য দেখেছেন, স্টীমার যাত্রীদের মধ্যে যে সব চরিত্র তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাই নিয়ে 'পথে বিপথে' গ্রন্থে গল্পের আকারে কয়েকটি খণ্ড চিত্র এঁকে-ছিলেন। এসব গল্প যখনকার লেখা (১৯১৮-১৯) তখন সবুজপত্রে প্রমথ চৌধুরী তাঁর মজলিসী চালে নতুন ধরনের গল্প লিখে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। 'পথে বিপথে'র গল্পে প্রমথ চৌধুরীর ঢং খানিকটা প্রবেশ করেছে। তবে প্রমথবাবুর ঢং-এর সঙ্গে অবনবাবু একটু অধিক পরিমাণে রং মিশিয়েছেন; তাতে হয়েছে কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গল্পগুলো সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোল্‌রিজ-এর মতো, বলা যেতে পারে অবনীন্দ্রনাথ ওখানে তাঁর পাঠকদের কাছে wilful suspension of disbelief এর দাবি করেছেন।

বড়দের জন্যে গুরুগম্ভীর বিষয়ে লেখা বলতে গেলে বাধ্য হয়েই লিখতে হয়েছে। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, ইতিমধ্যে শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় শিল্প ভাবনায় তিনি যুগান্তর এনেছেন। সমস্ত দেশ তাঁকে শিল্পগুরুরূপে গ্রহণ করেছে। এই সময়ে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তাঁকে বাগেশ্বরী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে হয়। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে (১৯২২—২৭) তাঁকে শিল্প বিষয়ে যে নিয়মিত ভাষণ দিতে হয়েছিল তাই পরে 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে এটি বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

শিল্পী মানুষের মধ্যে একটি কবি প্রকৃতি সব সময়েই প্রচ্ছন্ন থাকে। অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই কবি মানুষটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর গদ্য ভাষায় যে কাব্যগুণ বর্তমান সেটি বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেজন্যে এক সময়ে তিনি অবনীন্দ্র-নাথকে দিয়ে গদ্যিকারীতিতে কবিতা লেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে অবনীন্দ্রনাথ সে ধরনে কিছু লিখেওছিলেন। সে কবিতায় কাব্যের অলঙ্করণ যতখানি ছিল সম্বরণ ততখানি ছিল না। কবিতা জিনিসটা ভাবে ভঙ্গিতে সংযত সম্বৃত। সে যতখানি ভাবে ততখানি বলে না। ভাষা আরেকটু সংহত হলে সে সব কাব্যগন্ধী জিনিস কবিতার পর্যায়ে আসতে পারত। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে খুব বেশি অধ্যবসায় দেখান নি। অবনীন্দ্রনাথের শক্তির 'পরে রবীন্দ্রনাথের অগাধ বিশ্বাস ছিল। মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্বে শ্রীমতী রানী চন্দকে ডেকে বলেছিলেন, অবনের ভাণ্ডারে অনেক সঞ্চয় আছে। তোরা যত পারিস আদায় করে নে। ও বসে লিখবার মানুষ নয়। ও বলে যাবে, তুই লিখে নিস্। রানী চন্দ গুরুদেবের আদেশ পালন করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'। তিন পুরুষ ধরে জোড়াসাঁকো মহর্ষি ভবনে যে জীবনকাব্য রচিত হয়েছিল তারই অপূর্ব স্মৃতিচারণ। অবনীন্দ্রনাথ মূলত মজলিসী স্বভাবের কথক মানুষ। তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মের মধ্যে ঐ মজলিসী বলিয়ে কইয়ে মানুষটিরই প্রাধান্য। তিনি জীবনে কোনোদিন খবরের কাগজ পড়েন নি। বলতেন, খবর কি লোকে পড়ে নাকি, খবর তো লোকে শোনে। খবর জানতে হলে কাউকে বলতেন পড়ে শোনাতে। খুব খাঁটি কথাই বলেছেন। আর্টিস্ট মানুষ তো সব জিনিসকে তার আদিম

এবং স্বাভাবিক রূপে দেখতে চাইতেন। খবরের বেলায় যে কথা, গল্পের বেলাতেও তাই। এই ছাপাখানা হবার পর থেকেই লোকে গল্প পড়তে শুরু করেছে। নইলে গল্প চিরকাল লোকে শুনেই এসেছে। অবনীন্দ্রনাথ ঐ কথাটি সব সময়ে মনে রেখেছেন। এজন্যে ছেলে বুড়ো যার জন্যেই লিখেছেন ভঙ্গিটা সেই একই—যেন কথা বলে যাচ্ছেন অর্থাৎ তাঁর লেখা পাঠকের জন্যে নয়, শ্রোতার জন্যে। শ্রীমতী রানী চন্দর কৃতিত্ব এই যে, এ দুটি গ্রন্থে তিনি শুধু যে অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন এমন নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরটিও অবিকল ধরে রেখেছেন। পড়তে গেলে তাঁর গলার আওয়াজটি পাওয়া যায়, তাঁর চোখের চাউনি হাত নাড়ার ভঙ্গিটি চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে।

কোলরিজ সম্বন্ধে হ্যাজলিট বলেছিলেন—He talks far above singing—অর্থাৎ মুখের কথা এত সুন্দর, এর কাছে গান কোথায় লাগে। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠিক এই কথাটি বলা চলে। মানুষের মুখের কথা যে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'কথাসাহিত্য' কথাটিকে আমরা নিতান্ত আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করি। আমি কথাসাহিত্য বলতে সোজাসুজি বুঝি মুখের কথা যেখানে সাহিত্যের রূপ লাবণ্য লাভ করেছে। দৃষ্টান্ত চান তো যে পাতা খুশি খুলে ধরুন। এই দেখুন 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে আপন শৈশবের কথা যেখানটায় বলছেন—বাদলা দিনের কথা—"সাত রাত সাত দিন ঝমাঝম্। মটর ভাজি কড়াই ভাজি ভিজে ছাতি। যেদিকে চাও ভিজে শাড়ি ভিজে কাপড় পরদা টেনে হাওয়ায় দুলছে, তারই তলায় তলায় খেলে বেড়ানো সারাদিন, সন্ধ্যে থেকে কোলা ব্যাঙে বাদ্যি বাজায়, রাজ্যের মশা ঘরে সেঁধোয় টাকাং দিং টাকাং দিং মশারি ঘিরে। দাসী চাকর সরকার বরকার সবার মাথায় চড়ে গোলপাতার ছাতা···ছেলে বুড়ো মিলে গান গল্প, বাবু ভায়ে মিলে খোস গল্প—আর কত কি মজা আঠারো ভাজা জিবে গজা। গুড়গুড়ি ফরসী দাদুরীর বোল ধরত গুড়ুক ভুড়ুক।"

সাহিত্য আর কাকে বলে—যে কথার মধ্যে সুর আছে, ছন্দ আছে,

ছবি আছে তাই তো সাহিত্য। অতীতের বিলীয়মান স্মৃতি কিংবা মনের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিকে কথার বাঁধনে ধরে রাখা সহজ নয়। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, এ প্রায় বাতাসে ফাঁদ পাতার মতো কঠিন ব্যাপার। অবনীন্দ্রনাথ সে কাজটি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। রং রেখার ব্যবহারে তিনি যেমন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপশিল্পী ভাষার ব্যবহারেও তিনি তেমনি আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী।

এই মহামনস্বী ব্যক্তির আজ শতবর্ষ পূর্ণ হল। দেশবাসী আজ কিভাবে তাঁকে স্মরণ করবে জানি না। কারণ বাঙলাদেশ আজ ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নেই। বহু অত্যাবশ্যক কর্তব্য ভুলে গিয়ে নানা অকর্তব্য নিয়ে সে ব্যতিব্যস্ত। সেজন্য এখানে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। অবনীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর মাত্র তিন সপ্তাহ পূর্বে (১৩ জুলাই, ১৯৪১) বাঙলা দেশের কাছে একটি আবেদন জানিয়েছিলেন। বোধকরি দেশবাসীর কাছে এটিই তাঁর সর্বশেষ নিবেদন। বলেছিলেন, "আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম।···সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাঙলা দেশের এই অহঙ্কারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে তবে এ যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাঙলা দেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।"

আচার্য নন্দলাল ও শান্তিনিকেতন

বুঝে যতখানি আনন্দ, না বুঝে ততখানি—বলেছিলেন অ্যালডাস হাক্সলি। হাক্সলি সাহিত্যিক মানুষ, কিন্তু এ কথা তিনি সাহিত্যরস সম্পর্কে বলেন নি, বলেছেন চিত্রশিল্প সম্পর্কে। শিল্প ব্যাপারে হাক্সলি নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন না বরং তাঁর বহুবিধ রচনা পাঠ করে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি চিত্রশিল্পের একজন খাঁটি সমজদার ছিলেন। তথাপি শিল্প এমন জিনিস—তা কাব্যসাহিত্যই হোক আর চিত্রকলাই হোক—সে সম্পূর্ণরূপে কখনো নিজেকে ব্যক্ত করে না, খানিকটা তার অব্যক্ত এবং অস্পষ্ট থেকেই যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রখ্যাত শিল্পী এল্ গ্রেকোর কোনো কোনো ছবি হাক্সলির কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে, তারই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পূর্বোক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন। অর্থাৎ যা স্পষ্টতঃ বোঝেন নি তাও চোখে দেখে তিনি আনন্দ পেয়েছেন।

আমার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। রং-রেখার ভাষা এবং চিত্রাঙ্কনের প্রকরণ সম্পর্কে আমার জ্ঞান এত সামান্য যে, ছবি দেখার আনন্দ বলতে গেলে আমাকে একেবারে না বুঝেই পেতে হয়েছে। কিন্তু বুঝি নি বলে আনন্দ পাই নি এ কথা অবশ্যই বলব না। কাব্য সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধে এটা নতুন কথা নয়। রস গ্রহণ করতে সবটুকু বোঝবার প্রয়োজন হয় না, বোঝা যায়ও না। অনেক কবিতা আছে যার মর্ম পুরোপুরি বুঝতে পারি নি, ব্যাখ্যা করে কখনোই বুঝিয়ে বলতে পারব না; অথচ তারই মধ্যে অপূর্ব স্বাদ পেয়েছি—এ অভিজ্ঞতা আমার একলার নয়, কাব্যরসিক মাত্রেরই এই অভিজ্ঞতা। এমন যে টি. এস. এলিয়ট তিনিও বলেছেন—"Some of the poetry to which I am most devoted is poetry

which I did not understand at first reading; some is poetry which I am not sure I understand yet." কাব্যের আস্বাদ লাভ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "লাভ করিবার জন্য পুরোপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না।" রবীন্দ্রনাথ 'কথা'কে বলেছেন মুখরা— 'মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।' সে তুলনায় রেখাকে বলেছেন 'অপ্রগলভা'; ওর মুখে কথা নেই। কিন্তু আমি বলব মুখে কথা নেই বলেই ওর মন পেতে হলে চিন্তা করতে হয় আরো বিস্তর। আমার সাধ্যে সেটা কুলোয় না। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের বহু ছবি মনকে আশ্চর্য রকম দোলা দিয়েছে অথচ সে ছবি বিশ্লেষণ করে কিছুই আমি বলতে পারব না। এই সম্পর্কে জঁা পল সার্ত্রের একটি উক্তি মনে পড়ছে—"I relished the ambiguous delight of understanding without understanding"।

শিল্পকে বোঝা যেমন কঠিন শিল্পীকে বোঝাও তেমনি কঠিন। শিল্প সাধারণ জিনিস নয়, শিল্পীও সাধারণ মানুষ নন। খানিকটা অসাধারণত্ব এঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই নিহিত। তথাপি ছবি না বুঝেও ছবি দেখে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি শিল্পীকে পুরোপুরি না বুঝেও তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনুভব করা যায়। যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আচার্য নন্দলালের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য-লাভের সৌভাগ্য আমার হয় নি, আলাপ-পরিচয় সাধারণ শিষ্টাচারেই আবদ্ধ ছিল। কোনো গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা কখনোই হয় নি। তা হলেও অসাধারণ মানুষের অসাধারণত্ব কোনো মতেই ঢাকা থাকে না, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে। এমন মিতভাষী মিতাচারী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। অথচ যখন যেখানে উপস্থিত থেকেছেন তাঁর নীরব উপস্থিতি সমস্ত পরিবেশকে প্রসন্ন করেছে। অসাধারণ মানুষও যে কত সাধারণভাবে চলাফেরা মেলামেশা করতে পারেন সেটা নন্দলাল বসুকে দেখে যতটা মনে হয়েছে এমন আর কাউকে দেখে নয়। পরনে খদ্দরের পাজামা, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, গলায় খদ্দরের চাদর, পায়ে স্লিপার। গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য

চাদরটি মাথায় জড়িয়ে নিতেন। ক্ষিতিমোহনবাবুকেও দেখেছি বেশভূষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। এণ্ড্রুজ সাহেবকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা তাঁর আপন-ভোলা চালচলনের কথা এখনও বলেন। এমন দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যেতে পারে। এঁদের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সঙ্গে শান্তিনিকেতন-জীবনের বিশেষ একটি যোগ আছে। উপকরণবাহুল্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না। এখানকার জীবন আরম্ভ করেছিলেন খোলা মাঠের মধ্যে খান কয়েক খড়ের চলাঘর নিয়ে। যাঁরা এসে কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সেই পরিবেশের সঙ্গে অভ্যাসে আচরণে অশনে বসনে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। অবশ্য বলে নেওয়া ভালো যে, বেশভূষায় ঔদাসীন্যটা in itself একটা গুণ নয়, বেশভূষার পারিপাট্যও একটা দোষ নয়। আসল কথাটা হল, রবীন্দ্রনাথ একটি সরল অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে যে একটি ঐশ্বর্যময় জীবনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন এঁরা সেই জীবনের প্রতীক। তাঁর ঈপ্সিত ঐশ্বর্য বহিরঙ্গে প্রকাশ না পেয়ে অন্তরঙ্গ জীবনে প্রতিফলিত হবে, এই তিনি চেয়েছিলেন। জানতেন, বাইরের বৈভব অন্তরের দারিদ্র্যকে কখনো ঢেকে রাখতে পারে না। সহজ সরল জীবনের মধ্যে একটি আভিজাত্য আছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন সে আভিজাত্যের চর্চা করেছে। শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবনটিকে নানা কারুকার্যে মণ্ডিত করে শোভন সুন্দর করে গড়ে দিয়ে-ছিলেন। দৈনিক কর্মসূচি হিসেবে না দেখে এর সাংগঠনিক দিকটির কথা ভাবলে একে একটি শিল্পকর্ম বলে মনে হতে পারত। কারণ ঐ কর্মসূচির মধ্যে রুচিটাই প্রধান স্থান পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় রুচির স্থান সর্বোপরি। সুষ্ঠু রুচিবোধ একবার গড়ে দিতে পারলে আর কোনো ভাবনা থাকে না। শোভন পরিচ্ছন্ন রুচি বাহ্যিক জলুসের অপেক্ষা রাখে না। এখানকার শিক্ষক-চরিত্র ঐ আদর্শেই গড়ে উঠেছিল। চাল-চলনে সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত, কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ নানাগুণে গুণান্বিত। এঁরা কেউ লেখক, কেউ শিল্পী, কেউ সংগীতজ্ঞ, কেউ অভিনেতা, কেউ গ্রামসেবক, কেউ ক্রীড়াপারদর্শী। বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশে এক অত্যুজ্জ্বল পরিবেশের

সৃষ্টি হয়েছিল। সামান্য একটি ইস্কুল পরিচালনার জন্য—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিতের সমাবেশ আপাতদৃষ্টিতে একটু বেহিসেবী মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে কোনো জিনিসকেই ছোট করে কল্পনা করেন নি। অবশ্য তাঁর বৃহতের কল্পনা আয়তনের পরিমাপে নয়, আয়োজনের পরিমাপে। যে জিনিস নিছক প্রয়োজনের মাপে তৈরি সে কখনো সত্যিকারের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এই কারণেই ইস্কুলের জন্যও এমন-সব পণ্ডিতের কথা তাঁকে ভাবতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ এর মধ্যেই নিহিত ছিল। পরবর্তীকালে যখন বিশ্বভারতীর সৃষ্টি হয় তখন দেশবিদেশাগত মনীষীদের সমাগমে এই গুণী-সমাবেশ বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়েছিল। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সনের সঙ্গে এসে যুক্ত হলেন সিলভাঁ লেভি, স্টেন কোনো, ফর্মিকি, টুচ্চি, উইনটারনিজ, লেজনি, কলিন্স, বোগদানভ, বেনোয়া প্রমুখ পণ্ডিতগণ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনো অধ্যাপনার কাজ করেন নি, কিন্তু প্রাচীন তপোবনবাসী ঋষির ন্যায় নিয়ত জ্ঞানচর্চায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর জ্ঞানতপস্যা এখানকার পরিবেশকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। চোখের সম্মুখে এরূপ একাগ্র নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত একটা বৃহৎ প্রেরণার উৎস।

একই সময়ে একই স্থানে এতগুলি গুণীজনের সমাবেশ পৃথিবীর খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা গিয়েছে। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভাকেও হার মানিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'একা নবরতন ক্ষিতিমোহন'। পাণ্ডিত্যে এবং রসালাপে ক্ষিতিমোহনবাবু একলাই বিদ্বজ্জনসভা জমিয়ে রাখতে পারতেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ—তাঁর সৃজনী প্রতিভার অবিরাম প্রবাহ গানে গল্পে নাটকে মন্দিরের ভাষণে শান্তিনিকেতনের জীবনকে রূপে রসে আনন্দে অভিষিক্ত করে রেখেছিল। যে গুণীসমাবেশের কথা বলছিলাম একমাত্র আর্থারের রাউণ্ড টেবল্-এর সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারত। টেনিসন্ রাজা আর্থারের রাউণ্ড টেবল্ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন—the goodliest

fellowship of famous Knights whereof this world holds record—রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিশ্বভারতী সম্পর্কে সে কথা বলতে পারতেন। আর্থারের নাইটরা যেমন শৌর্যবীর্যের ব্রতপালনে নিত্য উৎসুক, এইসব জ্ঞানান্বেষী পণ্ডিতেরাও তেমনি জ্ঞানের বিস্তীর্ণ রাজ্যে সারাক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ কাণ্টীয় দর্শনের মর্মোদ্ধারে মগ্নচিত্ত, বিধুশেখর শাস্ত্রী নানা ভাষার অনুশীলনে এবং হিন্দু বৌদ্ধ শাস্ত্রালোচনায় নিবিষ্টমন, ক্ষিতিমোহনবাবু মধ্যযুগীয় সন্তদের বাণী সংগ্রহে রত, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিধান রচনায় একাগ্রচিত্ত। আমরা সাধারণতঃ বলি বিদ্যাদান, বিদ্যালাভ—কথাগুলি অসম্পূর্ণ। আসল কথা বিদ্যাচর্চা, বিদ্যা অর্জন। এঁরা বিদ্যাকে নিজ চেষ্টায় এবং অধ্যবসায়-বলে অর্জন করেছেন অর্থাৎ শিক্ষক হয়েও এঁরা শিক্ষার্থী। ছাত্ররা এই যে বিদ্যাচর্চায় রত অনন্যমনা পণ্ডিতদের নিয়ত চোখের সুমুখে দেখেছে এটাই একটা মস্ত বড় শিক্ষা।

এ ছাড়া বিদ্যাচর্চাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো কেবলমাত্র পঠন-পাঠন পুঁথি-চর্চায় আবদ্ধ রাখেন নি। বিদ্যাচর্চাকে তিনি দেখেছেন জীবনচর্চা হিসেবে। শান্তিনিকেতন-শিক্ষার একটা বিশেষ দিক দেশবাসী আজ পর্যন্তও ভালো করে বুঝতে পারেন নি। সেটি এর ভাবগত দিক। কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার অন্তরে একটি ভাবপ্রবাহ নিত্য প্রবাহিত রাখতে হয়। এই কেন্দ্রগত ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন লোকহিতব্রত। তাঁর শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি লোকহিতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। বারম্বার বলেছেন চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের সঙ্গে যোগস্থাপন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। বলেছেন—"মাঠের মধ্যে ছেলেদের রেখে শিক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু লোকালয়ের জন্য ওদের যথার্থভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ওরা যদি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর মতো বই-পড়া ভালো মানুষ লোক হয়ে ওঠে—ওদের অন্তঃকরণ যদি সত্যভাবে মানবপ্রেমে অভিষিক্ত না হয়ে ওঠে তা হলে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। নদী পাহাড়ের গুহার মধ্যে লালিত ও পুষ্ট হবে, কিন্তু লোকালয়ে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাবার সম্বল তাকে জোগাতে

হবে—আমাদের ছেলেরা আমাদের দেশের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করবার জন্যেই আমাদের বিদ্যালয়ের নির্জনে সত্যের ও ভাবের ধারায় পরিপুষ্ট হতে থাকবে এই আমার ইচ্ছা।" জনজীবনের বার্তাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন Song of the Open Road. বিদ্যাদান কার্যের সঙ্গে ঐ মহাসংগীতের ধ্বনিকে মিলিয়ে দেওয়া শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কিন্তু সে কাজ সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যিনি আদর্শ শিক্ষক তিনি শুধু বিদ্বান নন, তিনি ভাবুক; কিন্তু ভাবসঞ্চারের ক্ষমতা সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়। এমনকি বিশেষ ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হবার ক্ষমতাও অনেকের নেই। শান্তিনিকেতনের শিক্ষকবর্গকে তিনি বরাবর বলে এসেছেন যে, শিক্ষাব্রতীকে লোকহিতব্রতী হতে হবে। এই ব্রতপালনে তাঁকে সহায়তা করেছেন প্রথম যুগের অধিকাংশ অধ্যাপক, বিশেষ করে ক্ষিতিমোহন সেন। বাঙলাদেশের গ্রামজীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। গ্রাম-দেশে প্রচলিত কথকতা রীতিকেই তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের বাহন করেছিলেন। নন্দলাল বসু অবহেলিত গ্রামবাসী কামার কুমোর ছুতোরকে শিল্পীর সম্মান দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত নানা কারুশিল্পকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙলা দেশের গ্রাম্য জীবনকে রং-এ রেখায় তিনি ফুটিয়ে তুললেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এণ্ড্রুজ দেশ দেশান্তরে দুর্গত মানুষের কল্যাণ কামনায় যে অক্লান্ত কর্মের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন তা অতুলনীয়; সাঁওতাল পল্লীর সেবায় পিয়ার্সনের নিষ্ঠা ছাত্রদের সেবাকার্যে উদ্বুদ্ধ করেছে; এল্‌মহার্স্ট, কালীমোহন গ্রাম সংগঠন কার্যে প্রাণমন সমর্পণ করেছেন। এ সমস্তই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত।

এ কথা নিশ্চিত যে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষাদান ব্যাপারে পাণ্ডিত্য ছাড়াও আরো অনেক গুণের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি স্রষ্টা। তিনি জানেন যে, মানুষ নিষ্ক্রিয় ভাবে শুধু গ্রহণ করে না, সে দিতেও চায়। মানুষের মন সৃজনবিলাসী, সৃজনকার্যেই তার প্রধান তৃপ্তি। শিক্ষা ব্যাপারটা একটা অকর্মক ক্রিয়া নয়। *বিদ্যার্জন ক্রিয়াটা তখনই সকর্মক* অর্থাৎ সার্থক হবে যখন বিদ্যার্থী নিজেকে প্রকাশ করতে শিখবে। সে গান

করবে, অভিনয় করবে, ছবি আঁকবে, কবিতা লিখবে, নাচবে, খেলবে। কোনো কিছুতে পারদর্শিতা দেখাতে পারলে তবেই তার আত্মবিশ্বাস জন্মাবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার আয়োজনকে অনেক বিস্তৃত করতে হয়েছে। ছাত্রদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হয়েছে নানা দিকে, নানাভাবে। এইজন্যে প্রয়োজন হয়েছে দিনেন্দ্রনাথের ন্যায় সুরশিল্পীর, নন্দলালের ন্যায় চিত্রশিল্পীর। আত্মপ্রকাশের প্রশ্ন ছাড়াও শিক্ষার ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের চর্চা রবীন্দ্রনাথের মতে অপরিহার্য। একবার যদি সৌন্দর্যবোধ মনে জাগিয়ে দেওয়া যায় তা হলেই মানুষের মন নীচতা ক্ষুদ্রতা হিংসা বিদ্বেষ—সকল প্রকার কুৎসিত চিন্তা থেকে বিরত থাকবে। সৌন্দর্যবোধ মূলতঃ পরিমিতিবোধ—আচারে ব্যবহারে, নিত্যদিনের কর্মে। সুমিতিবোধ আর সুনীতিবোধ এক কথা। সভ্য মানুষের একমাত্র নীতি সৌন্দর্যবোধ যার বাস্তব প্রকাশ ব্যবহারের সৌকুমার্যে। যে কাজ সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করে তাই নীতিবিরুদ্ধ কাজ। কল্যাণকে এবং সুন্দরকে এই জন্যেই আমাদের শাস্ত্রে একাসনে স্থান দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাকে যেখানে বৃহত্তম শিল্প অর্থাৎ জীবনশিল্প হিসেবে দেখা হয়েছে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধান কথা শিল্পরুচি। সে কাজ গোড়ার-দিকে শুরু করেছেন কবি নিজে। কবিমনের স্বভাবসুলভ শোভন রুচির ছাপ পড়েছে প্রতিদিনের প্রত্যেকটি কাজে। রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে যেখানে কোথাও একটু রং ছিল না, সবুজের আভা ছিল না, সেখানে একটি যেন মরূদ্যান গড়ে উঠল। ক্ষয়ে-যাওয়া মাটির ক্ষয় নিবারণ হল। মাটির গায়ে সবুজের ছোপ লাগল, ছেলেদের মনেও। এ সমস্তই কবির নিজ উদ্যমে সম্ভব হয়েছে। নন্দলালের আগমনের পরে আশ্রমের অঙ্গসজ্জায় তিনিই হলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়। কবি এবং শিল্পীর মিলনে দিনে দিনে শান্তি-নিকেতন-জীবনের শ্রী সৌন্দর্য বাড়তে লাগল। কবির কাব্য রংয়ে রেখায় রূপ গ্রহণ করল। প্রাচীরগাত্রে দেখা দিল কচ-দেবযানীর কাহিনী, নটীর পূজার কাহিনী। রবীন্দ্রনাট্যের প্রযোজনায় মঞ্চসজ্জার ভার নিলেন নন্দলাল। যথার্থ শিল্পরুচি যাদুমন্ত্রের কাজ করে। যৎসামান্য উপকরণের

সাহায্যে সহজের মধ্যে সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলবার দুঃসাধ্য সাধনায় নন্দলালের অসামান্য প্রতিভা প্রকাশ পেল। সুরকার হান্‌ডেল্‌ সম্পর্কে বীটোফেন বলেছিলেন—go and learn of Handel how to achieve great effects with simple means। রূপসজ্জার ব্যাপারে সামান্যকে অসামান্য করবার ক্ষমতায় নন্দলালের সমকক্ষ ব্যক্তি এ দেশে জন্ম গ্রহণ করেন নি। আমাদের মঞ্চসজ্জা এবং উৎসবসজ্জায় এক নতুন ধারার প্রবর্তন হল। পরবর্তীকালে কংগ্রেস মণ্ডপ সজ্জায় শিল্পের এই সহজিয়া সাধনার রূপ দেখে গান্ধীজি বলেছিলেন, নন্দলালজি তো যাদুকর হ্যায়। শান্তিনিকেতনের উৎসব-প্রাঙ্গণ প্রতি ঋতুতে তাঁরই হাতের ছোঁয়া লেগে প্রাণবন্ত হয়েছে। এক কথায় শান্তিনিকেতনের প্রসাধন-ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। সুন্দর জিনিস সারাক্ষণ চোখের সমুখে থাকলে মানুষের রুচি অজ্ঞাতসারে মার্জিত হয়। চৈত্যর কাঁচে ঢাকা আধারে ছবি কিংবা মূর্তি কিংবা কোনো হস্তশিল্পের নিদর্শন ছাত্রদের চোখের সমুখে রাখা থাকত। রুচি অনুশীলনে এর মূল্য অপরিসীম। সংগীত সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। ছাত্ররা ক্লাশ করছে, তারই মধ্যে দূর থেকে গানের সুর তরঙ্গিত হয়ে আসছে। নিত্যকার রুটিনবদ্ধ জীবনকে ছন্দোবদ্ধ করেছে। এরও মূল্য কম নয়। চার্লস ল্যাম তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন—ঘরে বসে আমি লিখছি, আমার জানলার বাইরে ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, তাদের রিন্‌রিনে গলার কলকোলাহল আমার কাজ অনেকখানি সহজ করে দিচ্ছে। বলেছেন, "It is like writing to music. They seem to modulate my periods." ছেলেপেলের উচ্চকণ্ঠ কলরব যদি ক্লান্তি হরণ করতে পারে তা হলে তাদের মিঠে গলার গান যে কাজের মধ্যে কতখানি মাধুর্য এনে দিতে পারে—শান্তিনিকেতনে এই অভিজ্ঞতা নিত্য দিনের। রুটিনের রূঢ়তা ছাত্র শিক্ষক উভয়ের মন থেকে আপনি দূর হয়ে যায়।

ঋতু-উৎসবের অঙ্গসজ্জার কথা আগে বলেছি। এই সূত্রে বলা আবশ্যক যে, রবীন্দ্রকাব্যে ঋতু-বৈচিত্র্য বা প্রকৃতির নিত্য পরিবর্তনশীল রূপ যে স্থান অধিকার করেছে নন্দলালের চিত্রশিল্পেও ঠিক সেই স্থান দখল করেছে।

সকল দেশেরই কাব্যশিল্পে বিষয়বস্তু এককালে আহরণ করা হয়েছে প্রধা-নতঃ পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক মালমসলা থেকে। অর্থাৎ সে কালের কাব্যশিল্প কিছুবা ধর্মকথা কিছুবা ইতিবৃত্ত। পশ্চিম দেশে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই কাব্যশিল্পের রাজ্যবিস্তার শুরু হয়েছে। পুরাবৃত্ত ইতিবৃত্ত ছেড়ে আমাদের নিত্য পরিচিত জগৎ কাব্যসাহিত্যে স্থান পেল। ইংরেজী সাহিত্যে এ পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তাঁর কাব্যকীর্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য—to give the charm of novelty to things of everyday life। অতিপরিচয়ে যে জিনিস উপেক্ষিত তার মধ্যে সৌন্দর্যের আবিষ্কার যথার্থ শিল্পীমনের পরিচায়ক। আমাদের সাহিত্যে ঐ কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের চতুষ্পার্শ্ব সম্পর্কে আমা-দের মনকে সজাগ করে দিলেন। আমাদের ঘরের পাশের গাছপালা, ফুল-ফল, আমাদেরই দোরের সমুখ দিয়ে যে মানুষ হাটে যায়, গোরুর গাড়ি চালায় তাদের সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য বাড়ল।

আমাদের কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে কাজটি করেছেন চিত্রশিল্পে সেই কাজ করেছেন নন্দলাল। রবীন্দ্রনাথ যেমন বুনো ফুলটিকেও অবহেলা করেন নি, বলেছেন—তোমার আসন কাব্যে দিলাম পেতে, নন্দলালের ছবিতেও তেমনি এতকালের শিল্পের উপেক্ষিতরা রেখায় তুলিতে ফুটে উঠল। বীরভূমের খোয়াই, গোরু-চরা মাঠ, সাঁওতাল মাঝি মেঝেন, সমুদ্রতীরের নুলিয়া, পাহাড়ী কুলি মজুর—শিল্পের জগতে এদের সকলের স্থান করে দিলেন। আমাদের চিত্রশিল্পে এইটি মস্ত বড় দান। এর অভিনন্দন মিলেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেখানে নন্দলালকে সম্বোধন করে বলেছেন—

যাহা-তাহা যেমন-তেমন আছে কতই কী যে,
তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে।

কিংবা

এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চশ্রবা ত্যেজে

উচ্চশ্রবাকে ত্যাগ করে ছাগলের প্রতি মনোনিবেশ করার মধ্যেই পুরাবৃত্ত ছেড়ে পারিপার্শ্বিককে গ্রহণ করার ইঙ্গিত আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের

অভ্যাসজীর্ণ চোখ এবং মনকে নিত্য পরিচিত জিনিসের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত করেছেন নন্দলাল সেই জিনিসকেই তুলির স্পর্শে সমুখে তুলে ধরে ঐ পরিচয়কে আরো অন্তরঙ্গ করেছেন। নন্দলালের প্রকৃতিবন্দনা কেবল-মাত্র গিরিশৃঙ্গের শোভা এবং সূর্যাস্তের আভায় সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর প্রকৃতির মূর্তি বহু ক্ষেত্রে অতিশয় প্রাকৃত—

ঐ যে গরিবপাড়া,
আর-কিছু নেই ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা কুটীর ছাড়া।
তার ওপারে শুধু
চৈত্র মাসের মাঠ করছে ধূ ধূ।

এই নিরাভরণ দৃশ্যের সৌন্দর্য নন্দলালের আবিষ্কার। এ দিক থেকে নন্দলাল কবিগুরুর শিল্পীশিষ্য। তাঁর শিল্পকর্ম অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির পরিপূরক। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গ্রন্থে ছবির অলঙ্করণ নন্দলালের কৃত। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাকে তিনি রংয়ে রেখায় রূপ দিয়েছেন। এ দিক থেকে নন্দলাল রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম interpreter বা ভাষ্যকার। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথও নন্দলালের আঁকা চিত্র অবলম্বন করে বহু কবিতা রচনা করেছেন। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে যাঁরা এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁর কাজে, মন মিলিয়েছিলেন তাঁর মননে, সুর মিলিয়েছিলেন তাঁর গানে তাঁরা অনেকেই বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ; কিন্তু কবি এবং শিল্পীতে যে যোগাযোগ ঘটেছিল এমন মণিকাঞ্চন যোগ কদাচিৎ ঘটে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগ স্থাপন বিশ্বভারতীর অন্যতম আদর্শ। সেই কার্যে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা করেছেন এণ্ড্রুজ দেশ-বিদেশে কর্মযোগে আর করেছেন নন্দলাল তাঁর শিল্পসাধনার বলে। যে কালে বিদেশী ছাত্রদের এ দেশে আসার রেওয়াজ হয় নি সেই তখনো দূর দেশের শিক্ষার্থীরা শান্তিনিকেতন কলা-ভবনে এসে ভিড় করেছেন। এসেছেন সিংহল থেকে, চীন জাপান জাভা থেকে। শান্তিনিকেতনের 'নন্দন' ক্ষুদ্রাকারে এ যুগের নালন্দা।

দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সাধনার স্থল শান্তিনিকেতন।

সেই সাধনক্ষেত্রের প্রসাধন-ভার যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি বিনা সাধনায় সে কার্য সাধন করতে পারেন নি। নন্দলালের জীবন এক সাধনার জীবন। অর্ধশতাব্দীকাল বলতে গেলে যোগাসনে বসে কাটিয়ে দিলেন। অর্থ স্বার্থ, পদমর্যাদা, ক্ষমতার মোহ, বহির্জগতের সমারোহ কিছুই তাঁকে একাগ্র নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। চতুর্গুণ মাইনের চাকুরি একাধিক বার প্রত্যাখ্যান করেছেন। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস বহু জনের স্বার্থ-ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। সে ইতিহাস আজ বিস্মৃতপ্রায়।

শান্তিনিকেতন-শিক্ষার উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য গুরুশিষ্যের সম্পর্ক। এ দিক থেকে শান্তিনিকেতন ভারতীয় ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। পুরা-কালের সেই গুরুভক্তি যে এ কালেও সম্ভব সে কথা নন্দলাল এবং তাঁর শিষ্যদের সম্পর্ক স্বচক্ষে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করত না। ছাত্রদের শুভাশুভ চিন্তায় তিনি তাঁদের অভিভাবক, সঙ্কটে সমস্যায় সচিব, ললিত কলাচর্চায় প্রিয়সখা। ছাত্র শিক্ষক মিলে কলাভবনে একটি অতি স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন গড়ে উঠেছিল। ঐটিই শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ। শিক্ষক নন্দলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য—"ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্ব প্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে শোকে অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।" প্রকৃত শিক্ষক যে কী ভাবে আপন ব্যক্তিত্বকে চতুষ্পার্শ্বে পরিব্যাপ্ত করতে পারেন তার প্রমাণ—শুধু কলাভবনের ছাত্রদের কাছেই নয়—সমস্ত আশ্রমবাসীর নিকট তিনি মাস্টারমশায় নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ সমগ্র শান্তিনিকেতন তাঁকে শিক্ষাগুরু হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

শিক্ষা জিনিসটা একতরফা নয়—শিক্ষক-ছাত্রের সমবেত প্রয়াসের ফল। আপন শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে বলেছেন, শেখাই নি, একসঙ্গে কাজ করেছি। ছাত্রদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কাজ করেছি। আমারটা দেখে ওরা শিখেছে, ওদেরটা দেখে আমি। কে মাস্টার, কে ছাত্র মনেই হয় নি।

এই হচ্ছে আদর্শ শিক্ষকের কথা। এই এক কথায় শান্তিনিকেতন শিক্ষাপদ্ধতির মর্মকথাটি তিনি ব্যক্ত করেছেন। লেনার্ড এলমাহার্স্ট বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশান। শিক্ষকের কৃতিত্ব সম্পর্কে এর চাইতে বড় কথা আর হতে পারে না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বই শিক্ষার প্রধানতম উৎস। সেই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বুদ্ধি হৃদয় নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়।

সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যা বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়, বিদ্যার বিকিরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সেদিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি কেবলমাত্র তার ক্যাম্‌পাস্‌-এ আবদ্ধ নয়, সমগ্র দেশে বিস্তৃত। শিক্ষা বিকিরণের আদর্শ নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ এবং লোকশিক্ষা সিরিজের গ্রন্থাদি প্রকাশকে বিশ্বভারতীর কর্মসূচীর অন্তর্গত করে দিয়েছিলেন। আবার গ্রন্থপ্রণয়নই শিক্ষা বিকিরণের একমাত্র উপায় নয়। রবীন্দ্রনাথের গান এবং নাটকের অভিনয়ও এ কাজে প্রচুর সহায়তা করেছে। নন্দলালও শিল্পবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর এক অভিনব দান—তাঁর অঙ্কিত অগণিত স্কেচ। যখনই যাঁর কাছে চিঠি লিখেছেন তখনই কার্ডের একে দিকে কোনো না কোনো স্কেচ করে পাঠিয়েছেন। অটোগ্রাফ বই-এর তো কথাই নেই। এরূপ শত শত স্কেচ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। লোকশিক্ষার এ এক অভিনব প্রণালী। এক কালের লোকসংগীত, লোকসাহিত্য যে কাজ করেছে শিল্পের ক্ষেত্রে নন্দলাল বসু সেই কাজ করেছেন। শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন, "আচার্য নন্দলাল বসুর সংহত স্কেচের এবং চিত্রের অজস্রত্ব বিশ্বের শিল্পে অতুলনীয়।" এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কারুকলার ভাষা নির্বাক। শান্তিনিকেতনের সর্বাঙ্গে কারুকলার ছাপ অর্থাৎ নন্দলালের নীরব উপস্থিতি সর্বত্র বিজ্ঞাপিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রেখা অপ্রগলভা; সে কখনো নিজেকে সরবে ঘোষণা করে না। শিল্পের স্বভাব শিল্পীর মধ্যে বর্তায়। নন্দলালের মতো মিতভাষী মিতাচারী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। শিল্পসৃষ্টিতে তিনি যে সংযম দেখিয়েছেন দৈনন্দিন

জীবনের প্রতিটি কাজে সেই সংযম প্রকাশ পেয়েছে। ব্যবহারে বা কাজে কখনো কোনো প্রকার আতিশয্য প্রকাশ পায় নি। মানুষের ধর্মবোধ যেমন আচরণে প্রকাশ পায় তাঁর শিল্পধর্ম তেমনি নিত্যকার আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে তিনি সার্থক করেছেন— 'আর্টিস্টের স্বকীয় আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে তাঁর জীবনে। আমরা বারম্বার তার প্রমাণ পেয়েছি নন্দলালের স্বভাবে।'

আচার্য নন্দলালের দেহাবসানের সঙ্গে শান্তিনিকেতন-ইতিহাসের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল। যাঁদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বভারতীর সংসার পেতেছিলেন নন্দলালের মৃত্যুতে সে সংসারের শেষ প্রদীপটি নিবে গেল।



জওহরলাল
নেহেরু

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে এবং পণ্ডিত মতিলালের আনন্দভবনে একটি নাটকীয় মিল আছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে আনন্দমঠ পরোক্ষভাবে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে আনন্দভবন প্রত্যক্ষভাবে সেই ভূমিকারই অংশীদার। আনন্দমঠের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পরাধীন ভারতকে পুরুষানুক্রমে প্রেরণা জুগিয়েছে। আনন্দভবনের তিন পুরুষ--পিতা, পুত্র, পৌত্রী—ত্যাগ এবং নিষ্ঠার দ্বারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন স্বাধীন ভারতের অনাগত বহু পুরুষকে তা অনুপ্রাণিত করবে এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

এ গেল আপাতদর্শনের মিল। এ ছাড়াও এ দু-এর মধ্যে আর-একটি কথা অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে। আনন্দমঠের উপক্রমণিকায় অরণ্য-মধ্যে স্বদেশব্রতীর মুখে যে রহস্যময় উক্তি এবং শপথবাক্য উচ্চারিত হয়েছে আনন্দভবনবাসী স্বদেশপ্রাণ মতিলালের সহিত ভারতভাগ্যবিধাতার অনুরূপ একটি কথোপকথন কল্পনা করা নিতান্ত অবাস্তব বলে মনে হয় না—

আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?

তোমার পণ কি?

পণ আমার প্রাণ।

প্রাণ তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে। প্রাণের অধিক আর কিছু দিতে পার?

পারি বৈকি, প্রাণাধিক প্রিয় যে পুত্র সেই পুত্রকে দিতে পারি।

সেই পুত্রের কাহিনী। আলোচনার উপক্রমণিকা হিসেবে উপরোক্ত সূত্রটি মনে রাখলে মানুষটিকে বোঝা সহজ হবে।

অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী পিতার একমাত্র পুত্র। দুই ভগ্নী বয়সে অনেক ছোটো, জীবনের প্রথম এগারো বৎসর একমাত্র সন্তানের অতি

আদরে প্রতিপালিত। পিতা দিগ্বিজয়ী অ্যাড্‌ভোকেট—অমিট্ রায়ের পিতার মতো এমন অপর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ উপার্জন করেছেন যে, 'অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট'। আত্মচরিতের প্রথম বাক্যটিতে জওহরলাল নিজেও এই কথাটি বলেই জীবনকাহিনী শুরু করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় 'পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও' বিন্দুমাত্র বিপত্তি ঘটে নি।

দীর্ঘ সাত বৎসর বিদেশে কাটিয়ে হ্যারো কেম্ব্রিজে শিক্ষা সমাপ্ত করে, ব্যারিস্টারির সনদ নিয়ে যে যুবক দেশে ফিরে এলেন—স্বদেশীয় নীলরক্ত আর বিদেশীয় আবিল রুচির মিলনে তাঁকে এক উন্নাসিক বিজাতীয় চরিত্র হিসেবে কল্পনা করা কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। আত্মচরিতে সকৌতুকে নিজেই সে কথার উল্লেখ করেছেন—"As I landed at Bombay, I was a bit of a prig with little to commend me." আশা করা গিয়েছিল ইনি অবিলম্বে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের মুকুটমণি হয়ে বসবেন, লাট-দরবারে সমাদৃত হবেন, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবীর পুত্র হিসেবে আইনব্যবসায়ে অনায়াস-প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন।

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্য। যে সাহেবিয়ানার রং ভাবা গিয়েছিল দেশে এসেও ধোপ সইবে সে রং তেরাত্তিরও টিকল না। আইন-ব্যবসায়ে স্পৃহা দেখা গেল না। পিতাও একদিনের জন্য পুত্রকে আপন অভিরুচির বিরুদ্ধে কিছু করবার তাগিদ দিলেন না। পলিটিক্সে আগ্রহ আকৈশোর ; কিন্তু তাঁর নিজস্ব সমাজের লোকেরা বিলিতি ইস্কুলে শেখা যে লিবারেল পলিটিক্সের চর্চা করতেন সে পলিটিক্সে মন উঠল না। প্রশ্ন হতে পারে হ্যারো কেম্ব্রিজের শিক্ষা কি তবে ব্যর্থ হল? অবশ্যই নয়। যে মানুষ পরবর্তীকালে দেশকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে গড়বার ভার নিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে হ্যারো কেম্ব্রিজ অত্যাবশ্যক ছিল। হ্যারো কেম্ব্রিজ না হলে দৃষ্টি এমন সুদূরপ্রসারী হত না, মন এতখানি দুনিয়া-সচেতন হত না। এই সূত্রে আর-একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। ইংল্যাণ্ডের পাবলিক স্কুল ইংরেজের বনেদি শিক্ষার আবাসভূমি। জাতীয়-চরিত্রের বুনিয়াদ এরাই

রক্ষা করে আসছে। এদের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিমূলে আছে tradition-ভক্তি। ভিক্টোরীয় যুগ পর্যন্ত অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের শিক্ষার মূলেও ঐ উদ্দেশ্যটি প্রচ্ছন্ন ছিল। বিলিতি শিক্ষার এই দিকটিও জওহরলালের জীবনে নিষ্ফল হয় নি। সম্পূর্ণ বিজাতীয় পরিবেশে শিক্ষালাভ করেও ভারতীয় ঐতিহ্যকে তিনি শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন, অবশ্য মনকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত রেখে। যে মানুষ জাতীয়-ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন সে মানুষ মূলোৎপাটিত, দেশের নাড়ির সঙ্গে তার যোগ নেই—এ কথা জওহরলালকে বারম্বার বলতে শুনেছি।

এ কথা নিশ্চিত যে, জওহরলালের ন্যায় মানুষ গড়বার মতো বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নি। পৃথিবীর সব চাইতে বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় যে জীবন—একমাত্র সেই জীবন থেকেই এমন সুসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। পৃথিবীবিস্তৃত যে মানবসমাজ সেই মনুষ্যসমাজ থেকে তিনি তাঁর বিদ্যা আহরণ করেছেন। তাঁর বিদ্যা কেবলমাত্র অধীত বিদ্যা নয়, আহৃত বিদ্যা। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে—সেই হচ্ছে বিদ্যা যা মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেবে। সেই বিদ্যার সার্থকতম রূপ জওহরলালের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এমন সর্ববন্ধনমুক্ত দিগন্ত-প্রসারী মন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো মধ্যে আমরা দেখি নি।

যদিচ মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই তাঁর কাম্য ছিল তথাপি পরাধীন দেশে যা স্বাভাবিক, রাজনৈতিক দাসত্বের গ্লানিই তাঁর মুক্তিক্ষুধাকে প্রথম জাগ্রত করেছে। এই মুক্তিক্ষুধাই তাঁর সকল শিক্ষার মূলে; বোধ করি গৃহের আবহাওয়ায় শিশুকাল থেকে পিতার কাছেই পাওয়া। বুয়র যুদ্ধের সংবাদে দশ বৎসরের বালক অধীর চঞ্চল; রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ে—প্রথম এশিয়াটিক জাতির অভ্যুদয়ে—চৌদ্দ বৎসরের বালক উল্লসিত। এরই অনতিকাল পরে দেশে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনা—'Bengal seemed to be in an uproar', পাঞ্জাব মহারাষ্ট্রে উত্তেজনা, লাজপৎ রায়ের নির্বাসন, টিলকের বজ্রনির্ঘোষ—হ্যারোর কিশোর-বালক উত্তেজনায় অধীর।

সেই বালক শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এলেন বাইশ বৎসর বয়সে। সব-কিছুতে কৌতুহল, কিন্তু মুক্তিকামী মনকে সর্বাগ্রে অধিকার করেছে দেশের ব্যর্থকাম পলিটিক্স। কংগ্রেসের ঝিমোনো পলিটিক্স তাঁর মনে ধরে নি—নিতান্ত নিরুদ্বেগ নিরুদ্দম নির্জীব জলো-জলো পলিটিক্স। জওহরলাল চিরকালের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। এখানে বলে রাখা ভালো যে, দেশে ফিরবার আগে গিয়েছিলেন নরওয়ে-ভ্রমণে। সেখানে এক খরস্রোতা পার্বত্য নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে ঘূর্ণিপাকে পড়ে ডুবতে ডুবতে বেঁচে এসেছেন। দেশে এসে বিবাহের অনতিকাল পরে গিয়েছিলেন হিমালয়ে অমরনাথ-অভিযানে। পনের হাজার ফুট উচ্চে অতল গহ্বরের মুখে পা দিয়েছিলেন। কোমরে বাঁধা দড়ি রক্ষা করেছে। যে মানুষ বিপদ-আপদকেই জীবনের নিত্য সহচর বলে জেনেছেন তাঁর কাছে কংগ্রেসের বিপদ-বারণ পলিটিক্স ভালো লাগবে কেন? আমাদের পুরাতনপন্থী নেতারা যখন আইনসম্মত উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের কথা ভাবছেন জওহরলাল তখন দেশের যুবক-সম্প্রদায়কে সকল প্রকার দুঃসাহসিক অভিযানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, বলছেন—Lern to live dangerously।

যে মানুষটা আর পাঁচ জনের মতো নয়, একেবারে পঞ্চম—কোথাও খাপ খাইয়ে নিতে তার বিলম্ব হয়। বিলেতের ইস্কুল-কলেজে যখন পড়েছেন সেখানেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে বেগ পেতে হয়েছে। নিজেই বলেছেন, I was never an exact fit; কিন্তু তাই বলে ইচ্ছে করে কখনো দূরে সরে থাকেন নি। যখন যে কাজে ডাক পড়েছে তাতেই সাধ্যমত যোগ দিয়েছেন। বিদেশে যেমন, দেশে এসে দেখলেন এখানেও তেমনি misfit। শুধু অশন-বসনে নয়, চলন-বলনে, ধরন-ধারণে ভিন্ন, কথন-চিন্তনে তো কথাই নেই। শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে স্বভাবে সর্বপ্রকারে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী। জনসাধারণের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা এই মানুষের পক্ষে কোনো মতেই সহজসাধ্য ছিল না। প্রথম তিন-চার বছর কেটেছে দর্শকের ভূমিকায়। সমাজের উচ্চমঞ্চে বসে দেশকে দেখেছেন সঙ্কীর্ণ বাতায়ন পথে। এইভাবেই আরো কিছু কাল চলতে পারত।

প্রথম ধাক্কা এল জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। রোষে ক্ষোভে দুঃখে দেশের একান্ত অসহায় অবস্থা অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেন। কিন্তু দেশকে সম্পূর্ণরূপে জানতে তখনো বাকি ছিল। প্রথম চোখ ফুটল বিহারে গান্ধীজির চম্পারণ সত্যাগ্রহ আর গুজরাটে কায়রা সত্যাগ্রহের বিবরণ পাঠ করে। দেশটা যে শহরে বন্দরে রাজপথে নয়, কংগ্রেসের বক্তৃতামঞ্চে নয়—এই উপলব্ধি সেই প্রথম হল। নিতান্ত আকস্মিক ভাবে ঠিক এই সময়টাতেই উত্তর-প্রদেশের কিষাণদের সঙ্গে তাঁরও যোগাযোগ ঘটে গেল। এটি তাঁর জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রতাপগড় জেলার ভিটেমাটি ছাড়া নিরন্ন চাষীদের কাতর আহ্বানে গেলেন গ্রামাঞ্চলে তাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখতে। যা দেখলেন সে তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। এদের দারিদ্র্য যে এমন অপরিসীম, জীবন যে এমন দুঃসহ নিজ চোখে না দেখলে তাঁর বিশ্বাস হত না। নিজের সচ্ছন্দ জীবনকে ধিক্কার দিলেন, যে সমাজে তিনি লালিত, বর্ধিত—তাকে নিতান্ত অবাস্তব বলে মনে হল, যে পোশাকী রাজনীতি নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত তাকে মনে হল নিছক ছেলেখেলা। "I was filled with shame and sorrow, at my own easy-going and comfortable life and our petty politics of the city which ignored this vast multitude of semi-naked sons and daughters of India, sorrow at degradation and overwhelming poverty of India."

এই অর্ধনগ্ন অনশনক্লিষ্ট অসহায় অসমর্থ অসম্পূর্ণ মানুষগুলোই যে সত্যিকারের ভারতবর্ষ—এই সত্যটি জাজ্বল্যমান হয়ে দেখা দিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে এই তাঁর প্রথম দৃষ্টিবিনিময়। একেই বলব নেহেরুর ভারত-আবিষ্কার, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বৃহত্তর উপলব্ধি। "Ever since then my mental picture of India always contains this naked hungry mass." শুধু তাই নয়, এই মানুষগুলোই যে তাঁর সব চাইতে আপনার জন, দেশকে পেতে হলে যে এদের মধ্যেই পেতে হবে—এই সত্যটিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করলেন। সেই দিন থেকে আপন সমাজে, আপন

পরিবেশেই নিজেকে পরবাসী মনে হয়েছে। অনুরূপ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের জীবনেও হয়েছিল। ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের অস্বাভাবিক অবাস্তব পরিবেশ তাঁর কাছে কতখানি পীড়াদায়ক ঠেকেছিল এখানে তার উল্লেখ বোধ করি খুব অবাস্তব মনে হবে না— "আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসেছিলুম—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কি বলব। অথচ চোখের সামনে ইভ্‌নিং ড্রেস-পরা মেমসাহেব, এবং কানের কাছে ইংরেজী হাস্যালাপের গুঞ্জনধ্বনি—সবশুদ্ধ এমনি অসংগত! আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতখানি সত্য—আর এই ডিনার-টেবিলের বিলিতি মিষ্টহাসি, ইংরিজি শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি।" জওহর্‌লালের মনেও ঠিক এই অনুভূতি। এতকালের অভ্যস্ত জীবনের সাচ্ছন্দ্য থেকে নিজেকে সমূলে উৎপাটিত করে নিলেন।

জওহরলালের চোখের সমুখে যে ভারত দেখা দিল সে যে নিরবচ্ছিন্ন এক বেদনার চিত্র এমনও নয়। বেদনার সঙ্গে আনন্দ মিশ্রিত এ এক বিচিত্র অনুভূতি। ন্যূনতম স্পর্শে এবং সামান্যতম আশ্বাসবাক্যে এই একান্ত নির্ভরশীল অসহায় মানুষগুলির মধ্যে কি প্রচণ্ড আবেগের সঞ্চার হতে পারে দেখে তিনি চমৎকৃত—"They were in miserable rags, men and women, but their faces were full of excitement and their eyes glistened and seemed to expect strange happenings which would, as if by a miracle, put an end to their long misery."

নিঃসন্দেহে গান্ধীজিই পথপ্রদর্শক। তথাপি বলব, নেহেরুর এই ভারত-আবিষ্কার একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার, কঠোরতম অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে কেনা। জ্যৈষ্ঠের দুঃসহ রৌদ্রতাপে দিনের পর দিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করেছেন, চাষীদের ঘরে রাত্রি যাপন করেছেন, তাদেরই খাদ্যে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেছেন—"During these visits we wandered

about a good deal from village to village, feeding with the peasants, living with them in their mud huts, talking to them for long hours, and often addressing meetings, big and small." রবীন্দ্রনাথের যে অভিজ্ঞান জওহর-লালেরও সেই অভিজ্ঞান – দেশটা মৃণ্ময় নয়, চিন্ময়—দেশটা মাটি দিয়ে গড়া নয়, মানুষ দিয়ে গড়া। দেশের মানুষই দেশের সব চাইতে বড়ো সম্পত্তি। নেহেরু যে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করলেন এ শুধু অক্ষম অসহায় দরিদ্র জনগণের ভারতবর্ষ নয়। আসল আবিষ্কারটা হল—আপাতদর্শনে অক্ষম এবং অসহায় এই জনতার মধ্যে যে অসীম শক্তি লুক্কায়িত সেই শক্তির আবিষ্কার। এরই মধ্যে লক্ষ্য করেছেন—"The down-trodden *Kisan* began to gain a new confidence in himself and walked straighter with head up." হোক নগ্ন, হোক অনশনক্লিষ্ট, এরা অমিত শক্তির আধার—এ বিষয়ে তিনি এখন নিঃসন্দেহ। জনবহুল দেশকে তিনি বহুবলধারিণীং বলে চিনেছেন। নেহেরু মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত। জওহরলাল মূলতঃ কবি, দেশকে দেখেছেন কবির দৃষ্টিতে, প্রেমিকের দৃষ্টিতে, রাজনৈতিক agitator-এর দৃষ্টিতে নয়।

এ যাবৎ উত্তর-প্রদেশের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ। ইতিমধ্যে গান্ধীজি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। অকস্মাৎ সমগ্র ভারতের জনসমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠল। অর্ধেক বাস্তব আর অর্ধেক কল্পনায় মিশিয়ে যে শক্তির আভাসমাত্র তিনি অনুমান করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ রূপ যে কি বিরাট কি প্রচণ্ড কি দুর্নিবার হতে পারে নেহেরুর কবি-কল্পনাকেও তা হার মানিয়েছে। জনবলের সঙ্গে মনোবলের মিশ্রণ ঘটলে যে অপ্রতিরোধ্য শক্তির সৃষ্টি হয় এ তারই অদৃষ্টপূর্ব দৃষ্টান্ত। সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ে স্তব্ধ—

বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
কোথা ছিল ঢাকা॥

পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তির বিরুদ্ধে এক নিরস্ত্র জনতার অহিংস সংগ্রাম—শুধু অভূতপূর্ব নয়, অচিন্ত্যপূর্ব। বিপ্লব অনেক দেশেই ঘটেছে—উন্মত্ত জনতার বিকৃত বিধ্বংসী মূর্তি, নরঘাতন পাশবিকতার রক্তাক্ত দৃশ্য পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যা ঘটল পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। অপরাপর বিপ্লবের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য এই যে, বিপ্লব সাধারণতঃ ধ্বংসমূলক, ভারতের বিপ্লব সৃষ্টিমূলক।

নতুন এক ভারতবর্ষের সৃষ্টিক্রিয়া শুরু হল। গান্ধী তার জন্মদাতা। এক দিকে নতুন ভারতের জন্ম হচ্ছে আর সেই সঙ্গে নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। সে এক অপূর্ব কাহিনী। আমাদের পুরাণের গল্পে আমরা যে সমুদ্রমন্থনের কথা শুনেছি একমাত্র তারই সঙ্গে এর তুলনা চলে। আজকের দিনে সমুদ্রমন্থনের কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না। কথাটা আক্ষরিকভাবে সত্য এমন কথা আমিও বলি না। তথাপি বলব, এর মধ্যে একটি রূপকাশ্রিত সত্য আছে। সমুদ্রমন্থন সত্যি সত্যি হয় না, কিন্তু জনসমুদ্র-মন্থন হয়। গান্ধীজি যে বিপ্লবের সৃষ্টি করলেন তার একমাত্র আখ্যা জনসমুদ্রমন্থন। দেশময় যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল তারই বিক্ষেপে অত্যাশ্চর্য সব ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হতে লাগল। সমুদ্রমন্থনের ফলে উঠেছিল অমৃত—এই ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্বের অভ্যুত্থানকেই বলব অমৃত। সমগ্র দেশ স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছে চিত্তরঞ্জন-মতিলালের সর্বস্ব ত্যাগ, জওহরলাল-সুভাষ-চন্দ্রের মধ্যে দেখেছে ভারতীয় যৌবনের অম্লান মহিমা। সমুদ্রমন্থনে এক দিকে যেমন উঠেছিল অমৃত তেমনি উঠেছে বিষ। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অশেষ দুঃখ, নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। নীলকণ্ঠের মতো এঁরা সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছেন। এই দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই জননায়কের সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘদিনের দুঃখব্রত উদ্‌যাপন করে তবে নেহেরুর ভারত-আবিষ্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ আবিষ্কার শুধু এক তরফা হয় নি। জওহরলাল যেমন ভারতকে আবিষ্কার করেছেন ভারতবর্ষ তেমনি জওহরলালকে আবি-ষ্কার করেছে। ভবিষ্যৎ ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে দেশ তাঁকে

বরণ করে নিয়েছে। এই সূত্রে মনে পড়ছে দশ-বারো বছর আগে নেহেরুর জন্মদিনে আমাদের শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা তাদের হাতে-লেখা পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। আমাকে এসে ধরেছিল দু লাইন লিখে দিতে। মনে আছে লিখে দিয়েছিলাম—Far greater than Nehru's Discovery of India is India's discovery of Nehru। আমার কাছে এ কথার সত্যতা আজও অটুট রয়েছে। জাতি হিসেবে আমাদের শত রকমের দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে তথাপি আমার বিশ্বাস, আমাদের জাতীয়-চরিত্রে নিত্যকালের কিছু সত্যমূল্য আছে, নতুবা এ দেশে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-জওহরলালের ন্যায় ব্যক্তির জন্ম সম্ভব হত না। সমগ্র জাতির জাগ্রত চেতনা এবং অন্তরের তাগিদ থেকে এমন মানুষের জন্ম হয়। A country gets the leader she deserves—প্রত্যেক জাতি আপন যোগ্যতা অনুযায়ী তার নেতা লাভ করে। জওহরলালের মতো নেতা যে ভারতবর্ষ লাভ করেছে সে গৌরব প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রাপ্য। কারণ সে তার জন্য মূল্য দিয়েছে। জওহরলাল যে দুঃখব্রত গ্রহণ করেছিলেন সমগ্র দেশকে সেই ব্রত পালন করতে হয়েছে। দুঃখের অগ্নিতে জহরব্রত পালন করে তবে ভারতবর্ষ জওহরলালকে পেয়েছে।

জওহরলাল দুঃখব্রতী বীর। সংসারে যা-কিছু মানুষের আকাঙ্ক্ষিত কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। বংশগৌরব, ধনমান, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপযৌবন—এমন সুসম্পূর্ণ আয়োজন কোনো সাংসারিক প্রয়োজনেই লাগান নি। জীবনে সকল সার্থকতার পথ যখন তাঁর সমুখে উন্মুক্ত সেই মুহূর্তে দ্বিধামাত্র না করে দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কটের পথে অগ্রসর হয়েছেন। নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে কঠোর নির্যাতনের পথকেই বেছে নিয়েছেন। ভারতবর্ষে এ জিনিস নতুন নয়। সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে এ দেশের রাজপুত্র জীর্ণকন্থা ধারণ করেছেন। আমাদের বহুভাগ্য, আমাদের এই স্বার্থকলঙ্কিত যুগে আমরা সেই সর্বত্যাগী রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে আর-একবার দেখলুম। একেই বলে ইতিহাসের পুনরাবর্তন। যে জাতি জীবন্ত তার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী কোনো সত্যধর্ম নিশ্চিত নিহিত থাকে। সাময়িক অধঃ-

পতনের ফলে হয়তো সেই সত্যধর্ম নির্জীব অবস্থায় দীর্ঘকাল লুক্কায়িত থাকে। একদিন যখন আবার জাতির চেতনা উদ্বুদ্ধ হয় তখন সেই ধর্ম-বোধ পুনরায় প্রোজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। History repeats itself কথার এই একটি মাত্র অর্থই আমি জানি।

পিতৃসত্য রক্ষার জন্য চৌদ্দ বছর বনবাসের দৃষ্টান্ত এ দেশে আছে। এর চাইতেও বড়ো সত্য—মানুষের জন্মগত অধিকার রক্ষার জন্য চৌদ্দ বছর কারাবাসের দৃষ্টান্ত এ যুগেও আবার দেখা গেল। কারাগৃহের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনভ্যস্ত কৃচ্ছ্রসাধনে কেটেছে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। জীবনের বহু সাধ অপূর্ণ থেকে গিয়েছে। প্রথম-যৌবনের দাম্পত্যসুখ বারম্বার খণ্ডিত হয়েছে কারাবাসের বিচ্ছেদে, রুগ্‌ণা স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে থাকা হয় নি, একমাত্র সন্তানের শিক্ষাব্যবস্থা আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী করতে পারেন নি। নিজেকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করেছেন, কিন্তু তার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে হাহুতাশ করেন নি। আত্মচরিতের উপসংহারে বলেছেন—"পিছন ফিরে জীবনটাকে দেখছি। লোকে বলবে আমি জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। কিন্তু জীবনবিধাতা আজ যদি এসে বলেন, এই নে তোর জীবন, গোড়া থেকে আবার তুই শুরু কর।"—বলেছেন, "যদি তা দিতেনও আমি জানি আমি নিশ্চিত আবার এই পথেই অগ্রসর হতাম। আমার মধ্যে কিছু-একটা আছে যা নিঃসন্দেহে আমাকে এই পথেই আবার টেনে নিয়ে আসত।"

সংসারের বেশির ভাগ মানুষই গৃহপালিত জীব। আমাদের পক্ষে এই মানুষের রীতিনীতি বোঝা বড়ো সহজ নয় যদিচ মহাকবির কল্পনাতে এঁর আগমনবার্তা পূর্বাহ্লেই ঘোষিত হয়েছিল—

> ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে
>
> নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক
>
> নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন যে মানুষের কথা বলেছেন, যে মানুষের স্বপ্ন দেখেছেন, এই সেই মানুষ। জীবনে যাকে আদর্শ বলে জেনেছেন তার জন্য

ঝাঁপ দিয়েছেন সঙ্কট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছেন বিশ্ব বিসর্জন, নির্যাতন লয়েছেন বক্ষ পাতি। সুখের কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নের মানুষকে নিজ চোখে দেখে গিয়েছেন। নবজীবন, নবযৌবনের প্রতীক হিসেবে 'ঋতুরাজ' আখ্যা দিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বরণ করেছেন।

এমন সর্বব্যাপী ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। সাংসারিক সুখসম্পদ তো বটেই, এ ছাড়াও মনের এমন অনেক অভিলাষ ত্যাগ করতে হয়েছে যা চোখে পড়বার মতো নয়, কিন্তু ভেবে দেখবার মতো। স্বভাবতঃ ইনি ভিড়ের মানুষ নন। মনের আভিজাত্য এবং রুচির কৌলীন্যই তাঁকে দূরের মানুষ করে সৃষ্টি করেছিল, অথচ সেই মানুষকেই লক্ষ জনের ভীড়ের মধ্যে সারা জীবন কাটাতে হয়েছে। কবি-প্রকৃতির মানুষ, যখন পেরেছেন নিজের মধ্যেই ডুব দিয়ে একটু অন্তরালের সৃষ্টি করেছেন। অপেক্ষাকৃত ছোটো আসরে একাধিকবার তাঁকে ঘিরে বসবার সৌভাগ্য হয়েছে। চোখের দিকে যখনই তাকিয়েছি মনে হয়েছে এত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর দৃষ্টি যেন কোন্ দূরলোকে নিবদ্ধ। এই সূত্রে মনে পড়ছে ওঁর কোনো এক বন্ধু চিঠিতে লিখছেন—You are never less alone than when alone. অর্থাৎ ভিড়ের মধ্যেও আপনি একাকী, নিঃসঙ্গ। তা হলেও বলব, কবি-মনের নিরালার বিলাসটুকু তাঁকে অনেক সময়েই ত্যাগ করতে হয়েছে।

নেহেরু প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিক। তাঁর মনের গড়ন মূলতঃ কবির এবং সাহিত্যিকের, কিন্তু পলিটিক্সের চাপে তাঁরও সাহিত্যচর্চার অভিলাষ পূর্ণ হয় নি, আমরাও বঞ্চিত হয়েছি। পলিটিক্স যে পরিমাণে লাভবান হয়েছে সাহিত্য সে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেটুকু লিখেছেন সেটুকু কারাবাসের অবকাশে। সুখের বিষয় তারও পরিমাণ বড়ো কম নয়, উৎকর্ষ সর্বজনস্বীকৃত। অটোবায়োগ্রাফি, ডিস্কভারি অফ ইণ্ডিয়া এবং ওয়ার্লড হিস্ট্রির পাতায় পাতায় লিরিকের আমেজ। নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত মন, তারও মধ্যে অকস্মাৎ সূর্যাস্তের বর্ণসমারোহে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। কারাগৃহের নির্জন কুঠরিতে বসে হঠাৎ মনে হয়েছে কতকাল নারীকণ্ঠের কথা শোনেন নি,

শিশুর কলকাকলি শোনা হয় নি। আরো আশ্চর্য কি—বলেছেন, কতদিন একটা কুকুরের ডাক পর্যন্ত শোনেন নি। কবি না হলে এমন কথা কারো মনে আসে না। তাঁর মনের কবিধর্ম তাঁর পলিটিক্সকেও এক আশ্চর্য বর্ণসুষমায় মণ্ডিত করেছে।

জওহরলাল নেহেরুকে সকলে স্টেটস্‌ম্যান বলে জানে; আমার কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। প্লেটো যে ফিলজফার-স্টেটস্‌ম্যানের কথা বলেছেন সেই আখ্যা বরং তাঁকে মানায়, যদিচ পয়েট-স্টেটস্‌ম্যান বললে আরো বেশি মানাবে। কর্মযোগের সঙ্গে ধ্যানযোগের, গান্ধী-আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্র-আদর্শের মিলন হলে যে মানুষের সৃষ্টি হতে পারে জওহরলাল সেই মানুষ। গান্ধী রবীন্দ্রনাথ—এই দুই মহামানবের যুগে আমরা বাস করেছি—এই দুই-এর মানবিক দোষ গুণ সমস্ত মিশিয়ে তেজে বীর্যে কর্মে কল্পনায় সাধ্যে সাধনায় ললিতে কঠোরে এক অত্যাশ্চর্য মানুষের সৃষ্টি হল। একজন দিয়েছেন বিশ্বকর্মার শক্তি, আর-একজন দিয়েছেন বিশ্বজনীন মন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, নেহেরুর বৈদেশিক নীতি অনেকাংশে বিশ্বভারতীর আদর্শে গঠিত। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম যেমন সকল গণ্ডিকে অতিক্রম করে উদারতম মানবধর্মে পরিণত হয়েছে, জওহরলালেরও রাষ্ট্রনীতি—পঞ্চশীল—ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে সর্বমানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম হিন্দু বা ব্রাহ্মধর্ম নয়, মানুষের ধর্ম; জওহরলালের রাষ্ট্রনীতি ভারতের রাষ্ট্রনীতি নয়, মানুষের রাষ্ট্রনীতি।

—•• ••—